গীতাতত্ত্ব ও ভারতে শক্তিপূজা

স্বামী সারদানন্দ

সপ্তর্ষি

সপ্তর্ষি
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী
কলিকাতা-৭০০০৭৩

Gitatatma O Bharater Saktipuja

By

Swami Saradananda

প্রথম প্রকাশ :

নভেম্বর ১৯৫৮

প্রকাশক :

ভোলানাথ দাস

সপ্তর্ষি

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :

প্রিণ্টার্স কর্নার

৪৫/এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

গীতাতত্ত্ব ও ভারতে শক্তিপূজা

গীতাতত্ত্ব

পরিচয়

গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যা আছে, আজ সেই বিষয়ে বলব। আমরা সকলেই জানি, আমাদের দেশে গীতার কত আদর, কারণ হিন্দুধর্মের সার কথা গীতায় আছে। গীতামাহাত্ম্যে এই বিষয়ে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

—উপনিষদ্‌সকল যেন গাভীস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ তার দুধ দুইছেন, অর্জুন সেই গাভীর বাছুরের মত হয়েছেন। বাছুর যেমন গাভীর কাছে না গেলে গাভী দুধ দেয় না, সেই রকম অর্জুনের প্রশ্নেই শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রোপদেশ এবং গীতারূপ দুধের উৎপত্তি। এই দুধ পান করবে কে? সুধী অর্থাৎ পণ্ডিত লোক। পণ্ডিত মানে বিবেকী লোক। আমাদের দেশে আজকাল যাঁরা দু'চারখানা বই পড়েছেন, দু'চারটে কথা গুছিয়ে বলতে পারেন, তাঁদেরই পণ্ডিত বলা হয়। কিন্তু গীতা বলেন, যাঁরা মুখে কেবল লম্বা-চওড়া বলেন, তাঁরা পণ্ডিত নন। যাঁরা সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন, যাঁদের অপরোক্ষানুভূতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছে, অসৎ হতে সৎ যাঁরা বুঝে নিতে পারেন, তাঁরাই পণ্ডিত। শুনা যায়, এক শ্রেণীর হাঁস আছে, যারা দুধে জলে মিশে থাকলে শুধু দুধটুকু খেতে পারে। তেমনি এই সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত সংসারে যিনি অসৎ বাদ দিয়ে সৎ নিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। তিনিই গীতা বুঝতে ও বোঝাতে পারেন।

গীতার টীকা অনেকে অনেক রকম করেছেন। আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর আচার্য আপনাপন পক্ষ-সমর্থন করে গীতার অর্থ করেছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত মত সমর্থন করে গীতার টীকা করেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্যও সেইরূপ আপনাপন মতানুযায়ী টীকা করে গিয়েছেন। তোমাদের অত টীকা দেখবার দরকার নেই। তোমাদের মন এখনও কোন বিশেষ মতের দিকে না চলে এক ভাবেই আছে। আপনাপন সহজ জ্ঞানে যে অর্থ উপলব্ধি করবে, তা-ই যথেষ্ট। আর ঐ উপায়ে যে যে স্থলে অর্থবোধ না হবে, সেই সেই স্থল বুঝবার জন্যে আর একটি উপায় আছে। যাঁরা মহাভারত পড়েছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনই এই গীতাশাস্ত্রের প্রধান টীকাস্বরূপ। আপনি এবং অপর সকলে শরীরবান হলেও জন্মমৃত্যুবিরহিত অবিনাশী আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নয়, এই

জ্ঞান সর্বদা মনে রাখা, আপনার লাভ-লোকসানের দিকে না চেয়ে সতত কর্তব্যপরায়ণ হওয়া, মনুষ্যজীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখে অবিচলিত থাকা প্রভৃতি যে সমুদয় শিক্ষা গীতায় নিবদ্ধ আছে, তৎসমুদয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জীবনের প্রত্যেক কাজে অনুষ্ঠিত দেখতে পাওয়া যায়। অতএব গীতার কোন কথা যদি বুঝতে না পার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন অনুসন্ধান কর ; তা হলে যথার্থ অর্থ বুঝতে পারবে।

আর এক কথা,—বেদের উপনিষদ্ভাগে আত্মা, ঈশ্বর, জীব, জগৎ-সম্বন্ধে যে সকল সত্য লিপিবদ্ধ আছে, এই অল্প পরিমাণ গীতার মধ্যে ঠিক সেই সব দেখতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে উপনিষদের ভাষা পর্যন্ত দেখতে পাবে। সেই জন্যে গীতা উপনিষৎ মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে এবং গীতার অপর নাম গীতোপনিষৎ। গীতামাহাত্ম্যে গীতাপাঠের বিশেষ ফল লিখিত আছে। একটি শ্লোকার্ধ বল্‌ছি—

"গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।"

—'যে নিয়ত গীতা পাঠ করে, সে পরজন্মে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।' অন্য কোন হীনযোনিতে তার জন্ম হয় না।

এটি বড় সহজ কথা নয়। মনুষ্যত্ব লাভ করা বড়ই কঠিন। যার মনুষ্যত্ব আছে, তার জ্ঞান বল, ভক্তি বল, অপর কোন বিষয় বল, লাভ করতে কতক্ষণ লাগে? শঙ্করাচার্য বলেছেন—

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥"

—জগতে এই তিনটি জিনিস এক সঙ্গে পাওয়া দেবতার অনুগ্রহ না থাকলে হয় না। যথা, ১ম—মনুষ্যত্ব, ২য়—মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্ত হবার ইচ্ছা। শরীরের সুখ, মনের সুখ না চেয়ে একটা উচ্চ উদ্দেশ্য স্থিরভাবে জীবনে রাখা। স্থির, অবিচলিত একটা উদ্দেশ্য থাকলে ক্রমে তা ভগবানের দিকে নিশ্চিত নিয়ে যাবে। সাধারণ লোকে আত্মসুখ নিয়েই ব্যস্ত। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য জীবনে রেখে চলে কে? ৩য়—মহাপুরুষসংশ্রয়। যে পুরুষ আপন জীবন সুমহৎ উদ্দেশ্যে গঠন করেছেন, এমন পুরুষের সঙ্গলাভ করা এবং তাঁর মুখ হতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য শোনা। তা এত দুর্লভ কেন? ধর্মকথা সৎকথা তোমরাও বল্‌ছ, আমিও বল্‌ছি। কিন্তু তার দ্বারা কোন কাজ হয় না কেন? আমাদের কথার জোর নেই ; কারণ, তা প্রাণের কথা নয়। আমাদের মন মুখ এক নয়। আমরা সংসারের সুখের জন্য লালায়িত, অথচ মুখে ত্যাগের কথা বলি আমাদের কথায় কাজ হবেই বা কেন? যে পুরুষ আপনার জীবন মহৎ উদ্দেশ্যে গঠন করেছেন, মন মুখ এক করেছেন, তাঁর প্রতি কথায় যেন ভিতরের একটা দোর খুলে দেয়, মোহের আবরণ কাটিয়ে দেয়। মহাপুরুষদের কথায় বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে পরমহংসদেবের কথায় কত শক্তি! ক্রাইস্ট বা বুদ্ধদেবের সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন কথা পড়, এখনও সেই কথার কত শক্তি! কিন্তু তুমি আমি সেই কথা বললেও কারও প্রাণে তা লাগবে না। আবার যেই তুমি একটা মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন গঠন

করবে, অমনি তোমারও কথার শক্তি বাড়বে। তখন একটা কথা বললে লোকের প্রাণে লাগবে। যে জিনিসেরই শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করবে, সেইটেরই শক্তি বাড়বে। মনের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা কর, মানসিক শক্তি বাড়বে, সেইরূপ বাক্যের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা কর, কোন বিষয় বিশেষরূপে বলবার ক্ষমতা বাড়বে। বেদান্ত বলেন, এই মনই জগতের সৃষ্টি করেছেন। মনের অদ্ভুত শক্তি। ইউরোপের জড়বাদীরাও এ কথা স্বীকার করেন। ইতিহাসপাঠেও মনের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী দেশের রাণী মেরী এণ্টইনেট অপূর্ব রূপসী ছিলেন। তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে পারি নগরের লোকেরা একদিন ক্ষেপে উঠে জেলে পুরে দিলে। পরদিন প্রাণদণ্ড করবে স্থির করলে। প্রাতঃকালে দেখা গেল, রাণীর মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে। একরাত্রের দারুণ ভাবনায় তিনি একেবারে বুড়ী হয়ে গেছেন। মনের এতদূর ক্ষমতা! মন যদি তীব্রভাবে একটা জিনিস চায়, তা হলে তা নিশ্চয়ই পাবে। আমরা সম্পূর্ণ মনের সহিত কোন জিনিস চাইতে পারি না, তাই তা পাই না। আমাদের মন, পরমহংসদেব যেমন বলতেন, সরষের পুঁটুলির মত। সরষের পুঁটুলি খুলে গিয়ে দানাগুলি যদি একবার ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে সেই সকলগুলিকে আবার একত্র করা অসম্ভব। ঘরের আসবাবের কোণে, দেয়ালের ফাটলে এমন গিয়ে পড়বে যে, হাজার চেষ্টা করলেও আর সকল দানাগুলি পাওয়া যাবে না। মনও সেইরূপ একবার কতক রূপে, কতক রসে, কতক ধন মান ইত্যাদি সাংসারিক বিষয়ে ছড়িয়ে পড়লে আর তাকে সম্পূর্ণরূপে একত্র করা অসম্ভব। তাই পরমহংসদেব ছেলেদের এত ভালবাসতেন। কারণ, তাদের মন এক জায়গায় আছে। সত্যের বীজ ঐ সব মনে দিলে শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হবে।

গীতার প্রত্যেক অধ্যায়কে এক একটি যোগ নাম দেওয়া হয়েছে। যোগ অর্থ এক করে দেওয়া—ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়া। যথা, ১ম অধ্যায়কে বিষাদযোগ বলে। বিষাদযোগ কেন বলা হল? কারণ, অর্জুনের বিষাদই তাঁকে ভগবানে নিয়ে যাবার উপায় হল। তাই বিষাদযোগ। এইরূপ সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, সন্ন্যাসযোগ ইত্যাদি।

আমরা বলতে পারি, গীতা কেবল অর্জুনের জন্যে বলা হয়েছিল। তাতে আমাদের কি হবে? আমরা তো আর যুদ্ধে যাচ্ছি না, অথবা মহাবীর অর্জুনের জীবনের সঙ্গে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের জীবনের কোন অংশে সাদৃশ্যও নেই। অতএব মহৎ অধিকারীর উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট শাস্ত্র আমাদের উপকারে কিরূপে লাগবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, অর্জুন আমাদের চাইতে শতগুণে বড় হলেও মানুষ ছিলেন। আমরাও মানুষ। তাঁর জীবনে যেমন মোহ কখনও কখনও হয়েছিল, আমাদেরও তেমনি মোহ প্রতিপদে হয়, আমাদেরও তাঁর মত সত্যের জন্যে নানা বিঘ্নবাধার বিপক্ষে দাঁড়াতে হয়। আমাদেরও তাঁর মত ভেতরে বাইরে জীবনসংগ্রাম চলছে। তাই আমরাও গীতা পড়লে শিক্ষা পাই, শান্তি পাই, জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান পাই। দেখা গিয়েছে, কত পাপী তাপীর গীতা পাঠ করে অনুতাপের অশ্রু পড়েছে এবং উচ্চদিকে জীবনপ্রবাহ চালিত হয়েছে।

আর এক কথা। গীতা কি মহাভারতাঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে? কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেছেন, গীতা প্রক্ষিপ্ত। আমাদের দেশেও অনেক লোক তাই শুনছে! তাঁরা বলেন, ভারতবর্ষের পুরাকালের কোন ইতিহাস নেই, কখন ছিলও না। অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে যে, ঐরূপ একটা প্রকাণ্ড দর্শনসংগ্রহ বাস্তবিক উপদিষ্ট হয়েছিল, এ কথা একেবারে যুক্তিবিরুদ্ধ। একটা বিষয় বিশ্বাস করবার আগে তা সম্ভব বা অসম্ভব বুঝতে তো হবে? তার উত্তর এই যে, আগে ভারতবর্ষের মত পুরাতন তাঁদের দেশ হোক, তখন দেখা যাবে তাঁদেরও কত ইতিহাস থাকে। ভারত কত দিনের! কত বিপ্লব হয়ে গেছে! কতবার সব ভেঙ্গে গেছে, আবার কতবার সব গড়েছে। ইউরোপ তার কি জানবে? ইউরোপ তো সেদিনের। এখনও দেখতে পাওয়া যায়, কত যুগ পূর্বে ভারত হতে সময়ে সময়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ হয়েছিল, ইউরোপে এখন সেই সব প্রকাশ হচ্ছে! এতেই বোঝা যায়, ভারতবর্ষ এক সময়ে কত উচ্চে উঠেছিল! এই ভারতের ন্যায় উদারতা কোথায় ছিল? আমাদের নীতিশাস্ত্র বলেন, সত্য চণ্ডালের নিকটেও শিক্ষা করবে, কারণ জ্ঞানই ভগবান, অতএব পবিত্র। যেখানেই জ্ঞান, সেখানেই ঋষিত্ব। সেখান থেকেই সেই জ্ঞান নেবে। গীতাও বলেন—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

—'জ্ঞান সমুদয় কর্মকে ভস্মীভূত করে।' একবার সেই জ্ঞান এলে আর কিছুই কু থাকে না। পরমহংসদেব বলতেন; একবার যে মিছ্‌রি খেয়েছে, তার কাছে কি আর চিটেগুড়ের আদর আছে?

তারপর ধর্ম ও দর্শন ভারতের প্রাণস্বরূপ। আমাদের দেশের লোকের অস্থিতে মজ্জাতে, প্রতি কার্যেতে এই প্রাণপ্রতিঘাত এখনও পাওয়া যায়। তখন যুদ্ধোদ্যোগের পূর্বে এরূপ শাস্ত্র যে উপদিষ্ট হতে পারে না, এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ যতক্ষণ না পাব ততক্ষণ কেন আমাদের বহু পুরাতন জাতীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করে তোমার কথ নেব? আবার গীতাবক্তা স্বয়ং ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ। তোমার আমার মত সাধার পুরুষের পক্ষে যে কাজ সম্ভবে ন, তা তাঁর ন্যায় মহাপুরুষে নিশ্চিত সম্ভবে। এও বুঝতে হবে এবং মহাভারতের অন্যান্য অংশের ভাষার সঙ্গে গীতার ভাষার এমন কিছু বিষমতাও দেখতে পাই না, যাতে তোমার কথা নিতে পারি। যাঁরা সাধুসঙ্গ করেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন সংসারে আমরা যাকে মহা মহা বিপদ বলি, সা তারই ভিতর অবিচলিত থেকে মহা তত্ত্বকথাসকল বলেন। এ আমাদের প্রত্যক্ষ পরমহংসদেব ভয়ানক রোগে ভুগছেন। ছ'মাস থেকে আহারাদি প্রায় বন্ধ। কিন্তু সমীপস্থ লোকের ভেতর মহা আনন্দের ব্যাপার চলেছে। অতি গূঢ়সাধন, জগতের কূট প্রশ্নসমূহের মীমাংসা এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদানে সকলকে তিনি মাতিয়ে রেখেছেন। রোগ, দুঃখ বা কষ্টের নামটি মাত্রও নেই। অর্জুন স্বয়ং ভগবানের কাছে রয়েছেন জ্ঞানের কথা বোঝাতে তাঁর কতক্ষণই বা লেগেছিল? অতএব ইহা প্রক্ষিপ্ত নয়। যদি

বল, ওসব ছাড়া গীতার একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, সেটি হচ্ছে এই—সংসারক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই, খাবার-সংগ্রহের লড়াই; এইরূপ কতই না সংগ্রাম মানুষকে দিনরাত করতে হচ্ছে; বিরাম নেই, শান্তি নেই। এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে মানব কিরূপে জীবনের সার উদ্দেশ্য লাভ করবে, এই বিষয়ের বিশেষ সমাধান করাই গীতার ভাব। বেশ কথা, এরূপ বিশ্বাস করতে চাও, আপত্তি নেই।

পূর্বে বলেছি, গীতাকে উপনিষদ্‌মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। অনেকে স্নান করে প্রতিদিন অন্ততঃ এক অধ্যায়ও গীতা পড়েন। তাঁরা গীতার প্রত্যেক শ্লোককে মন্ত্র-স্বরূপ পবিত্র মনে করেন। যেমন মন্ত্রের ঋষি, দেবতা, ছন্দাদি আছে, এরও সেই রকম আছে। গীতার ঋষি বেদব্যাস, কারণ তিনিই মন্ত্র দর্শন করেছেন। (ঋষি শব্দের অর্থ অতীন্দ্রিয়দর্শী)। তিনি দেখেছেন, তার পর সাধারণের জন্যে সেই বিষয়টা শ্লোকে নিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছেই মন্ত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, অতএব ঋষি শব্দের অর্থ ইংরাজীতে যাকে author বলা হয়, তাই। প্রত্যেক মন্ত্রের যেমন ঋষি অর্থাৎ রচয়িতা, দেবতা অর্থাৎ যে বিশেষ বিষয় নিয়ে মন্ত্র রচিত হয়েছে, ছন্দ অর্থাৎ যেরূপ পদবিন্যাসে মন্ত্রের ভাষা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি বীজও থাকে, গীতারও আছে। বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, তেমনি গ্রন্থেরও মধ্যে এমন একটা বিষয় থাকে, যেটা অবলম্বনে বা যেটাকে ফলিয়ে বাকিটা লেখা হয়। গীতার বীজস্বরূপ সে বিষয়টি কি?

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

—অর্থাৎ 'যার জন্যে শোক করা উচিত নয়, তার জন্যে শোক করছ আবার পণ্ডিতের মত কথা বলছ।' এর অর্থ এই যে, তোমার মুখে এক, মনে আর এক এবং তুমি সরল নও। যার মুখে একখানা, মনে আর একখানা, তাকে ধাক্কা খেতে হবে। তার সত্য বা ভগবানলাভের ঢের দেরি। পরমহংসদেব বলতেন, মন মুখ এক করতে হবে, উহাই প্রধান সাধন। গীতাও সেই কথা বলছেন। ধর্মরূপ মহাবৃক্ষের বীজ সরলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তারপর যেমন প্রত্যেক মন্ত্রের শক্তি আছে, তেমনি গীতার বিশেষ শক্তি এই শ্লোকে নিবদ্ধ।

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

—'সব ছেড়ে দিয়ে আমার শরণাপন্ন হতে পার, সব হয়ে যাবে।' আমরা কত রকম Plan বা মতলব করে থাকি। এটা করব, ওটা করব। অনেক সময় কিন্তু সব যেন এক ঘায়ে ভেঙ্গে যায়, একটা মহাশক্তি যেন সব ভেঙ্গে দেয়। তার হাতের ভেতর যেন রয়েছি, তার অনুমতিতে নড়ছি চড়ছি। তা বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, free will বা মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্টের মধ্য-স্থলে পড়ে রয়েছে। যেন কেমন একটা আলো-আঁধার, একটা ঠিক করে বলবার জো নেই, আলো বল আলো, আঁধার বল আঁধার। সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই মানুষ এই

অতীন্দ্রিয় জিনিসটা জানবার চেষ্টা করছে। ইউরোপে সক্রেটিস থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই জগৎটা কি, কোন শক্তি-অবলম্বনেই বা প্রকাশিত হয়ে রয়েছে, স্বাধীন বা পরাধীন ইত্যাদি বিষয় জানবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারেনি। কারণ, মনের দ্বারা ও বিষয়টা জানা যায় না ; মনের সীমা আছে। অন্ত-বিশিষ্ট জিনিস অনন্তকে কি করে জানবে ? ইন্দ্রিয়াদির পারে না গেলে যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, সে সকল প্রশ্নের সমাধান মন কেমন করে করবে ? একটা গল্প আছে, একজন পণ্ডিত এই সকল তত্ত্ব বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা অনেকদিন ধরে করেছিলেন। কিছুই না পেয়ে সমুদ্রে ডুবে মরতে যান। সেখানে দেখেন, এক বালক অদ্ভুত খেলা খেলছে। সমুদ্রের কিনারায় বালিতে একটা গর্ত খুঁড়েছে এবং ছোট ছোট হাতে সমুদ্র হতে অঞ্জলি অঞ্জলি জল এনে ঐ গর্তটা পোরাবার চেষ্টা করছে। অশেষ আয়াস এবং অনেকক্ষণ ছুটোছুটি চলতে লাগল। পণ্ডিতের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হল এবং বালক কি করছে, সেই বিষয় জানবার কৌতূহল। নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বালক, একি করছ ? বালক বললে, সমুদ্রের সব জলটা এই গর্তে আনছি। পণ্ডিত কথা শুনে না হেসে থাকতে পারলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবতে লাগলেন, মনের দ্বারা মনাতীত বস্তু ধরবার প্রয়াস—আমারও কি এরূপ হচ্ছে না ? বিবেকানন্দ স্বামীজী বলতেন, 'আমরা যেন সব গজ নিয়ে বেরিয়েছি। ভগবান-কে ছেটে ছুঁটে মেপে বের করে বুঝে নেব।' তা হয় না। মন জড়। আমাদের ঋষিরা জানতেন—মনে সূক্ষ্ম জড়—এই স্থুল জড়টাকে চালাচ্ছেন, ইউরোপের অনেকের বিশ্বাস, মনই আত্মা। তা নয়। গীতা বলেন, এ সকল প্রশ্ন সমাধান করবার আগে উপযুক্ত অধিকারী হতে হবে। কিরূপে তা হওয়া যায় ? বিশ্ব-মনের বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে আপন ক্ষুদ্র মন ও ইচ্ছা একতানে যোগ করতে হবে। একটিতে যেমন ভাব, যেমন স্পন্দন হতে থাকবে, অপরটিতেও সেইরূপ ভাব ও স্পন্দন উত্থিত হবে। তবেই ক্ষুদ্র মনে বাসনাপ্রসূত জ্ঞানের বিঘ্নবাধাসকল দূরীভূত হয়ে বিশেষ শক্তি প্রকাশিত হবে। সেইজন্যই গীতোক্ত ধর্মের সমস্ত শক্তি এই শ্লোকে নিবদ্ধ—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

তিনি জগতের নিয়ন্তা। তাঁর যা ইচ্ছা, আমারও সেই ইচ্ছা হোক, আমি আর কিছু চাই না। এই ভাবটা যিনি মনে দৃঢ় রাখেন, তিনি এই মহাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলেন। তাঁরই অহঙ্কার দূর হয়, জ্ঞান আসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদের ভেতর এর ঠিক বিপরীত ভাবই থাকে। বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে লড়ালড়ি করেই মরি কেবল বাসনার জন্যে। দেখ না, পরিবর্তন হচ্ছে জগতের নিয়ম, তা সকলেই জানে, কিন্তু তবু আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা হচ্ছে, যাতে অনিত্য শরীরটা চিরকাল থাকে। আমাদের ভালবাসাটাতেও কি এই ব্যাপার হয় না ? যাকে ভালবাসি, তার শরীর মনটাকে ধরে রাখবার চেষ্টা। আমরা ভালবাসার পাত্রের অনিত্য শরীর মনকে আপনার করে চিরকাল রাখতে চাই। সেইজন্যে আমাদের

ভালবাসায় মোহ হয়। নতুবা ঠিক ভালবাসা ভগবানের অংশ, তাতে মোহ আসে না। প্রকৃত ভালবাসা হলে ভালবাসার পাত্রকে অনন্ত স্বাধীনতা দেয়, আমার করতে চায় না। এইরূপে মানুষ বাসনার বশীভূত হয়ে বিশ্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনিত্য নিত্যকাল ধরে রাখতে চায়। ইহা মনে রেখো। ঈশপের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এক গরিব বৃদ্ধ একদিন একটা কাঠের বোঝা মাথায় করে অতি কষ্টে যাচ্ছিল। একে গরমিকাল, তাতে বোঝাটা অত্যন্ত ভারী, বৃদ্ধেরও অল্প শক্তি, বৃদ্ধ কিছুদূর গিয়ে ঘর্মাক্তদেহে শ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়ল আর আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগল—মৃত্যুও কি আমায় ভুলেছে। বলতে বলতে বিকটাকার মৃত্যু এসে উপস্থিত, বৃদ্ধকে বললে—বৃদ্ধ, আমায় ডাকছিস্ কেন? বৃদ্ধের বাঁচবার ইচ্ছা প্রাণে প্রাণে। আমতা আমতা করে সভয়ে বললে—মহাশয়, বোঝাটা বড় ভারী। একলা তুলতে পারছিলুম না। তাই তুলে দিতে আপনাকে ডেকেছি। আমাদেরও অনিত্য বিষয় ছাড়তে ঠিক এইরূপ হয়।

গীতার আরম্ভটি বড় সুন্দর বলে বোধ হয়। দুই দল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, উভয় পক্ষে মহা মহা বীর রয়েছেন—সকলের এক এক শাঁখ ছিল, শাঁখের আওয়াজে তখন যোদ্ধা চেনা যেত। চারিদিকে শাঁখ বেজে উঠল। এমন সময় অর্জুন বললেন—দুই দলের মাঝখানে আমার রথ রাখ, দেখি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কে? তখনও তাঁহার মোহ আসে নি, সম্পূর্ণ সাহস ছিল। শ্রীকৃষ্ণ রথ রাখলেন। অর্জুন দেখলেন, বিপক্ষ দলে ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ ভীষ্ম এসেছেন; যাঁর কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছেন সেই আচার্য দ্রোণ, অমর কৃপাচার্য, সমযোদ্ধা কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এসেছেন। কোন কোন টীকাকার বলেন, এই সব দেখে তাঁর একটু ভয় হয়েছিল। কারণ, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু বর ও পরশুরামকে যুদ্ধে জয়ের কথা, সিন্ধু-রাজতনয় জয়দ্রথের উপর শিবের বিশেষ বরের কথা এবং কর্ণের পরাক্রমাদিও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। এইজন্যে বিচিত্র নয়, তাঁর ভয় হয়েছিল। তাঁরা এ কথার প্রমাণস্বরূপ আরও বলেন, গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেন, তখন বিশেষ করে দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণকে মৃত দেখেছিলেন। তাতেই অর্জুন সংগ্রামে নিজে জয়ী হবেন এবং জয়-পরাজয় প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা ও কাজের পিছনে কার শক্তি বিদ্যমান, তা বুঝতে পারলেন। এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে। সমগ্র গীতাশাস্ত্র শুনে অর্জুন কুরুক্ষেত্র সমরের ভীষণ হত্যাকাণ্ড নিশ্চিন্তমনে করলেন ও দেখলেন। এতে তাঁর ধর্মভাব বা তদ্বিপরীত ভাব, কিসের পরিচয় পাওয়া গেল? অতএব গীতাগ্রন্থ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে কতকগুলি প্ররোচনাবাক্য-মাত্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞাতিবধস্বরূপ এই নৃশংস কার্যে প্রবৃত্ত করতে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত হন নি। মানুষ খুন করা, বিশেষতঃ জ্ঞাতিবধ করা কি বড় একটা সৎকার্য? উত্তরে বলা যেতে পারে, উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তবে এই মানুষ খুন করাতেই সত্য, ধর্ম ও যশোলাভ হয়। উদ্দেশ্য বুঝেই ভাল মন্দ। স্বদেশরক্ষার জন্যে যুদ্ধে নরহত্যা, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার-নিবারণের জন্য অত্যাচারী পিশাচের প্রাণদণ্ড প্রভৃতি স্থলে নরহত্যাও

মহৎ কাজ। চিতোর-অবরোধের সময় স্ত্রীলোকেরা চুল কেটে দিয়েছিল শত্রুদের মারবার জন্যে ধনুকের গুণ হবে বলে। নরহত্যা উদ্দেশ্য হলেও এঁদের দেবী বলে পূজা করতে ইচ্ছা কি স্বতঃই হয় না? কিন্তু নিজের সুখের জন্যে হত্যা করতে হত্যাকারীর মনই নীচু হয়ে নিষ্ঠুর পিশাচের ন্যায় হয়। অতএব ছোট-বড়, ভাল-মন্দ কর্মে বিদ্যমান নেই, কিন্তু কর্তার উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারিত হয়।

মনের আশ্চর্য গতি। একেবারে বিপরীত তিন-চারটে ভাবও এককালে মিলিত হয়ে মানবমনে উঠে থাকে, আমরা ধরতে পারি না। অর্জুনেরও তাই হয়েছিল। দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, আত্মীয়স্বজনদিগকে যুদ্ধে হত্যা করতে হবে দেখে তাঁর মোহ এসেছিল। ভালবাসা থেকেও বটে এবং পরাজয়ের ভয়েও বটে। হয়তো জয়টুকু তিনি ধরতে পারেন নি। ভালবাসায় মোহ এনে দেয় এবং মোহ অনেক সময় দুর্বলতা এনে মানুষকে কর্তব্য ও সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। যুদ্ধের পূর্বে অর্জুন সত্যের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, স্বার্থের জন্যে নয়, তিনি পাঁচখানা গ্রাম মাত্র নিয়ে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। যাতে যুদ্ধ না বাধে, তার জন্যে কত সচেষ্ট ছিলেন। যখন দেখলেন, যুদ্ধ না করলে অন্যায়, অবিচার ও অধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তখনই তিনি সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে দাঁড়িয়েছিলেন। অত্যাচার নিবারণ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যেখানে অন্যায় অত্যাচার দেখবে, সেখানে তার প্রতিকার করবে। এ সংসারে সব এক সূত্রে বাঁধা তোমাকে লাগলে আমাকে লাগবে। আমার উপর অত্যাচার দেখেও তুমি যদি চুপ করে থাক আর মনে কর, হয় হোক, আমার উপর তো হয়নি, আমার অপরের কথায় কাজ কি, তা হলে তুমি বিষম ভ্রমে পতিত। আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপরও অত্যাচার করা হল, বুঝতে হবে। তোমার মনের সদ্‌বৃত্তির উপর অত্যাচার করা হলো। আজ স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় অন্যায়ের প্রতিকার করলে না, কাল তোমার উপর যখন অত্যাচার হবে, তখন তোমার আর প্রতিকার করার সামর্থ্য থাকবে না। এইরূপে ধীরে ধীরে অবনতি এবং দাসত্বের পথে অগ্রসর হবে।

যুদ্ধস্থলে অর্জুনের মোহ এল; বললেন, এ সুখের আর দরকার নেই। আত্মীয়স্বজনই যদি মরে গেল, তো রাজত্ব নিয়ে করব কি। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, অর্জুন ভয়টুকু লুকুচ্ছেন আর আপনার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলেছেন। মনে করেছেন, নিজের জন্যে লড়াই করতে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যে সত্যের জন্যে দাঁড়িয়েছেন, অন্যের উপর অত্যাচার প্রতিবিধান করতে, কর্তব্য পালন করতে দাঁড়িয়েছেন, তা ভুলেছেন। পূর্বে পূর্বে বকরাক্ষস-বধ ইত্যাদি স্থলে যেখানে যেখানে তাঁরা অন্যায় অবিচার দেখেছেন, সেখানেই ধর্মবোধে তার প্রতিবিধান করে এসেছেন। এখানে তা ভুলে গেছেন— মনে করেছেন, রাজ্য পাবার জন্যেই বুঝি যুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। সংসারে আমরা অনেক সময় এরূপ দেখতে পাই, রূপের মোহে, কাঞ্চনের মোহে ব্যস্ত হয়ে উদ্দেশ্য হারিয়ে বসে থাকি। যদি সাধনা থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্য আবার ফিরে আসে বটে, তা না হলে কেবল ছুটোছুটিই সার হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই দেখেই প্রথম দুটি শ্লোকে তাঁকে বিশেষ শিক্ষা দিয়ে বলছেন—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥"

—'হে অর্জুন, এই সময়ে তোমার মোহ কোথা থেকে এল? তোমার মত শ্রেষ্ঠ লোকের পথে বাধা দিতে এমন মোহ কেনই বা এল? হে অর্জুন, এ ক্লীবতা ত্যাগ কর। এ হৃদয়ের দুর্বলতা তোমাব মতন শক্তিমান পুরুষে শোভা পায় না। দূর করে দিয়ে ওঠ, লড়াই কর।' ওই থেকে একটা বিশেষ উপদেশ আমরা পাই—যেটা মোহ আনে, দুর্বলতা আনে—সেইটাই মহাপাপ। মনের সম্বন্ধে যেমন, শরীরের সম্বন্ধেও তেমনি। শারীরিক দুর্বলতা যাতে আনে, সেটা করাও পাপ। আজকাল ছেলেদের পাশের পড়ার ঝোঁকে শরীরের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না। এটা যে একটা পাপ, সে ধারণা আমাদের নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেলেরা বেরোবার পর আর তাদের শরীর বয় না। তারা হাত-পা'র ব্যবহার একেবারে ভুলে যায়। ফল, অনেক কার্যে অক্ষমতা। শরীর-সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার। না রাখলে দুর্বলতা আনে। শরীর ও মনের সম্বন্ধে যা অত্যাচার করবে, তার ফল ভুগতে হবেই হবে।

অর্জুন তারপর বলছেন, ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করব কি করে? গুরু দ্রোণকে মারব কি করে? তারপরই দেখতে পেয়েছেন, মুখে যে ধর্মভানটা করছেন, মনে তা নেই (মন টের পায় কিনা।) আর বলছেন—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং
ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং
শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥"

—'আমার কার্পণ্য-দোষ এসেছে, আমি দয়ার পাত্র হয়েছি। (কৃপণ-শব্দ দয়ার পাত্র, এ অর্থে ব্যবহৃত হত।) মনের আঁট গেছে। সব গুলিয়ে গিয়ে একটা দয়ার পাত্র হয়েছি। তাই প্রার্থনা করছি, অনুনয় কবছি, আমি তোমার শিষ্য, শিক্ষা দাও।' তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মনে গোলমাল কোথা হতে হয়েছে, তাই ধরে বলছেন—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

—'তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ, কিন্তু পণ্ডিত যে জন্যে শোক করেন না, তুমি তারই জন্যে শোক করছ।' এই দুই কথায় অর্জুনকে খুব ঘা দেওয়া হল। পণ্ডিতেরা কি বলেন? কোন্‌টা নিত্য? শরীর তো পরিবর্তনশীল। পণ্ডিত লোক এই অনিত্য শরীরের জন্যে কখনই শোক করেন না। তুমি শোক করছ। অতএব তোমার মন-মুখ এক নয়, তুমি পণ্ডিত নও। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কয়টি কথায় ধর্মরাজ্যের আবশ্যকীয় প্রধান দুটো জিনিস দেখলুম। প্রথম, কোনরূপ দুর্বলতা আসতে দেওয়া হবে না। তা হলে উদ্দেশ্যলাভ বহুদূর। দ্বিতীয়, মন-মুখ এক করতে হবে। এই

দুটো উপদেশ যদি জীবনে পালন করতে পারি, তা হলেই উন্নতির দ্বার মুক্ত হবে। যে যে পরিমাণে এই দুটো পালন করেছে, সে যেখানেই থাক্, সংসারে বা সংসারের বাইরে সেই পরিমাণে যথার্থ কাজ তার দ্বারাই হবে।

[২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সালে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ]

জ্ঞানযোগ

গতবার আমরা দুটি কথা বিশেষরূপে শিখেছি। প্রথম দুর্বলতা, শারীরিকই হোক বা মানসিকই হোক ; যা থেকে আসে, সে সমস্তই পাপ ; অতএব তা একেবারে ত্যাগ করতে হবে, কারণ, সে সময়ে মানুষ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য প্রভৃতি সব ভুলে যায়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মন-মুখ এক করতে হবে অর্থাৎ পণ্ডিতের মত কথা বলা অথচ কাজে অন্য রকম করা চলবে না। পরমহংসদেব বলতেন, মন-মুখ এক করাই প্রধান সাধন। সকল স্থানে সব বিষয়েই এ সত্য। কি ধর্ম-সম্বন্ধে, কি সাংসারিক বিষয়সম্বন্ধে, সব জায়গায় এর দরকার। অনেকে হয়ত বলবেন যে, মন-মুখ এক করে ধর্ম কর্ম হতে পারে, কিন্তু সংসার করা চলে না। কিন্তু সেটি ভুল। জগতের নানাবিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল মানুষ বেশ বুঝতে পারছে, বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি ঘোর সাংসারিক বিষয়েও যে যত পরিমাণে উদ্যম আনতে পারবে, যত পরিমাণে মন-মুখ এক করে খাটতে পারবে, তত পরিমাণে তার উন্নতি।

গীতা-সম্বন্ধে আর একটি কথা জানা আবশ্যক। যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা বলেছিলেন। সে কথা শুনলেই বা কে, লিখলেই বা কে ? যুদ্ধক্ষেত্রে তো ব্যাসও ছিলেন না, সঞ্জয়ও ছিলেন না, অথচ গীতাপাঠে দেখতে পাই, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুচর সঞ্জয় তাঁর প্রভুকে গীতা বলছেন আর মহর্ষি ব্যাস তা শ্লোকাকারে মহাভারতে নিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা জানলেন কি রকম করে ? গল্প আছে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ জানবার জন্যে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রার্থনা করায় ব্যাস তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা নিলেন না। তখন মহর্ষি ব্যাস তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্যে ঐ যোগদৃষ্টি সঞ্জয়কে দিয়েছিলেন। তাই সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের সব ব্যাপার দেখছেন আর ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন।

আজকার বিষয় জ্ঞানযোগ। মানুষের যখন মোহ আসে তখন আত্মজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই তাকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে না। যখন আত্মীয়-স্বজন কেউ মরে যায় বা জীবনপ্রবাহের একটা ভয়ানক পরিবর্তনরূপ আবর্ত এসে উপস্থিত হয় আর ক্ষুদ্র মানুষের যত কিছু মতলব একঘায়ে সব ভেঙ্গে দেয়, সেই শোকের সময় আত্মজ্ঞান যদি কারও থাকে, তবেই সে ঠিক থাকতে পারে। এইরূপ পরিবর্তন সকলেরই জীবনে

কখন না কখন এসেছে বা আসবে। অর্জুনের জীবনে এই মহাসমর সেই পরিবর্তন এনেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে আত্মজ্ঞানসহায়ে বীরাগ্রণী অর্জুন জীবনের এই মহাসন্ধিস্থল সহজে উত্তীর্ণ হয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কত লোকই না ঐরূপ স্থলে আশার আলোক না দেখতে পেয়ে পথহারা হয়ে অবনতি ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে! সে জন্যে গীতার প্রথমেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ। অর্জুনের প্রতিও বটে, আর সর্বদেশের, সর্বকালের, সকল মানবের প্রতিও বটে। এইজন্যে পরমহংসদেবও শিক্ষা দিতেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।' সংসারের মধ্যে সব পরিবর্তনশীল। জড়রাজ্যের অন্তর্ভূত সকলেই এই নিয়মের অধীন। কোথায় যাচ্ছে কি উদ্দেশ্যে, কে বলতে পারে? পরিণামবাদীরা (Evolutionists) বলেন, ক্রমোন্নতি হচ্ছে; হবার উদ্দেশ্য কি, তা বলতে পারেন না। বীজ থেকে গাছ, ফুল, ফল হচ্ছে: এর উদ্দেশ্য কি? কিসের জন্য এ খেলা? মানুষের মনে সর্বযুগে সর্বদাই এই প্রশ্ন উদিত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন উত্তর পায় নাই। ইউরোপের পণ্ডিতেরা বলেন, এর উদ্দেশ্য এক অপূর্ব সর্বাঙ্গসুসম্পন্ন সমাজ শরীর গঠন করা। আমাদের শাস্ত্রে বলে, এই যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের শৃঙ্খলরূপ বিচিত্র জগৎকার্য চলেছে, এ অনাদি। এই যে ব্যাপার, এ ভগবানের দিক থেকে দেখলে উদ্দেশ্যবিহীন লীলাবিলাস বা খেলামাত্র বোধ হয়, কারণ বিশ্বসৃজনে ভগবানের কোন এক উদ্দেশ্য-সাধনের ইচ্ছা আছে বললে তাঁতে অপূর্ণতা-দোষ উপস্থিত হয়। তাই শাস্ত্রকারেরা বলেন, সৃষ্টি তাঁর খেলামাত্র। তিনি যে সৃষ্টি করে বড় হলেন বা ছোট হলেন, তা নয়। কিন্তু আমাদের দিক থেকে দেখলে অর্থাৎ মানুষ এ জগতে এসে নানা চেষ্টা কেন করছে, এ কথা ভাবলে উদ্দেশ্য এই বোধ হয়, সংসারবন্ধন কেটে আত্মজ্ঞান লাভ করা, পূর্ণত্ব লাভ করে সমস্ত দুঃখকষ্টের হাত অতিক্রম করা। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা যায় যে, ঐরূপ ইন্দ্রিয়জিৎ, আত্মজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জীবমুক্ত মনুষ্য-সমাজ সর্বাঙ্গপূর্ণ হবে অর্থাৎ সে সমাজে সকল অঙ্গের মনের ভিতরের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ায় সদা শান্তি ও আনন্দ বর্তমান থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, অর্জুনের এ মোহ আত্মজ্ঞান ভিন্ন যাবার নয়, তখন তিনি বললেন—

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।"

—তুমি, আমি যে কখন ছিলাম না বা থাকব না, তা নয়। আত্মা অজর, অমর। এই শরীর জড়। যে জিনিস জড় হতে উৎপন্ন, তাকে জড়ের নিয়মে থাকতে হবে। যা সূক্ষ্ম, জড় অর্থাৎ মন হতে প্রসূত, তা সূক্ষ্মের নিয়মে চলবে। যা জড় হতে উদ্ভূত, তাকে নিত্যকাল ধরে রাখবার চেষ্টা বৃথা। জড়ের নিয়ম পরিবর্তনশীলতা। তাকে পরিবর্তিত হতে দেব না, একভাবে চিরকাল রাখব, এ চেষ্টা মূর্খের কাজ, অজ্ঞানের কাজ। সংসারে এ চেষ্টা প্রতিনিয়ত হচ্ছে। কোন সময়ে যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জগতে আশ্চর্য কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ ॥"

—রোজ রোজ লোক মরছে, দেখতে পাচ্ছি। সংসারের মধ্যে এমন কেউ নেই যে একজনকে-না-একজনকে মরতে দেখেনি। তবু সকলেই এমনভাবে কাজ করছে যেন সে অমর। সকলের ভেতরেই এই জড় শরীরকে চিরকাল ধরে রাখবার বাঞ্ছা।

জড়ের ষড়্বিকার আছে। জন্ম, কিছুকাল অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি বা সুপক্কাবস্থা ক্ষয় বা হ্রাস ও বিনাশ—এই ছয় অবস্থাভেদ। শাস্ত্র বলেন, মনও সূক্ষ্ম জড় হতে তৈরি। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, Mind, Spirit, Soul—সব একই জিনিস। আমাদের দেশে চার্বাকের মতও তাই! মন বা আত্মা মস্তিষ্কের কার্য মাত্র। মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে এর উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে। কোন কোন পরিণামবাদী পণ্ডিত বলেন, মনটা মস্তিষ্কের কার্যমাত্র নয়, ও এক স্বতন্ত্র পদার্থ—ঐ সর্বদা 'আমি', 'আমি' করছে, এবং ঐ আত্মা। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, মানসিক শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। মনও জড়ের ন্যায় পরিবর্তনশীল—এ কিরূপে আত্মা হবে? অতএব শাস্ত্রকারেরা বলেন, আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ। শরীরের দ্বারা যেমন, মনের দ্বারাও তেমনি কাজ করাচ্ছেন বা চালাচ্ছেন। প্রশ্ন হতে পারে—মন খারাপ হলে পাগল হয়;—আত্মা যদি মন থেকে স্বতন্ত্র পদার্থই হবে, তবে শরীরের এবং মনের পরিবর্তন তাতে লাগে কেন? তাকে অন্যরূপ করে দেয় কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে, আত্মা কিছুতেই পরিবর্তিত হন না; তবে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তার অন্য কারণ আছে। ধর—একজন একটা বেহালা বাজাচ্ছে, হঠাৎ তার ছিঁড়ে গেল, আর বাজল না। এ স্থলে যে বাজাচ্ছে, তার দোষ, না, বেহালার দোষ? সেইরূপ আত্মা রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি ভোগ করবার জন্যে মন ও দেহরূপ যন্ত্র সৃষ্টি করেছে। এ বিকল হলে আর কাজ হয় না। কিন্তু যন্ত্র বিকল হয়ে পূর্বের ন্যায় আওয়াজ না বেরুলেও আত্মা যন্ত্রী যেমন তেমনি থাকে। আমাদের শাস্ত্র এইরূপে শরীর ও মন হতে আত্মার পার্থক্য দেখিয়েছেন। শরীর ও মন জড়, আত্মা চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ। শরীরের ন্যায় মনেরও উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ। আত্মা নিত্য ও অবিনাশী।

"নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

—'আত্মা নিত্য, পরিবর্তনরহিত এবং সকলের মধ্যে একভাবে রয়েছেন।'

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥"

—'এই দেহীর দেহে যেমন কৌমার, যৌবন, জরা আসছে, মরে গেলেও তেমনি একটি দেহ আসে অথবা পুনর্জন্ম হয়। আমাদের শরীরের যেমন বৃদ্ধি, পূর্ণতা এবং হ্রাস রূপ নানা পরিবর্তন আছে, দেহান্তরপ্রাপ্ত হওয়াও তেমনি একটা।' শাস্ত্র আরও বলেন যে, একথা আমরা যোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ জানতে পারি।

আত্ম পরিবর্তিত হন না। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, তবে ভোক্তা কাকে বলি ? কে ভোগ করছে ? কে সুখী, দুঃখী হচ্ছে ? বেদ বলেন, যতক্ষণ আত্মা আপনাকে ইন্দ্রিয় ও মন-যুক্ত বোধ করেন, ততক্ষণই তিনি ভোক্তা থাকেন; যখন ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সম্বন্ধ ঘুচে যায়, তখনই আত্মা আপনার যথার্থ পূর্ণস্বরূপ অনুভব করেন। শাস্ত্রে তাই বলে, আমরা যে আপনাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয়-যুক্ত ভাবছি, এটাই আমাদের কারণ-শরীর। কেননা, যথার্থ আমরা কে, একথাটি ভুলে গিয়ে যদি আমরা আমাদিগকে শরীর ও মন-বিশিষ্ট বলে না ভাবতুম, তা হলে অজ্ঞান, দুঃখ ও মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই আমাদিগকে স্পর্শ করত না। ঐ ভুলে যাওয়াটাই যত নষ্টের গোড়া, অতএব ঐটেই কারণ-শরীর। কেবলমাত্র জ্ঞানলাভেই এই শরীরের নাশ হতে পারে, অন্য কোন উপায়ে হয় না। কিন্তু আপনার স্বরূপ ভুলে গেলেও আত্মার বাস্তবিক ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, আত্মা চিরকাল পূর্ণ। মনবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলে ভাবলেই কি যথার্থ তাই হবে ? না, আত্মা যেমন তেমনি ঠিক আছে। পরমহংসদেব বলতেন, যেমন চকমকি পাথর চারশ' বছর জলের ভেতর রাখ, তুলে এনে ঠুকলেই যে-কে সেই, আগুন বেরুচ্ছে, আত্মাও ঠিক তাই। শরীর মনকে যখনই দেখে বন্ধন, তখনই তা ফেলে দিয়ে আপনি কে, জেনে নেয়। আমরা সংসাররূপ স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নও তো নানারকম দেখি। যেন আমি মরে গেছি, যেন আমায় একজন কেটে ফেলেছে, রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে আর কাটা মুণ্ড ও ধড়টা সামনে পড়ে রয়েছে, আবার জাগলেই কোথাও কিছু নেই। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। সকলেই একদিন তেমনি জেগে উঠবে। সেইজন্যেই শাস্ত্রকার যাস্ক বলেন, আত্মজ্ঞানে আর্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলের সমান অধিকার। সকলকে তা শিখাও। কে জানে, কার আত্মা কখন জাগরিত হবে ? পরমহংসদেব বলতেন, যদি তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় তো তিন বছরে, তিন মাসে বা তিনদিনেও আত্মজ্ঞান লাভ হতে পারে।

গীতাও বলেন—

"স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।"

—'মৃত্যুকালে যদি ক্ষণমাত্রও এই জ্ঞানের উদয় হয় তো সমস্ত অজ্ঞান নাশ হয়ে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়।'

এই আত্মজ্ঞানই বেদের মূলভিত্তি, ভারতের একমাত্র জাতীয় ধন। ভারত হতেই অপরাপর দেশে এই জ্ঞানের প্রচার হয়েছে। যেদিন ভারত এই জ্ঞানের কথা ভুলবে, সেদিন জাতীয়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে তারও নাশ হবে। অপরাপর দেশের লোকের এই জ্ঞান যথাযথ বুঝতে এবং অনুভব করতে এখনও ঢের দেরি। ধর্মরাজ্যে এখনও আমরা জগতের গুরুস্থানীয় রয়েছি। ইংরেজ প্রভৃতি অপরাপর জাতকে বাণিজ্য, রাজনীতি, যুদ্ধাদি অপর সমস্ত বিষয়ে গুরু স্বীকার করে শিক্ষা করো, কিন্তু ধর্মে এ স্থানটা অধিকার করবার এখনও তারা উপযুক্ত হয় নি। ধর্মের জীবন্ত মূর্তি পরমহংসদেব প্রমুখ সাধুদের ছেড়ে বিদেশী, বিধর্মীর নিকট আপন ধর্মের মহিমা শুনতে যাওয়ার চেয়ে

মূর্খতা আর কি হতে পারে? আজকাল কোন কোন সম্প্রদায় বৈদিক ধর্মের দুচারটে তত্ত্ব আপনাদের ভিতর উল্টো করে ঢুকিয়ে নিয়ে যথার্থ ধর্ম বলে শিক্ষা দিচ্ছে। কেউ বা বলছে, এককোটি জন্মের পর মানুষ চাক আর নাই চাক, মুক্ত হবেই হবে এবং তার আত্মজ্ঞান হবে। এরূপ কর্মবাদ, ঘোর অদৃষ্টবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বেদ কখনো এরূপ শিক্ষা দেন না। বেদ বলেন, মানুষ মনে করলে এখনি মুক্ত হতে পারে, অথবা না মনে করলে অনন্তকাল স্বপ্ন দেখতে পারে। মানুষের মুক্তি হবার একটা নির্দিষ্ট সময় কোথাও দেওয়া হয়নি। পুরাণাদিতেও বলা আছে মাত্র যে, চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে জীব মনুষ্যজন্ম পায়। মুক্তির একটা নির্দিষ্ট সময় কেমন করেই বা হতে পারে? জন্মমরণাদিতে আত্মার তো কোন দোষ বাস্তবিক লাগেনি। আত্মা যেন নিদ্রিত; যেদিন ঘুম ভাঙ্গবে, সেদিন মুক্ত হবে। আত্মা সর্বশক্তির আধার; যেদিন তা উপলব্ধি করবে, যেদিন জানবে আমি রাজার ছেলে, সেদিনই স্বস্থানে চলে যাবে, আপন মহিমায় বর্তমান থাকবে। কোন কোন সম্প্রদায় বলছেন, 'চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গনিবাসী মুক্তাত্মাদিগের সহিত তাঁহারা বিশেষ সম্বন্ধে অবস্থিত। নিত্য তাঁহাদের সহিত দর্শন, স্পর্শন এবং পত্রপ্রেরণাদি পর্যন্তও হইয়া থাকে।' বেশ কথা, হয়ে থাকে হোক! কিন্তু বেদপুরাণাদি ধর্মগ্রন্থে যখন তাঁদের কিছুমাত্র নামগন্ধ নেই, তখন তাঁদের পরিচয় নেবার জন্যে আমাদের ব্যগ্র হবার প্রয়োজন নেই। আয়ু অল্প; যে যা বলবে, তাই নিয়েই ছুটোছুটি করে হয়রান হবার সময় কোথা?

আত্মায় সুখদুঃখের লেশ লাগছে না; তিনি পূর্ণ। কিন্তু শরীর এই জড় রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, মানুষের মরবার সময় কি হয়? স্থূল শরীরটা, যেটা নিয়ে মন খেলছে, তখন একেবারে বিকল হয়ে যায়, —তখন লোকে ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে ফেলে দিয়ে যেমন নূতন কাপড় পরে; আত্মা তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নূতন শরীর ধারণ করে আর এই শরীরে যে সমস্ত চিন্তা, চেষ্টা ও কার্য করা হল, তার সংস্কার মনের সঙ্গে থেকে যায়। মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় এবং রূপরসাদির সংস্কার—এইগুলি আত্মার সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম জড়ে প্রস্তুত। মন ও ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের মৃত্যুতে নষ্ট হয় না, মৃত্যুর পরেও আত্মার সহিত সংযুক্ত থাকে। অথবা স্থূল শরীরটা ফেলে দিলে আত্মার, আমি শরীর ও ইন্দ্রিয়বান, এ বোধ নাশ হয় না। তখন পূর্ব শরীরের সংস্কারানুযায়ী হয়ে আত্মার অন্য একটা স্থূল শরীর ধারণের বা গঠনের ইচ্ছা হয় এবং যে পিতা-মাতার ঔরসে জন্মিলে আপন সংস্কার-বিকাশের উপযোগী শরীর পাওয়া যাবে, তাঁদের নিকট আকৃষ্ট হয়। পূর্বানুষ্ঠিত কর্মই তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। ঐ সূক্ষ্ম শরীরের দৈর্ঘ্য, বিস্তার বা গুরুত্বাদি নাই এবং গর্ভাধানের দিন হতেই মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। সূক্ষ্ম শরীর চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সেটাও জড়। বায়ু এবং আকাশের চেয়েও তা সূক্ষ্ম। মৃত্যুর পূর্বে স্থূল শরীরের সাহায্যে যতদূর শিখে গেছে, নূতন জন্মে নূতন স্থূল শরীর পেয়ে আত্মা তার পর থেকে কাজ আরম্ভ করে এবং জ্ঞানলাভ করতে থাকে।

পূর্বে যা বলা হল, তা থেকেই বেশ বোঝা যায়, কেন আমরা সকলে সমান বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পদ নিয়ে সকল বিষয়ে সমান হয়ে সংসারে জন্মাই না, কেনই বা সংসারে একটি মানুষের শরীর মন আর একটির সঙ্গে সমান হয় না? কেনই বা মানসিক, আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই আমাদের ভিতর স্বাভাবিক প্রভেদ বর্তমান? পুনর্জন্মবাদ হতেই এর বেশ মীমাংসা হয়। পিতার দোষগুণ সন্তানে আসে, এই কথা বলে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই সর্ববাদিপ্রত্যক্ষ ভেদ বা বৈষম্যের মীমাংসা করেন, কারণ, শারীরিক নানা প্রকার রোগ, মানসিক অশেষবিধ দোষ বা গুণ পিতা হতে অনেক পরিমাণে সন্তানে আসে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সব স্থলে দেখা যায়, ছেলে বাপের মত আদৌ নয়, সেখানে তাঁরা শিক্ষার তারতম্য বলে বোঝাবার চেষ্টা করেন। এইরূপে দোষটা সব বাপের ও গুরুর উপর এসে পড়ে। তাঁরা উক্ত ব্যক্তিগত বৈষম্যের অন্য সমাধান দিতে পারেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, এ প্রভেদ কর্ম-অনুসারে হয়। মানুষ যখনি যে কাজ করে, তা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে করে এবং এ উদ্দেশ্য লাভ করতে তার নিজের ভেতরের এবং বাইরের কতকগুলি শক্তিকে এক বিশেষভাবে চালিত করে থাকে। ঐ সকল শক্তি যখন জাগরিত ও চালিত হল, তখন ফলস্বরূপ কতকগুলি পরিবর্তন এনে দেবেই দেবে। ঐ পরিবর্তনগুলিকে আবার তার মন ভাল বা মন্দ, সুখ বা দুঃখ বলে বোঝে বা অনুভব করে। যদি ভাল বা সুখ বলে বোঝে, তো মন সেগুলিকে চিরকাল ধরে নিজস্ব করে রাখতে চায়। আর যদি মন্দ বা দুঃখ বলে বোঝে বা ভবিষ্যতে সেগুলি নিশ্চিত দুঃখ এনে দেবে এমনও বোঝে, তা হলে মন সেগুলিকে যে-কোন উপায়ে হোক, তাড়াবার চেষ্টা করে। এইরূপে বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, আবার সেই গাছে ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক কর্ম হতে সুখ বা দুঃখভোগ এবং অপর কর্মও এসে উপস্থিত হয়। অনেক কর্মের ফল বা সুখদুঃখভোগ হবার এ জন্মে সময় হল না, দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই তা পরজন্মে হয়ে থাকে।

বেদান্তে মনুষ্যকৃত সকল কর্মের পাঁচ ভাগে বিভাগ করা হয়েছে, যথা—নিত্য, আগামী, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও প্রতিষিদ্ধ। নিত্য কর্ম শৌচসন্ধ্যাদি প্রত্যহ করতেই হয়। করলে বিশেষ ফল নেই, না করলে দোষ আছে। প্রতিষিদ্ধ কর্মগুলি করতে শাস্ত্র নিষেধ করেন, যেমন—চুরি করো না, খুন করো না ইত্যাদি। সঞ্চিত কর্মগুলি মানুষ পূর্ব পূর্ব জন্মে করে ফেলেছে। কিন্তু এখনও তাদের ফলযোগ করতে বাকি রয়েছে। তাদেরই মধ্যে কতকগুলির ফলভোগ-স্বরূপ মানুষ এ জন্মে ভাল বা মন্দ শরীর, মন ও নানা চেষ্টা প্রাপ্ত হয়েছে। এইগুলির নামই প্রারব্ধ। আর এই জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম-গুলিকে বা যে কর্মগুলির ফলে পরজন্ম হবে, তাদের আগামী কর্ম বলা হয়েছে। আগামী, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ—এই তিন প্রকার কর্ম বোঝাবার জন্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁর রচিত গ্রন্থে একটি বেশ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যথা—একজন লোক ধনুক ধরে তীর ছুঁড়ছে। একটা তীর ছুঁড়ে ফেলেছে। একটা ছুঁড়বে মনে করে ধনুকে লাগিয়েছে আর কতকগুলো তার পিঠে বাঁধা—তূণে রয়েছে। যেটা ছুঁড়ে ফেলেছে, সেটা

যেখানে হয় লাগবে। ঐ তীরটার সঙ্গে প্রারব্ধ কর্মের তুলনা করা যেতে পারে। ঐ কর্মের উপর মানুষের কোন হাত নেই। ঐ কর্মের ফল তার শরীর মন ভোগ করবেই করবে। ইচ্ছা করলেও সে ঐ ফলভোগ রোধ করতে পারবে না। সেই জন্যে মুক্ত পুরুষেরা আত্মজ্ঞান লাভ করেও প্রারব্ধ কর্মের ফল শরীরে ভোগ করেন।

যে তীরটা ছুঁড়বে বলে হাতে নিয়েছে সেটাকে আগামী কর্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঐ তীরটা যেমন সে ছুঁড়তেও পারে, না ছুঁড়তেও পারে সেইরূপ আগামী কর্ম মানুষ ইচ্ছা করলে রোধ করতে পারে। যে তীরগুলি পিঠে বাঁধা রয়েছে, সেইগুলোর সঙ্গে তার সঞ্চিত কর্মের তুলনা হতে পারে।

শাস্ত্রকার বলেন, যে কর্ম করছ তার ফলভোগ করতেই হবে। একটা কর্ম আবার অন্য কর্ম প্রসব করে। এইরূপে কর্ম-বন্ধন দিনে দিনে, জন্মে জন্মে বাড়তে থাকে। এর শেষ কবে হবে? যেদিন আত্মজ্ঞানলাভ হবে—মানুষ যেদিন দেখবে সে অখণ্ড, অবিনাশী, জরামরণরহিত পূর্ণানন্দময় আত্মা। সে কখনও ভোগ করেও নি, করবেও না। শরীর ও মনই এতকাল কাজ করেছে ও ভোগ করেছে। জবাফুলের পাশে থাকাতেই রংটা কাচের গায়ে লেগেছে, কাচটা লাল দেখিয়েছে, তা বাস্তবিক কাচের রং নয়। অথচ শুদ্ধস্বরূপ আত্মা আছেন বলেই সব কাজকর্ম চলেছে। অতএব জ্ঞানলাভ হলেই আর কোন কর্মের জোর চলে না, সমুদয় সেই কর্ম শেষ হয়ে যায়, জ্ঞানাগ্নির তেজে সমুদয় ভস্ম হয়ে যায়।

"সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"
"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

এই জ্ঞানলাভই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। সুখই ভোগ কর বা দুঃখই ভোগ কর, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ওদুটোর একটাও নয়। সংসারেই থাকুক বা সন্ন্যাসীই হোক, ছাত্র-জীবনের মধ্যে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের ছুটোছুটির ভেতর যেখানেই থাকুক না কেন, মানুষ সকল অবস্থায় এমন ভাবে কাজ করতে পারে, যাতে তার প্রত্যেক কাজই তাকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেবে। লোকে মনে করে বটে, কিন্তু ধর্ম জিনিসটা সংসার থেকে আলাদা করে রাখবার জো নেই। এটা বোঝাবার জন্যেই যেন গীতার উপদেশ আরম্ভ হয়েছে রণভূমিতে, যেথায় হিংসা-দ্বেষের তরঙ্গ গর্জাচ্ছে। উদ্যমরহিত হয়ে থাকবার অবকাশ মাত্র নেই এবং মানব-মনের পৈশাচিক প্রবৃত্তিগুলোই নিঃসঙ্কোচে খেলতে দাঁড়িয়েছে। এখানে যদি ধর্মের সর্বোচ্চ উপদেশ ও অনুষ্ঠান চলে, তবে সংসারে আর এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে তা চলবে না? যে ধর্ম সকলের জন্যে নয়, সে ধর্ম কে চায়? তুমি সুখে থাক, শান্তি পাও আর আমি দুঃখ-কষ্টে মরি, এ শাস্ত্রকারের ইচ্ছা নয়। যথার্থ ধর্মের অনুষ্ঠান, গৃহস্থজীবনে বা সন্ন্যাস নিয়ে সব জায়গায় চলবে। ধর্ম সকলকে এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'মানুষ তুমি যে পূর্ণস্বরূপ, তাই আছ, হাজারই কেন মনে কর না তুমি ক্ষুদ্র, তোমার শরীর আছে, তোমার সুখদুঃখ-ভোগ হচ্ছে, তুমি মরবে ইত্যাদি, তুমি যা তাই আছ ও

থাকবে।' ধর্ম বলছেন—

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥"

—'যে কেউ আত্মাকে হন্তা বলে মনে করেন কিংবা মনে করেন আত্মা মরে, তাঁরা উভয়েই আত্মাকে জানেন না, আত্মা জন্মেনও না, মরেনও না।'

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।"

—'(আত্মা) কখনও জন্মেন না, বা মরেনও না।'

"বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥"

—'যিনি নিত্যস্বরূপ আত্মাকে জনেন, তিনি কাকেই বা মারবেন, কার দ্বারাই বা হত হবেন?' তিনি কিছুই করেন না। তাঁর শরীর-মন আমরণ আপনা-আপনি কাজ করে চলে যায়। সৎকাজ, পরোপকার প্রভৃতি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়।

দেখা গেল, আত্মজ্ঞান মানুষকে সুখদুঃখের পারে নিয়ে যায়। সেইজন্য মানুষ যখন শোকে মোহে অবশ হয়ে পড়ে তখন আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। ঐ জ্ঞান উপলব্ধি না করে, অর্জুনেরও শোক মোহ যায়নি। বিশ্বরূপ দর্শন না করে, এক মহাশক্তির হাতে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে রয়েছি, এ কথা অনুভব না করে কারও কোন দিন অজ্ঞান-প্রসূত শোক মোহ দুর্বলতাদির লোপ হয় না। অর্জুন যখন দেখলেন যে, সংসারে কারও কিছু করবার ক্ষমতা নেই, তখুনি তাঁর ভ্রম ঘুচলো, তখুনি তাঁর শোক মোহ দূরে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু যে এই আত্মতত্ত্ব বলে গেছেন মাত্র, তা নয়, কিন্তু সাধারণভাবে অর্জুনকে আরও অনেক বুঝিয়েছেন। বলেছেন, তোমার যশ যাবে, তোমাকে লোকে কাপুরুষ ঠাউরে অবজ্ঞা করবে, তার চেয়ে তোমার মরণ ভাল ইত্যাদি। একথাগুলি অনেক সময় লোকে না বুঝে দোষ দেয়। মনে করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে কি ছাই কথা বলছেন! তবে কি লোকে নিন্দা করবে বলে ভয়ে অসৎ কাজগুলোও করতে হবে? না, তা নয়। একটু তলিয়ে দেখলে ভগবানের এ কথাগুলিরও গভীর ভাব আছে দেখা যায়। দেখতে পাই, লোকে যার যশ করে, বাস্তবিক তার কোন-না কোন বিশেষ গুণ আছে। যদি গুণ না থাকে, তবে সে যশ স্থায়ী হয় না। ভাল কাজ করলে সাধারণ লোকে তোমার সৎ উদ্দেশ্য বিশেষ করে না বুঝলেও গুণ কীর্ত্তন করে। কারও দোষ-গুণ বিচার করবার জন্যে সম্মুখে ধরলে অশিক্ষিত অজ্ঞ মানুষও বুঝতে পারে। কেন না, সকলের ভেতর ভগবান রয়েছেন, তাঁর শক্তিতেই ভাল-মন্দ বোঝবার ক্ষমতাও তাদের স্বভাবতঃ রয়েছে। যদি তোমায় লোকে নিন্দা করে, তবে তার দুটো কারণ হতে পারে। হয় লোকে তোমায় বুঝতে পারে না তুমি এত উন্নত অথবা তুমি যথার্থ নিন্দার পাত্র। সে স্থলে আপনাকে

তোমার প্রথমতঃ বোঝা দরকার। স্থিরভাবে আপনাকে খুব তন্ন তন্ন করে দেখে তবে লোকের কথা তোমার উপেক্ষা করা উচিত। তাই ভগবান অর্জুনকে প্রথমেই দেখালেন যে মোহের জন্যেই তাঁর এই ভাবের উদয় হয়েছে—ভয় হয়েছে—তাই তিনি যুদ্ধ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছেন। তাই অকারণ লোকে তাঁর অযশ করবে না, এ কথা তাঁর জানা উচিত এবং মোহ ছাড়া উচিত—

ভগবান তার পর বলছেন—

"অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥"

—'আত্মা নিত্য জন্মাচ্ছেন ও নিত্য মরছেন, এ কথাও যদি স্বীকার কর, তা হলেও তোমার শোক করা উচিত নয়।' কারণ মরতে হবে, এটা সকলে জানে। যে দিন থেকে ছেলেটা জন্মাল, সে দিন থেকে সে মরবার দিকেই এগুতে লাগল। তাই বলছেন, এই অপরিহার্য বিষয়ের জন্যে ভাবলে কি হবে? শরীর তো নিশ্চিত যাবেই। আবার জন্মাবে। তবে তার জন্যে আর শোক কেন? এ বিষয়ে শোক করা মুর্খের কাজ।

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥"

—'মানুষ কোথা হতে এখানে এসেছে কেউ জানে না, কোথা যাবে তাও জানে না। এই যে সব সম্বন্ধ রয়েছে, তাও দুদিনের জন্যে, একথাও জানে। তবে আবার মিছে শোক কেন?' আর যদি মানুষকে অবিনাশী আত্মা বলে জেনে থাক, তা হলে সে তো কখন মরবে না, এ কথা স্থির। তবে আবার শোক কিসের?

"আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥"

—'সেই আত্মাকে কেহ বা আশ্চর্য হয়ে দেখে, কেহ বা এর আশ্চর্য স্বরূপ বলে, কেহ বা তাই অবাক্ হয়ে শুনে, আবার মন্দভাগ্য কেহ বা শুনেও এর বিষয় ধারণা করতে পারে না।'

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥"

—'যদি এই যুদ্ধে হেরে যাও, ক্ষত্রিয় তুমি, কর্তব্য পালন করে সম্মুখযুদ্ধে মরে স্বর্গে যাবে, জিতলে রাজ্য পাবে, অতএব যুদ্ধ কর।' কিরূপে যুদ্ধ করবে?

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।"

—'সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভ লোকসান সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ কর।' তা হলে পাপ

র্শ করতে পারবে না। কিছু দেখো না। কেবল কর্তব্য ও সত্য পালন করতে যুদ্ধ
াছ, এইটি দেখ। এই রকমে সংসারে যদি আমরা কাজ করতে পারি, সব সময়ে এই
ব যদি মনে রাখতে পারি, সংসারে এসে লাভ-লোকসানের দিকে নজর না রেখে যদি
রের চাকর-চাকরানীর মত কাজ করে যেতে পারি, কিছুতেই আর বন্ধন আসবে
। ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে অগ্রসর হব। এইটি জ্ঞানযোগের মূল কথা।

(২৭শে অগ্রাহায়ণ, ১৩ই ডিসেম্বরে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

জ্ঞানযোগ

গীতা প্রক্ষিপ্ত নয়, একথা আমি প্রথম বারে বলেছি। প্রক্ষিপ্ত নয়, তার একটা
রণ আছে। শাস্ত্রপাঠে দেখতে পাই, আমাদের দেশের দার্শনিকদের একটা
াধারণ গুণ ছিল। সেই গুণটার একটু আধটু এখানকার দেশীয় ও বিদেশীয়
র্নিকদের জীবনে এলে তাঁদের নিজের এবং অপর সাধারণের পরম লাভ হয়।
মাদের দেশের দার্শনিকেরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে কোন বিষয় প্রমাণ করে নিশ্চিন্ত থাকতেন
কিন্তু যাতে সেটা জীবনে পরিণত করতে পারেন তার চেষ্টা করতেন এবং পরিণত
ার পর ঐ সত্য জনসাধারণে প্রচার করতেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবন দেখলে বুঝতে
রবে, তিনি গীতাতে যা বলেছেন, তাঁর জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে তা অনুষ্ঠান করে
র সত্যতা দেখিয়ে গিয়েছেন অথবা গীতায় প্রচারিত সত্যসকল তাঁর জীবনেই প্রথম
্যক্ অনুষ্ঠিত দেখতে পাই। অতএব তিনিই যে গীতাকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
যোগের বিষয় পূর্বে কতক বলেছি। মনের শক্তি উদ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে পূর্ণভাবে
লত করার নাম যোগ। দেখতে পাই, কোন ছেলে চেষ্টা করেও লেখাপড়া শিখতে
রছে না, পাশ করতে পারছে না, এর কারণ কি? তার মনের শক্তি এক জায়গায়
করতে পারে না, আর কতকগুলি বিষয়ের দিকে মনের কতকটা সর্বদা পড়ে
ক; সে সমস্ত মন গুটিয়ে নিয়ে এক বিষয়ে দিতে পারে না। মনের শক্তি অন্য-
ক ব্যয় হয়ে যায়, সেজন্যে সে উদ্দিষ্ট বিষয় ঠিক আয়ত্ত করতে পারে না। যোগ
ন উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাতে পৌছুবার বা তা লাভ করবার সহজ উপায়।
সহজ উপায়টি কি? শরীর মনের সমস্ত শক্তি গুটিয়ে এনে ঐ বিষয়ে লাগান।
লাভ হোক, অথবা ধর্ম[illegible] হোক, পরের কল্যাণের জন্যে অন্য কোন কাজ হোক,
তে কৃতকার্য হবার জন্যে অন্য কোন কাজ হোক, অথবা পরের কল্যাণের সহজ
ায়ের সাধারণ নামই 'যোগ' দেওয়া যেতে পারে। সমস্ত মন গুটিয়ে আনবার শক্তি
থা থেকে আসবে? সকল শক্তিই আমাদের ভেতর রয়েছে। কেন না, আত্মাই
ন শক্তির আকর। শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি তাঁর হাতের যন্ত্রমাত্র। ঐ সকল যন্ত্র

নিয়ে তিনি এই অদ্ভুত খেলা খেলছেন। যন্ত্র খারাপ হলে যেমন কোন বিষয় ভাল করে করা যায় না, সেইরূপ মন, বুদ্ধি মলিন হলে আত্মার খেলাও তদ্রূপ হয়। তাঁর অশেষ শক্তি-প্রকাশের সুবিধা হয় না। কিন্তু মন, বুদ্ধি যদি খুব শুদ্ধ হয়, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হয়, তবে তাঁর ভেতরের শক্তির অদ্ভুত প্রকাশ হয়ে থাকে।

যোগ-শব্দ সাধারণভাবে প্রয়োগ করতে পারলেও আমাদের শাস্ত্রে তা কেবল ধর্মসম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখন জ্ঞানযোগ কাকে বলে, দেখা যাক্। পরমহংসদেব বলতেন, একজ্ঞানই জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান। কোন বিষয়ে কারও বাস্তবিক জ্ঞান হয়েছে, কখন বলব ? যখন সেই জ্ঞানের প্রকাশ—সে সকল জায়গায়, সকল জিনিসের ভেতর দেখবে। যার সুর-জ্ঞান হয়েছে সে সকল শব্দের ভেতরই সুরের খেলা দেখতে পায়। একটা জিনিস পড়ল, একখানা গাড়ী দৌড়ুল, একজন লোক কথা কইল, এই সব ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ কোন্ সুরের কোন্ পরদায় হল সে তা বুঝতে ও বলতে পারে এমন কি, সে ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখতে পায়। রঙের খেলাতে সৈ সুরের খেলা দেখতে পায়। সমগ্র জগৎ তার কাছে অপূর্ব স্বরলহরীমাত্র এবং নাদই জগৎকারণ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়। পিথাগোরসের অনুভব হত, সূর্য-চন্দ্রের ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব সুর চলেছে। তিনি উহাকে Music of the Sphere বলতেন। পরমহংসদেবের অনুভব হত, সমুদয় জগৎমধ্যে এক অপূর্ব ওঙ্কার-ধ্বনি উঠছে পাখীর ডাকে, নদীর তরঙ্গে, সমুদ্রের কল্লোলে, সেই ওঁ ওঁ ধ্বনি। সকল স্থানের সকল শব্দের ভেতর দিয়ে সকল সময়ে সেই অনাহত নাদ প্রবাহিত হচ্ছে।

সুরজ্ঞানের সম্বন্ধে যেমন, অন্যান্য বিষয়েও সেইরূপ। রূপ বা রস-জ্ঞান যার হয়েছে, তার কাছে সমগ্র জগৎ রূপ ও রসের বিকারমাত্র বলে অনুভূত হয়। বহুজ্ঞান সকলেরই রয়েছে। সুখদুঃখের জ্ঞানও সকলের আছে। স্থূলচক্ষে যাদের জড় বলে মনে হয়, সে সকল পদার্থও আঘাতে প্রতিঘাত দিয়ে নিজ জীবন এবং কিছু-না-কিছু জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে। আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদির জ্ঞান "জ্ঞানমেতন্মনুষ্যানাং যত্তেবাং মৃগপক্ষিণাম্" (চণ্ডী)—পশু, পক্ষী ও মানুষের সমানভাবেই রয়েছে, এ জ্ঞানকে আমরা জ্ঞান বলি না। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ের ভেতর যদি আমরা এক শক্তির বিকাশ, এক নিয়মের খেলা দেখতে পাই, তবে তাকে জ্ঞান বলে থাকি। ফলটা পেকে গাছ থেকে মাটিতে পড়ল, ঢিলটা ছুঁড়লুম—মাটিতে এসে পড়ল, মানুষ লাফ দিয়ে আকাশে উঠতে পারে না, পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ইত্যাদি জ্ঞানগুলিকে যত দিন না আমরা এক শক্তির প্রসূত বলে দেখতে পেয়েছিলাম, ততদিন ঐ বহুজ্ঞানগুলি আমাদিগকে জ্ঞানের পথে বড় বেশী অগ্রসর করেনি। আর যেই দেখলুম যে, ঐ সকলগুলি মাধ্যাকর্ষণ নামক এক শক্তির খেলায় হচ্ছে, অমনি আমাদের [illegible] কতদূর ব্যাপিল, কতগুলি বিষয়কে আমরা একসূত্রে গাঁথতে পারলাম, তা আর বলে [illegible]তে হবে না। এইরূপে পৃথক পৃথক পদার্থ ও অনুভবসকলকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ [illegible]ই জ্ঞান। এ সকল অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবার কয়েকটি শ্রেণীর অন্তর্ভু[illegible] পাওয়া যা এবং শাস্ত্র বলেন, প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যিনি এই সমস্ত শ্রে[illegible] একের অন্তর্ভু

দেখতে পান। এই একজ্ঞান একবার হলে আর কখনও অজ্ঞান আসতে পারে না; এইজন্যে গীতা বলেন, জ্ঞানী তিনিই, যিনি সদা সর্বত্র সেই একের প্রকাশ দেখেন। এই বহুজ্ঞানের ভেতর যিনি সেই এককে দেখতে পান, "একো বহুনাম্", তিনিই মৃত্যুঞ্জয় হন, সুখদুঃখের পারে যান।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবনের সর্বত্র এই শিক্ষাই দেখা যায় যে, জ্ঞানসহায়ে কিরূপে আমরা সেই একের কাছে পৌছুব! সে এক যাই হোক না কেন, তাতে কি এসে যায়? যা হতে এই সব হয়েছে, সেই তাই, সেখানে যেতে হবে। তাকে যাই বল না কেন, ঈশ্বর, ভগবান, কালী, ব্রহ্ম—ঠিক বলতে গেলে সে স্ত্রীলিঙ্গও নয়, পুংলিঙ্গও নয়, ক্লীবলিঙ্গও নয়। এখন সেই একজ্ঞান-লাভের উপায় কি? পরমহংসদেব বলতেন, একটা বিষয়ে যদি আপনার লাভ-লোকসান ভুলে ষোল আনা মন ঢেলে দিতে পার, তবে সেই একজ্ঞানে নিশ্চয় উপস্থিত হবে। সাধুই হও বা বিষয়ীই হও, যদি ষোল আনা হতে পার তো সেই একের প্রকাশ দেখতে পাবে। স্বদেশের জন্যে যদি ষোল আনা মন দিয়ে কেউ পাগল হতে পারে তো সেই দেশহিতৈষিতার ভেতর দিয়ে তার নিকট সেই একের প্রকাশ হবে। বিজ্ঞান, সংগীত, শিল্প প্রভৃতি যে বিষয়ের চর্চাই কর না কেন, যদি ষোল আনা মন দিয়ে কর তো তাই তোমাকে সেই জ্ঞানে নিয়ে যাবে। এ পরমহংসদেবের কথা। বড় নূতন কথা, বড় অদ্ভুত সত্য। শুনতে যেমন সোজা, করতে তেমনি শক্ত। সব বিষয়েই ঐরূপ দেখি। যেটা খুব সহজ, সেটাই আবার খুব শক্ত। যেটা খুব নিকটে, সেটাই আবার খুব দূরে। গলায় হার রয়েছে, চারদিকে খুঁজছি, এ ভ্রম প্রায় হয়। আত্মা অত্যন্ত নিকটে কি না, তাই বুঝতে পারি না। তিনি যে আমারই ভেতর, একথা বিশ্বাস করি না। তাঁর দেখা পাবার জন্যে পাহাড় পর্বত নানাদেশ ঘুরে উপোস করে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষে দেখি, আমারই ভেতর তিনি। পরমহংসদেব বলতেন, মানুষের মন যেন জাহাজের মাস্তুলের পাখী। কোন সময়ে একটা পাখী একখানা জাহাজের মাস্তুলের ওপর বসে ছিল। জাহাজখানা চলতে চলতে ক্রমে সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে পড়ল। পাখীটা বসে বসে বিরক্ত হয়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টায় উড়ল। কিন্তু চারদিকেই জল। উড়ে উড়ে কোথাও স্থল না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষে সেই মাস্তুলের ওপর এসে বসল। মানুষের মনও সেই রকম নানাদিকে নানাবিষয় অনুসন্ধান করে ক্লান্ত হয়ে, শেষে আপনার ভেতর সেই একের দেখা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

সর্বদা সকলের ভেতরে থাকলেও শুদ্ধ বুদ্ধির নিকট সেই একের জ্ঞান খুব কাছে। বদ্ধ জীবের জড় বুদ্ধির অনেক দূরে জ্ঞানযোগ সাধন করা বা জীবনে পরিণত করা শক্ত। অতি শুদ্ধ বুদ্ধি যাদের, তারাই পারে। বিচার করে কোন বিষয় ঠিক দেখে যখন তা তৎক্ষণাৎ কাজে করতে পারবে, তখনই তুমি জ্ঞান-সাধন করবার উপযুক্ত অধিকারী। মনে উঠল—বড়লোক হবো, দেশজুড়ে গণ্যমান্য হবো। অথচ বিচার করে দেখলে, এই দুদিনের জীবনে নামযশের চেয়ে ভগবানলাভের চেষ্টাই ঠিক। কিন্তু মনকে ধরে রাখতে না পেরে যদি তুচ্ছ ধনমানের জন্যেই ছুট, তা হলে তোমার দ্বারা

জ্ঞানযোগ হবে না, তোমার অন্য রাস্তা। যে জ্ঞানযোগের সাধক, মন তার মুঠোর ভেতর, আয়ত্তের ভেতর থকেবে, যা হুকুম করবে, তাই করবে। ভগবান যীশু যখন নিজ অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশের জন্যে চল্লিশ দিন উপবাস করে তপস্যা করেন, তখন শয়তান প্রলোভন দেখাতে এসেছিল। ধন দেবে, মান দেবে, রাজ্যসম্পদ দেবে, সুন্দরী স্ত্রী দেবে ইত্যাদি বলেছিল। তাই শুনে তিনি অমনি বলে উঠলেন, Get thee behind me, Satan ! বাসনা-শয়তান, দূর হও। আমাদের ভেতরও ঐ রকম অনবরত বাসনা উঠছে। নানান জন্মের বাসনা সব ফুটে উঠছে। আবার যখন সং উদ্দেশ্যে সাধারণ-কল্যাণের জন্যে কোন কাজ করতে যাচ্ছ, তক্ষুনি রক্তবীজের বংশের ন্যায় বাসনা-সন্তান শত শত এককালে জাগরিত হয়ে ব্যাকুল করে তুলছে। যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, তিনি ঐ সব বাসনাবীজ দেখতে এবং মন থেকে তাড়াতে পারেন। কিন্তু সংস্কার যদি বেশী দৃঢ় হয়, তবে আর শুধু বিচার করে তাড়াতে পারা যায় না। ঐ প্রকার লোকের অন্য পথ। সংস্কার অল্প হলে বিচার করে মন ঠিক রাখা যেতে পারে। জ্ঞানযোগ যিনি সাধন করেন, তাঁর বাসনা তত প্রবল নয়, মন সহজেই তাদের আয়ত্ত করতে পারে এবং স্থির থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ জীবনে মহাজ্ঞানীর ভাব প্রতিপদে দেখতে পাওয়া যায় জীবনের অতি সঙ্কটস্থলেও তাঁর কি অদ্ভুত সমুদ্রবৎ স্থিরত্ব ও গাম্ভীর্য। ফলফুল-শোভিত মধুর বৃন্দারণ্যে, শত্রুবেষ্টিত মথুরায়, রাজকুলসম্মানিত হস্তিনায়, রাগদ্বেষ-পূরিত রণস্থলে, পূর্বস্মৃতিমুখরিত প্রভাসে এবং স্ববংশ-ধ্বংসের সময়ও সেই স্থির, অচল, অটল ভাব। যদুকুলধ্বংস হবার পূর্বেই তিনি দেখলেন, কার্য-কারণ-প্রবাহের ফলস্বরূপ তা ঘটবেই ঘটবে। এদের কর্মেই এই ভীষণ ফল প্রসব করে। অশেষ চেষ্টায়ও যখন তা ফিরল না, তখন মহাজ্ঞানী গীতাকার স্থির হৃদয়ে আপন বংশের নিধন দর্শন করলেন। নিজের সামনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ মন অবিচলিত হয়ে চুপ করে আছে। স্বামীজী বলতেন, গীতার ভাব হচ্ছে intense activity-র ভেতর intense rest. অবিরাম কার্যের ভেতর অদ্ভুত বিশ্রাম, যোগীর অচল ভাব। গীতাসম্বন্ধে স্বামীজীর এইভাবে একখানি ছবি আঁকার ইচ্ছা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সারথিবেশে ঘোড়ার লাগাম ধরে সৈন্যদলের ভেতর রথ চালাচ্ছিলেন, এমন সময় বিষাদাভিভূত অর্জুন লড়াই করবে না বলাতে এক হাতে তেজীয়ান ঘোড়াকে টেনে আয়ত্তে রেখেছেন আর অর্জুনের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। শরীরের দ্বারা ঘোটক-সংযমরূপ মহা আয়াস করলেও মনের অনন্ত প্রশান্তভাবের জন্যে মুখে যোগীর ছবি আঁকা রয়েছে। ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের ভেতরও তাঁর মনের এই অপরূপ প্রশান্ত ভাব আঁকাবার তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল এই সময়ে কত রাজা মহারাজা মরবে, কোন্ পক্ষে জয় পরাজয় তার কিছুই ঠিক নেই সকলেই অস্থির, আত্মহারা, পাগল, কিন্তু তিনি স্থির, অটল, অচল হয়ে অপরের কল্যাণের জন্যে, ধর্মসংস্থাপনের জন্যে সকল কাজ চালাচ্ছেন আবার সেই সময়েই যোগের অতি গূঢ় বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন। এই স্থিরতা প্রত্যেক মানবের শিক্ষা করা চাই। কাজ করতে করতে আমাদের ভেতর 'কাজের মত্তত' এসে যায়। সেইটেই

খারাপ। তখন আমরা কাজ না চালিয়ে কাজ আমাদের চালায়, ইন্দ্রিয় আমাদের চালায়। প্রভু দাসপদে নত হয়, অহঙ্কৃত দাস প্রভুর প্রতি যা ইচ্ছা ব্যবহার করে। এই জীবনসংগ্রামে, কার্যক্ষেত্রে সেইজন্যে সদাসর্বদা স্থির থাকতে হবে। এইজন্যেই গীতার শিক্ষা শুধু সন্ন্যাসীর জন্যে নয়, সংসারীর জন্যেও নয়, কিন্তু সকল দেশের, সকল কালের, সকল লোকের জন্যেই প্রযুক্ত। এইজন্যেই গীতার অপর নাম গীতোপনিষৎ। কেন না, উপনিষদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিশেষত্বই—তাদের সর্বজনীন উদারতা ; সকল প্রকার অধিকারীর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়ে উপনিষদের ঋষি আবার মুক্তকণ্ঠে প্রচার করছেন, 'মানুষ, তুমি অমৃতের অধিকারী, অমৃতই তোমার স্বরূপ ; তুমি ভ্রমে পড়ে আপনাকে আর্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি যাই মনে কর না কেন, কিছুই তোমায় বাঁধতে পারে না। তুমি স্বাধীন, স্বাধীন, চিরস্বাধীন।' এই অপূর্ব উদারতা গীতার মধ্যে দেখেই মাহাত্ম্যকার লিখেছেন, সমস্ত উপনিষৎ মন্থন করে গীতার উৎপত্তি হয়েছে।

জীবন-সংগ্রামের এই মত্ততার ভেতর এই যোগীর স্থিরতা আমাদের আনা চাই। কাজ করতে গেলেই যে একটা reaction বা প্রতিক্রিয়া আসে, তার হাত থেকে বাঁচতে শেখা চাই। তবেই তোমার দ্বারা যথার্থ বড় কাজ হবে, তবেই তুমি ঠিক মানুষনামের যোগ্য হবে। ফলাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত এই কর্মমত্ততা কত সময় কত যে বিষময় ফল প্রসব করে, তা আর দেখিয়ে দিতে হবে না। ব্যবসাবাণিজ্যে লোকসান দিয়ে কত লোক হতাশ-সাগরে ডোবে, আর উঠতে পারে না ; পাস করার মত্ততায় পড়ে কত ছেলেই না একেবারে চিররোগী হয়ে পড়ে। আবার অশেষ চেষ্টায়ও পাস না করতে পেরে ছাত্রদের মধ্যে সময়ে সময়ে আত্মহত্যার অভিনয়ও দেখতে পাওয়া যায়।

এই মত্ততার ভেতর স্থিরতা আনতে শেখা সকলেরই প্রয়োজন, বিশেষতঃ সংসারী লোকের। কারণ, তার পক্ষে সাংসারিক ও পারমার্থিক সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে কর্ম, কর্ম, কর্ম এবং কর্মের ভেতর এই স্থিরতা আনতে পারলে উদ্যমের কিছুমাত্র হ্রাস যে হবে তা নয়, এ কথা গীতাকারের নিজ জীবনেই সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত জীবনের সহিত গীতার শিক্ষা মিলিয়ে নাও, দেখবে এতেও এতটুকু অনৈক্য নেই। স্বার্থের জন্যে কর্ম না করলেও তাঁর একার কর্ম-উদ্যম অসংখ্য লোকের উদ্যমের চাইতে অধিক দেখতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের খেলার ভেতর দেখ, মথুরার এবং দ্বারকার রাজসম্পদের ভেতর দেখ, যদুবংশধ্বংসের সময় দেখ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ, সব জায়গায় অপূর্ব কাজের মত্ততার ভেতর তাঁর হৃদয়ে এই অদ্ভুত স্থিরতা ও শান্তি দেখতে পাবে। কথিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধবার পূর্বে দুর্যোধন রাজাকে তিনি একাদশ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা প্রদান করেন। দুর্যোধন ভাবলে, একা শ্রীকৃষ্ণকে দলে না পেলাম, তাতে কি ? তাঁর একার উদ্যম কিছু আর একাদশ অক্ষৌহিনী লোকের উদ্যমের সঙ্গে সমান হবে না! কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঠিক তার বিপরীত। তাঁর উদ্যম ও অধ্যবসায়, বিপদ্‌কালে তাঁর অনন্ত উপায়-উদ্ভাবনী-

শক্তি, ঘোর নিরাশ-অন্ধকারে তাঁর প্রাণসঞ্চারিণী অগ্নিময়ী বাণী, আবার মৃত্যুর ছায়ার ভেতর স্বপক্ষের পরাজয়ের ভেতর তাঁর অপূর্ব অনবসাদ ও চিত্ত-প্রসন্নতা—এই সমস্ত গুণ তাঁকে একাদশ অক্ষৌহিণী কেন, ভারতসমরে সমাগত উভয় পক্ষীয় সমস্ত বীরের সহিত সমতুল্য করেছিল।

জ্ঞানযোগের সারকথা এই। জ্ঞানযোগের সাধন হচ্ছে, 'নেতি, নেতি'-বিচার অর্থাৎ যা একত্বে নিয়ে যাবার পথে অন্তরায়, তা বিচারপূর্বক এককালে পরিত্যাগ করা। জ্ঞানযোগ শুনে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, 'জ্ঞানী হলে, স্থিতপ্রজ্ঞ হলে তাঁর লক্ষণ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি কিরূপ হয়?' এই খরস্রোত কর্ম-প্রবাহের ভেতর যিনি সর্বদা নিজ জীবনকে স্থিরভাবে রাখতে পেরেছেন, তাঁর expression অর্থাৎ ভাষা, চাল-চলন এবং অপরের সঙ্গে ব্যবহার কেমন হয়? সিদ্ধপুরুষেরা যেমন ভাবে সংসারে কাজকর্ম করে গেছেন, সেই সকল আমাদের শিক্ষার জন্যে গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। প্রশ্ন হতে পারে, তাঁদের চাল-চলন দেখে আমরা শিখব কি করে? আমরা জড়বুদ্ধি, কর্মফলপ্রত্যাশী, কামকাঞ্চনলুব্ধ জীব, আমাদের জীবনে তাঁদের ন্যায় মহৎ উদ্দেশ্য তো নেই? নেই সত্য, কিন্তু সেই প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য, সেই প্রকার বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থ উদ্যম জীবনে না আনতে পারলে উন্নতির আশা কোথায়? আবার আমাদের ভেতর যারা গুরুর উপদেশে বিশেষ উদ্দেশ্যে জীবন চালাতে চেষ্টা করছে, কর্মাবর্তে পড়ে অনেক সময় তারা কি করবে, কিছু ঠিক করতে পারে না। অথবা সেই পথে চলতে যে নব নব ভাব ও অনুভব জীবনে উপস্থিত হয়, সেগুলি ঠিক কি না, এ সন্দেহে তাদের মন ব্যাকুল হয়, তখন এই সকল জগদ্‌গুরুর পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁদের জীবনের অনুভবের সঙ্গে নিজ নিজ জীবনের উপলব্ধি মিলিয়ে পেলে সংশয়-সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আবার চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। সেইজন্যে শাস্ত্র বলেন, সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে সাধক নিজ জীবনে আনবার চেষ্টা করবে। এই-ই তার পক্ষে প্রধান সাধন।

সাধকের নিজ জীবনের উপলব্ধির সঙ্গে গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য মিললে সে অনুভবে আর ভুল নেই, একথাও ধারণা করতে শাস্ত্র বলেন। শুকদেব আজন্ম জ্ঞানী হয়েও যতদিন না নিজের উপলব্ধ জ্ঞান—গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন, ততদিন তাঁর নিজের অনুভব ঠিক কি না, এইরূপ সন্দেহের হাতে মধ্যে মধ্যে পড়তেন এবং মহর্ষি ব্যাসকে এই সন্দেহ দূর করবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাস দেখলেন, আমি শুকের বাপ, আমার কথা সে বাল্যাবধি শুনে আসছে, তাতেও যখন সন্দেহ যায় নি, তখন এর অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। ভেবে চিন্তে তিনি শুককে রাজর্ষি জনকের নিকট গিয়ে তাঁকে গুরু স্বীকার করে উপদেশ নিতে বললেন। জনকের বাড়িতে গিয়ে শুককে সাতদিন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, কেউ খোঁজখবর নেয়নি। এরূপ অবজ্ঞাতেও তাঁর চিত্তে রাগদ্বেষাদির উদয় হল না। পরে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে রাজর্ষি জনক তাঁর অশেষ মান্য ও অদ্ভুত সেবা করতে লাগলেন। এরূপ সম্মানেও শুক তাঁর উদ্দেশ্য ভুললেন না। তখন জনক তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানের সমতা

ও অবিচলতা বুঝিয়ে দিলেন। জনকের কথাতে বাপের কাছে যেসব শাস্ত্র পড়েছেন, সেসব শিক্ষার আর নিজের উপলব্ধির একতা শুক যখন মিলিয়ে পেলেন, তখন তাঁর সকল সন্দেহ দূর হয়ে মনে শান্তির উদয় হল।

জ্ঞানীর লক্ষণ-সম্বন্ধে গীতা এখন কি বলেন, তাই দেখা যাক্।

> "প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
> আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥"

—'সকল বাসনা ছেড়ে যিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট হয়ে আছেন, যিনি কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে আয়ত্তাধীন করেছেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের বশ না হয়ে ইন্দ্রিয়গণকে আপন উদ্দেশ্যলাভের জন্যে খাটিয়ে নেন, তিনি যথার্থ জ্ঞানী।' জ্ঞানী পুরুষ আমাদের মতনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ কর্ম করেন, কিন্তু কখনও আপনার উদ্দেশ্য ভোলেন না। ইন্দ্রিয়গণ যে তাঁর চাকর এবং তিনি তাদের প্রভু, এ কথা সর্বদা মনে রাখেন। আমরা ঐ কথাটা কেবল ভুলে যাই। তাই ইন্দ্রিয় যে দিকে চালায়, সেইদিকে ছুটি। উপনিষৎ বলেন, আত্মা যেন রথী, এই শরীররূপ রথে আরোহণ করে রয়েছেন, ইন্দ্রিয় সেই রথের ঘোড়া এবং মন সেই ঘোড়ার লাগাম। বুদ্ধি সারথি সেই লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে রূপ-রসাদি বিষয়ের পথ দিয়ে জ্ঞান ও শান্তিরূপ লক্ষ্যস্থানের দিকে চালাচ্ছে। শিক্ষার গুণে সারথির নিজের মাথা ঠিক থাকলে ঐ সব পাগলা ঘোড়াদের ঐরূপ দুর্গম পথের ভেতর দিয়েও ঠিক চালিয়ে নিয়ে যান। আর তা না হলে ঘোড়াগুলো রাশ না মেনে কোন্ পথে যেতে কোন্ পথে নিয়ে যায়, কখন বা গাড়ীখানা উল্‌টেও দেয়। শুদ্ধ বুদ্ধি ঘোড়া চালিয়ে গন্তব্যস্থলে ঠিক উপস্থিত হয়। কিন্তু কামকাঞ্চন-বদ্ধদৃষ্টি মলিন বিষয়বুদ্ধি ঘোড়ার বশীভূত হয়ে পড়ে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হয়।

জ্ঞানীর অপর এক লক্ষণ হচ্ছে, তিনি সুখদুঃখ উভয় অবস্থাতেই স্থির থাকবেন। আমরা স্বার্থপর, নিজেদের সুখের জন্যে লালায়িত। এতটুকু দুঃখ উপস্থিত হলে একেবারে আত্মহারা হই; ইচ্ছায় নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে পরের কাজে যাওয়া তো দূরের কথা, ঘরের পাশে প্লেগ হয়, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত থাকি। এই যে দেশে এত দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, আমরা তার কি করছি? এ যদি ইউরোপের কোন স্থানে হত তো দেশের সমস্ত লোক একেবারে ক্ষেপে উঠত। বলত, কেন দুর্ভিক্ষ হবে? কেন আমার দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরবে? তারা জীবন উৎসর্গ করতো তা দূর করবার জন্যে। আমরা এ বিষয়ে জড়, মহাতমোগুণী; কাজে একেবারে অলস। ডিগ্‌বি সাহেব লিখছেন, বিগত ১০৭ বৎসরের লড়াইয়ে পৃথিবীর ভেতর যত লোক মরেছে, এই ভারতবর্ষে তার ৮ গুণ অধিক লোক মরেছে গত ১৯ বৎসরের দুর্ভিক্ষে। কি ভীষণ ব্যাপার! আমরা আবার চেঁচাই, বড়াই করি—আমাদের বাপ দাদা পৃথিবীতে ভারি বড়লোক ছিল। তারা বড়লোক থাকলেও তোমার কাজ দেখে তোমাকে তো সে বংশের সন্তান বলে বোধ হয় না; তুমি কি করছ, তা একবার ভেবে দেখ দেখি। তুমি, 'আমি ব্রাহ্মণ, জগতের পূজ্য' বললে কি হবে? যে সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, সে ভাবের

যে একেবারে লোপ হয়ে মহা জড়ত্ব আসতে বসেছে। আর এই মলিনমুখ, ছিন্নবস্ত্র ভারতের শ্রমজীবী, যাদের শূদ্র বলে চিরকাল পায়ে দলেছ, অথচ যাদের পরিশ্রম, যাদের অধ্যবসায়, যাদের শিল্পনৈপুণ্যের জোরে ভারত আজও বিখ্যাত, যাদের বংশধরদের নিকট হতে কর আদায় করে এখনও দেশে স্কুল, কলেজ এবং তোমাদের ছেলেদের শিক্ষার বন্দোবস্ত হচ্ছে, তাদের দিকে এখনও কি তোমরা ফিরে চাও, আপনার বলে দেখে তাদের দুঃখে একবারও কি দুঃখিত হও ? এই জাতীয় পাপের ফলেই আজ দেশের এই শোচনীয় অবনতি ! আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, কর্মফলদাতা কর্মের ফল দেবেনই দেবেন। ভাবের ঘরে চুরি হলে এইরূপই হয়ে থাকে। আমরা মুখে বলি, সর্বঘটে নারায়ণ আর সকল স্ত্রীতে দেবী জগদম্বার আবির্ভাব। কিন্তু কার্যকালে ও বেটা চাষা. ও-বেটা চাঁড়াল, ওকে ছুঁলে নাইতে হবে, ওর দৃষ্টিতে আমার ভাত নষ্ট হবে, ওর ছায়া মাড়ালে আমি অপবিত্র হব। এই মুখে একখানা, পেটে একখানা, কখনও কারও চেষ্টায় যদি দেশ হতে দূর হয় তো তা ছাত্রদের দ্বারাই হবে। ছাত্রেরা এখন থেকে শাস্ত্রকথিত এই সকল সত্য হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করে যদি প্রাণপণে দেশের এই অজ্ঞান দূর করে, তবেই হবে।

জ্ঞানীর লক্ষণে গীতা পুনরায় বলছেন—'বীতরাগভয়ক্রোধঃ'। আমি একটা জিনিস লাভ করতে বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা করছি। এমন সময় আর কেহ বা কিছু মাঝে এসে সেই পথের অন্তরায় বা বাধা হল। তখন তার প্রতি মনে যে ভাব ওঠে, সেইটেরই নাম ক্রোধ আর কোন কিছু লাভ করবার অতীব আগ্রহের নামই রাগ বা কাম। এই কাম ক্রোধ যার নেই, তার কোন বিষয়ে আসক্ত থাকে না। আমরা যে কাজই করি না কেন, যদি আসক্ত না হয়ে করি, তা হলে তাই আমাদের একজ্ঞানে নিয়ে যাবে। প্রত্যক্ষ দেখতে পাব, ধ্যানজপাদির ন্যায় প্রতিদিন করণীয় সাধারণ কাজ সকলও তখন যোগীর লক্ষ্য একজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব আসক্তি আসতে দেওয়া হবে না। উচ্চ উদ্দেশ্যে সব কাজ করতে হবে, অথচ স্থির থাকতে হবে। জ্ঞানী পুরুষ যেসব কাজ করেন, স্বার্থ-প্রসূত কাম-ক্রোধাদির বশে করেন না। অতএব ইন্দ্রিয়জয় করা, স্বার্থপর কামনা-বাসনা-ত্যাগ করা আর সুখ বা দুঃখে অবিচলিত থেকে উদ্দেশ্যে স্থির থাকাই জ্ঞানলাভের উপায়।

তারপর গীতাকার জ্ঞানের মহিমায় বলছেন—

> "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
> স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥"

—'হে পার্থ, ইহারই নাম ব্রহ্মে বুদ্ধি স্থির রাখা। একবার এই ভাব জীবনে এলে আর শোকমোহাদি এসে কষ্ট দিতে পারে না। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও একবার এই ভাব ঠিক ঠিক এলে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ হয়। অতএব যদি জ্ঞানী হও, নেতি নেতি করে সব ছেড়ে দাও। অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করে কাজ করতে হয়—করো। যদি সত্যের উদ্দেশ্যে সব ছাড়তে না পার, তবে তোমার পথ কর্মযোগ। বলতে পার, কর্ম তো সকলে করছে। তা করে

জ্ঞানলাভ কি করে হবে ? তা নয়। আপনার ভোগসুখাদির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম হাজার হাজার বৎসর করলেও তা কখনও আমাদের একজ্ঞানে নিয়ে যাবে না। যেমন শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদি সাধারণ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, পশু ও নরে সমান ভাবে আছে, সেইরূপ আপন সুখের জন্য কৃত কর্ম প্রকৃত কর্ম নহে। ঐ প্রকার কর্মও 'সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্'। ঐরূপ কর্মবন্ধনের ওপর বন্ধনই এনে দেয়। অতএব প্রকৃত কর্ম করবার কৌশল জানা চাই। নতুবা আমরা সকলেই তো কর্ম করছি। চুপ করে থাকবার তো জো নেই। জড়ের ভেতর, চেতনার ভেতর, সকলের ভেতরই কর্মকৃত এই অবিরাম গতি চলেছে। মনের ভেতর, বুদ্ধির ভেতরও সেই গতি সর্বদা ছুটছে।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।"

—সকলেই আপনার আপনার স্বভাবনিহিত গুণের বশে অবশ হয়ে কর্ম করছে। যার কাম বেশী, সে কামের চেষ্টায় ফিরছে। যার ক্রোধ বেশী, সে তার দাস হয়ে ছুটোছুটি করছে। যার লোভ বেশী, সে নিত্য নূতন জিনিসের পেছনে ছুটোছুটি করে হয়রান হচ্ছে। আবার যার সাধুতায় হৃদয় পূর্ণ, সেও সৎকাজের অনুষ্ঠানে জীবন কাটাচ্ছে। এইরূপে কর্ম সমস্ত জগৎ ব্যাপে অধিকার-স্থাপন করে রয়েছে। প্রত্যেক অণুর ভেতরে, রাসায়নিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুক্ষণ চলেছে। এও কর্মের রূপান্তর মাত্র। তোমার মনের ভেতর যেমন সর্বদা কাজ চলেছে, ওদের ভেতরেও তেমনি। অতএব কাজ করছ বলেই যে একত্ব লাভ করবে তা নয়। 'কর্মযোগেন যোগিনাম্।' যোগের আশ্রয় নিয়ে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে, তবেই হয়। এমন ভাবে সকল কাজ করতে হবে, যাতে সেই একজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। গীতা বলছেন, কাজ কখনও ছেড়ো না। কিন্তু এ.ন কৌশলে কর, যাতে তোমায় কাম-কাঞ্চনে না বাঁধতে পারে।

গীতাতে কর্ম করা উচিত কি না, এ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক কথা বলা হয়েছে, দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি, এক একবার মনে হয়, কর্ম করা যে উচিত এবং যতক্ষণ শরীর থাকবে, ততক্ষণ সকলকেই যে কোন না কোন ভাবে কর্ম করতে হবে, এ সব তো স্বতঃসিদ্ধ সত্য, এর উপর গীতাকার এত কথা কেন বলছেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গীতোপদেশের পূর্বাবধি ভারতে দর্শনের চর্চা অত্যধিক হয়েছিল। দর্শনের নানা মত নিয়ে নানা সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়েছিল। দর্শনচর্চার ফলে এও স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মন অন্তবিশিষ্ট, নামরূপ বা দেশকাল ও কার্যকারণ-শৃঙ্খলের গণ্ডির বাইরে মনের যাবার শক্তি নেই এবং কোন কালে যেতেও পারবে না মনের এই সসীম স্বভাব-সম্বন্ধে সকল দর্শনকারই একমত ছিলেন। অতএব তাঁদের সকলের অনুসন্ধানের এই এক উদ্দেশ্যই হয়েছিল যে, মানুষ কি করে এই সসীম মনের পারে গিয়ে অনন্ত সত্যের অধিকারী হতে পারে। মন যখন সীমাবদ্ধ, কখনও অনন্তকে ধরতে পারবে না, তখন সম্পূর্ণরূপে মন স্থির করে বসে থাকা, সত্য লাভ করবার ইহাই এক-মাত্র উপায় বলে প্রচারও হয়েছিল। ঐরূপ প্রচারের ফলে অপর সাধারণ লোকেরাও বুঝুক, আর নাই বুঝুক, সেই দিকে যেতে লাগল। ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ মনকে যথার্থ স্থির

করে নিলেন, কিন্তু জড়-দর্শী অপর সাধারণ কেবল মাত্র বাইরে কাজ ছাড়ল, কেহ কেহ বা নামমাত্র সন্ন্যাসী হল। সাধারণের সেই বিপরীত বুদ্ধি ফিরিয়ে আনবার জন্যেই গীতাকারের কর্ম করা উচিত কিনা এই বিষয় নিয়ে এত তর্কের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই জন্যেই তাঁর যথার্থ কর্মই বা কি, কেমন করেই বা করতে পারা যায় এবং যথার্থ কর্মরহিত হয়ে সকল বন্ধন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়াই বা কি, তা বোঝাবার এত চেষ্টা। এই জন্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের অনেক স্থলে কর্মযোগ কাকে বলে, এ কথা সবিস্তার বুঝিয়েছেন।

(১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর, বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ

কর্মযোগ

ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষের ধর্মই বল, দর্শনই বল, কেবল বৈরাগ্যের কথাই বলছে—সংসারের কোন বিষয়ে মন দিও না, কেবল ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, এই কথাই বলছে। তাঁরা বলেন, সেইজন্যেই হিঁদু জাতটার ভেতর একটা melancholy বা বিষাদের ছায়া, একটা কর্মে উদাসীনতা বা উদ্যমরাহিত্য, দুদিনের জীবনে এসব আর কেন, এইরকম একটা ভাব এবং তার ফলস্বরূপ আলস্য ও জড়তা এসে পড়েছে। কথাটা কতদূর সত্য, তা গীতা পড়লেই বুঝতে পারা যায়। ভগবান গীতাকার কেবল যে বার বার বলছেন, কর্ম ছেড়া না, তা নয়। কিন্তু নিজ জীবনে প্রতিক্ষণে দেখাচ্ছেন, intense activity with intense rest—অপূর্ব কর্ম-উদ্যমের মধ্যে অপূর্ব বিরাম। সব কাজ করছেন, অথচ ভেতরে অনন্ত স্থিরতা। একেই গীতাকার নির্লিপ্ততা, অনাসক্তি ইত্যাদি নামে নির্দেশ করেছেন। অতএব ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে বলেন, হিন্দুশাস্ত্র মানুষকে অকর্মণ্য করেছে, এ কথা সত্য নয়। ওরা মনে করেন, ওঁদের ধর্ম ওঁদের জাতটাকে বড় লড়ায়ে করে তুলেছে এবং সে জন্যই ওঁদের ভেতর সাংসারিক উন্নতি এবং কর্মোদ্যম এত বেশী। সেটাও বাস্তবিক ঠিক কথা নহে। বাইবেলে প্রত্যেক জায়গায় বৈরাগ্যের উপদেশ: "The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the son of man hath not where to lay his head."—কালকের জন্যে কিছু ভেবো না, আকাশের পাখীরও বাসা আছে এবং বন্য পশুরও থাকবার গর্ত আছে, কিন্তু শিক্ষাদাতা যে আমি, আমার মাথা গুঁজে থাকবার একটুও স্থান নেই। ঈশার জীবনী আমাদের দেশের সন্ন্যাসী-জীবনের মতো—পড়লেই বুঝা যায়। ওঁরা এখন বাইবেলের মানে ঘুরিয়ে আপনাদের দরকার মতো মানে করে নিয়েছেন। তা বলে কি সেই মানে নিতে হবে? গীতা বলেন, মানুষের ধর্মানুষ্ঠান তার প্রকৃতি-অনুযায়ী হয়ে থাকে। Anglo-Saxon জাত সকলকে দাবাবে, সকলের সঙ্গে লড়াই করবে, কেন না ওদের রজোগুণ ঠাসা রয়েছে। ওরা ধর্মের

মর্মও যে ঐরূপে আপনাদের মতো বুঝবে, এতে আর বিচিত্র কি? নচেৎ সকল ধর্মের মর্মই এক, এবং সকল ধর্ম ত্যাগ, পূর্ণজ্ঞান ও অমৃতত্বলাভের একমাত্র পথ, এ কথা মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে।

মহাভারত ও গীতা পাঠে বুঝা যায়, কোন্‌টা কর্ম, কোন্‌টা অকর্ম, কি কি কাজ করা উচিত এবং কি কি উচিত নয় এবং মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য—জ্ঞান কর্মের দ্বারা লাভ হয় কি না, এই বিষয় নিয়ে যে-কোন কারণেই হোক, সেই সময়ে একটা সন্দেহ উঠেছিল। সেইজন্য গীতাতে বারবার ইহা বুঝাইবার চেষ্টা যে, জ্ঞান ও কর্ম পৃথক্‌ নয়। কর্ম আশ্রয় করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং তা হলে জ্ঞান আপনিই আসবে। অর্জুন কিন্তু ওকথা সহজে বুঝতে পারছেন না, কেবল ভুলে যাচ্ছেন। সেইজন্যে শ্রীকৃষ্ণ ফের বলছেন, সকলের এক পথ নয়। নিজের লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি না রেখে কর্তব্য-বোধে সংসারের যাবতীয় কাজই কর, অথবা কামকাঞ্চন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন কাটাও, উভয় পথের ফল একই হবে। কারণ, উভয় পথই মানুষকে ত্যাগ শিক্ষা দিচ্ছে এবং সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র পথ।

ভোগসুখের জন্যে অনুষ্ঠিত সাংসারিক কর্মও মানুষকে ধীরে ধীরে ত্যাগ শিক্ষা দেয়। সাংখ্যকার মহামুনি কপিল বলেন, পুরুষকে স্বমহিমা অনুভব করিয়ে দেবার জন্যই প্রকৃতির জগৎ-সৃষ্টিরূপ বিচিত্র উদ্যম। ভোগসুখের দ্বারা আপনার তৃপ্তিসাধন করতে গিয়ে ধাক্কার ওপর ধাক্কা খেয়ে মানুষ জীবনের প্রতিদিন কেমন ধীরে ধীরে অনিত্য সুখের ওপর বিরক্ত হয় ও ত্যাগ শিক্ষা করে, তা ভাবলে ওকথা ধ্রুব সত্য বলে বোধ হয়। আবার ছেলেকে ভুলিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর মতো মানুষের চোখের ওপর নাম, রূপ, যশ, প্রভুত্ব বা অন্য কোন একটা অনিত্য পদার্থবিশেষকে অতিরঞ্জিত করে ধরে তাতেই সুখ-শান্তি, তল্লাভেই পুরুষার্থ, এই বুঝিয়ে কেমন সহজ উপায়ে প্রকৃতি তাকে অন্যান্য অনিত্য পদার্থসকলের তুচ্ছতা অনুভব করিয়ে দেয়।

মনে কর, একজন ভাবলে আমি বড়লোক হব। প্রথমে বুঝলে, বড়লোক মানে টাকা হবে, দশজন লোক বশে থাকবে ইত্যাদি। অনেক পরিশ্রমে ধনী হল, বুদ্ধি-শুদ্ধিও একটুও মার্জিত হল, কিন্তু ধনী হবার পর দেখলে বিদ্বান্‌ হওয়া আরও বড়। তখন একটু এগিয়ে গিয়ে বুঝলে ঠিক বড় হতে গেলে আরও কিছু ত্যাগস্বীকার চাই। কেন না, বিদ্যাশেখা দরকার, নচেৎ লোকে বড়লোক বলে মানবে কেন? বিদ্যা শিখতে গেলে কাজেই পাঁচজনকে নিয়ে বৃথা আমোদপ্রমোদ, আপাতমধুর নানাপ্রকার সুখ-সম্ভোগ ইত্যাদি হতে আপনাকে পৃথক্‌ রাখতে হল। এইরূপে বড়লোক কথাটার মানে যত বুঝতে লাগল, তত ধীরে ধীরে তার ধারণা হতে লাগল যে, ত্যাগ-স্বীকার না করলে উচ্চ হওয়া যায় না। মানুষ এইরূপে সকল বিষয়ে বোঝে যে, ত্যাগ-স্বীকার না করলে কিছুই লাভ হয় না। শাস্ত্র বলেছেন, ছোট-খাট বিষয়গুলিতে এইরূপে অল্প অল্প ত্যাগ করতে শিখে অবশেষে মানুষ পূর্ণ ত্যাগ করে অমৃতত্ব পর্যন্ত লাভ করে।

কর্মের দ্বারা মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই উচ্চতর মহত্ত্বের আদর্শ তার মন বুঝতে ও ধরতে পারে। তা লাভ করতে অন্যান্য সামান্য বিষয় ত্যাগ করা আবশ্যক

দেখে সে সেগুলি ত্যাগ করে ফেলে। বিবেকানন্দ স্বামীজীর একটি উপমা এখানে বেশ খাটে—আমরা সূর্যকে এখান থেকে দেখছি একটি থালার মত। হাজার মাইল এগিয়ে যাও, সেই সূর্যই কত বড় দেখাবে। আরও হাজার মাইল যাও, আরও বড় দেখাবে। কিন্তু তোমার বোধ থাকবে, এ সূর্য নেই। তেমনি আদর্শ এগিয়ে এগিয়ে ভগবানে পৌছুবে অথচ আমাদের বোধ হবে, আমরা একটা আদর্শই চিরকাল ধরে আছি। পরমহংসদেব বলতেন, মানুষ যদি একটা বিষয় ঠিক ঠিক করে ধরে, তা হলে তাতেই শেষে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাবে।

গীতায় বলছেন, যোগ ও ভোগ, কর্ম ও সন্ন্যাস, মানুষের নিজের অবস্থাভেদে সত্য ও অসত্য, লাভের বিষয় বা ত্যাগের বিষয় এইভাবে অনুভূত হয়। অর্থাৎ কারও মনে যোগই ঠিক, আবার কারেও মনে ভোগই ঠিক বলে ধারণা হয়। দেখা যায়, কর্ম সকলের সমান নয়। সাধারণ মানবের কর্ম আপনার সুখ-বিলাস এবং স্ত্রী-পুত্র-প্রতিপালনে আবদ্ধ। তা হতে যে একটু উঁচু হয়েছে, সে নিজের দেশের জন্যে ভাবে। কিসে দেশের লোক খেতে পাবে, কেমন করে তাদের লেখাপড়া শেখবার সুবিধা হবে, কেমন করে তারা পৃথিবীর অপর জাতের সঙ্গে সমান হয়ে চলতে পারবে, এইসব চিন্তায় ব্যাকুল হয়; তার চেয়ে যারা বড় হয়েছে, তারা ভাবে কেমন করে দেশের লোক সত্য-পথে থাকবে, সংযমী হবে, অপরের ওপর বিনা কারণে অন্যায় অত্যাচার না করে দয়ার চক্ষে দেখবে ইত্যাদি। কেন না, তারা দেখতে পায় ঐ সব দোষ এলে পরেই জাতটার পতন হবে। আবার তার চেয়ে যে বড়, তাঁর কর্ম জগদ্ব্যাপী। সকল কালের সকল দেশের সকল অবস্থাপন্ন মানবের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাঁরা সেই ধ্যানে মগ্ন; যেমন অবতারেরা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সাংখ্য ও যোগ তফাত নয়, মূর্খেরাই আলাদা মনে করে। হে অর্জুন, যখন তুমি এখনও এত উচ্চ অধিকারী হওনি যে একেবারে কর্ম ছেড়ে দিতে পার, তখন কর্মের মধ্য দিয়ে তোমার উদ্দেশ্যলাভ করতে হবে, নিজের লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কর্তব্য কর্ম করতে করতে যার চিত্ত একেবারে স্বার্থগন্ধহীন হয়ে গেছে, তারই ধ্যানাদি দ্বারা সমাধিলাভ করা ছাড়া সাধারণ মানবের ন্যায় কাজ করায় কিছু লাভ নেই। সেই তখন নিজের মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ক্রমবিকাশের স্রোতে সাধারণ মানব-প্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘন করেছে। অতএব তার পক্ষে তখন অন্যরূপ ব্যবস্থা, এই বুঝে কাজ করে যাও।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে এইরূপে কর্মের চরম পরিণাম অকর্ম বা কর্ম-রহিতাবস্থা, শাস্ত্রের এই কথা না বোঝায় এক বিষময় ফল হয়েছিল। যত ভণ্ড, ধূর্ত ও অজ্ঞ লোকেরা কর্তব্য-কর্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে বড়লোক হতে বসেছিল। অমুক কর্মী, এ কথা বললে লোকে নাক সেঁটকাত বা তাকে দয়ার চোক্ষে দেখে বলত, 'এখনও বুঝতে পারেনি, ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, কর্ম না ছাড়লে কিছু হবে না' ইত্যাদি।

মানুষের এই রকম ভুল সকল দেশেই সকল সময়েই হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীচৈতন্য-দেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বড় বলছেন অথচ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই

ানশূন্যা বা অহেতুকী ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়, একথাও বলেছেন। সে কথাটি লে যাওয়ায় আজকালকার বৈষ্ণব বাবাজীদের দুর্দশা দেখ। সকলেই একেবারে ানশূন্যা ভক্তিলাভ করবে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে করে, সে যেন তাদের চোখে বড় কাজ করছে। সকলেই একেবারে বড়লোক হবে। বড় লোক হতে গেলে যে কত াঠ খড় পোড়াতে হয়,' কত স্বার্থত্যাগ ও উদ্যম করতে হয়, তা কেউ করবে া। একটা গল্প মনে পড়ে—একজন লোক এক সন্ন্যাসীর মঠে গিয়ে এক সাধুকে ললে, "মহারাজ, আমায় চেলা বানিয়ে নিন।" মঠের লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি পারবে? চেলা হওয়া বড় শক্ত। মঠের ঠাকুরজীর ভোগ রাঁধতে হবে, হাণ্ডা লতে (মাজতে) হবে, জল তুলতে হবে, সাধুদের ফাই ফরমাশ খাটতে হবে, গুরু া বলে দেবেন, সে পড়া মুখস্থ করতে হবে, তাঁর সব কথা শুনতে হবে ও সন্ধ্যার পর ার পদসেবা করতে হবে।" সে দেখলে বিষম মুশকিল। ভেবে চিন্তে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, গুরু যিনি হবেন, তাঁকে কি করতে হবে?" তারা বললে, "গুরু?—জপধ্যান- জাদি করবেন, চেলাদের শিক্ষা দেবেন ও তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন।" তখন স বললে, "তবে মহারাজ! আমাকে একেবারে গুরুই বানিয়ে নিন।" আমাদের দেশে খন এই ভাবটা বড় বেশী।—ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই ামাদের শোনাতেন, "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।" এ ভাবটা যে হস্থের ভেতর বেশী আর সন্ন্যাসীর ভেতর কম, তাও নয়। লোকে মনে করে, ন্যাসী হয়ে গেরুয়া কাপড় পরলেই আর কর্ম থাকে না, একেবারে জ্ঞানী হয়ে যায়। া নয়। গীতাকার বলেন,—

> কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
> স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥

র্বদা কর্ম করলে আত্মাকে সাক্ষাৎ দেখার দরুন যাঁর সর্বদা সকল অবস্থায় এই জ্ঞান ক ঠিক থাকে যে, আমি কিছুই করি না, আমি আত্মা, আর আত্মাকে না দেখে নীর ভান করে অলস হয়ে বসে থাকলে যিনি দেখেন যে, বিষয়চিন্তারূপ যত কর্ম সব হচ্ছে, মানুষের ভেতর তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম যেমন করা উচিত, ঠিক সেই রকম করে করতে পারেন। তাঁর ভেতরই গীতাকারের ন্যায় বচ্ছিন্ন কর্ম-উদ্যমের ভেতর যোগীর অবিরাম শান্তি দেখতে পাওয়া যায়। যিনি ঠিক জ্ঞানী বা ঠিক ঠিক ভক্ত হয়েছেন, তাঁর ঐরূপ হয়। তিনিই কর্ম করবার সময়েও নাকে তা থেকে আলাদা দেখতে পান। তিনি যেন পাকা নারকেল, ভেতরে লা থেকে শাঁস আলাদা হয়ে গেছে, নাড়, খটখট করে আওয়াজ হবে, আর আমরা ডাব—খোলাতে শাঁসেতে এক সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি। খোলায় আঘাত লাগলে সও গিয়ে লাগে। কর্মযোগ করতে করতে মানুষ পেকে যায়। পাকা নারকেলের তার ভেতরে খোলা ও শাঁস ছেড়ে যায়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও শরীর তি হতে তার আত্মা আলাদা হয়ে গিয়ে আপনাতে আপনি থাকতে পারে।

ঐ সব বাইরের জিনিসগুলো ছেড়ে দিয়ে তার আত্মা আলাদা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জেগে থাকবার সময় তো কথাই নেই, ঘুমোবার সময়ও সে আপনার শরীরটাকে দেখে যেন আর একটা কার শরীর, যেন অপর একজন কেউ ঘুমোচ্ছে। সাধক- শ্রেষ্ঠ শ্রীরামপ্রসাদ গেয়ে গেছেন—

"ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাকে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।"

তার অবস্থাও তখন ঠিক ঐরূপ হয়। আর ঐ গানের মানেও সেই ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। মানুষ যত নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম করে, ততই ধীরে ধীরে তার শরীরেন্দ্রিয়াদি থেকে 'আমি'-বুদ্ধি উঠে গিয়ে আত্মায় গিয়ে দাঁড়ায় ও ঐরূপ অবস্থালাভ হয়।

আর এক কথা এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রে সর্বত্র একটা বিষয় বোঝাবার বিশেষ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় যে, মুক্তি জিনিসটা কর্মের দ্বারা লাভ করবার নয়। উহা 'কর্মসাধ্য' নয়। গীতাকারেরও এ কথাটা ঐ ভাবে বোঝাবার চেষ্টা দেখা যায়। এর মানে কি? এ কথাটার ঠিক ঠিক মানে বোঝা দরকার। না বুঝলে বিশেষ ক্ষতি। কেন না, তা হলে কর্মটাকে ছোট জিনিস মনে হবে। মনে হবে মুক্তির সঙ্গে ওটার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নেই, অতএব কর্ম করতেও প্রবৃত্তি থাকবে না, কর্মে নিষ্ঠা আলগা হয়ে যাবে। তবে এ সব বিচার শাস্ত্রে কিসের জন্য? এইটি বোঝাবার জন্য যে, কর্মের দ্বারা আত্মার স্বরূপ বা স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, আত্মা ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, উৎপত্তি-বিনাশশূন্য, নিত্যানন্দস্বভাব। কর্ম—শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদিকে বদলে দেয়। যে সব যন্ত্রের ভেতর দিয়ে আমরা আত্মা ও জগৎ দেখছি, কর্ম সেইগুলোকে ঘসে মেজে পরিষ্কার করে দেয়। ফলস্বরূপ মনবুদ্ধির ভেতর দিয়ে এতদিন যে ঝাপসা ঝাপসা দেখছিলাম, কুয়াসার ভেতর দিয়ে দেখার মত এতদিন যে ছোট জিনিসটাকে বড় দেখাচ্ছিল বা জিনিসটার অস্তিত্বই বোধ হচ্ছিল না, সেই সব ভুলগুলো ঘুচে গিয়ে যে জিনিসটা যেমন সে জিনিসটাকে ঠিক তেমনি দেখতে পাওয়া যায়। অতএব তাঁদের মতে কর্মের ফল হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি। আত্মাটা যে ছোট ছিল, কর্মের দ্বারা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল এবং অবশেষে এত বেড়ে উঠল যে, তার সব বাঁধনগুলো পটপট করে ছিঁড়ে গেল, তা নয়; কেন না, একরকম কর্মের দ্বারা আত্মাটা যদি বাড়তে পারে তা হলে আর একরকম কর্মের দ্বারা সেটা ছোট হয়ে হয়ে অবশেষে বিলকুল নাও থাকতে পারে—এইটা এসে পড়ে। এই জন্য তাঁরা বলেন যে, আত্মার মুক্তি যদি কর্মসাধ্য হয়, তবে তার অন্তও আছে। কারণ, কর্ম দ্বারা যে জিনিসের উৎপত্তি হয়, তার আদি বৃদ্ধি ও বিনাশ আছে। অতএব তাঁরা বলেন, মুক্তিটা আত্মাতে সর্বদা রয়েছে, ওটা হচ্ছে তার যথার্থ স্বভাব; সেইটে ভুলে গিয়েই তার আপনাকে দেহ মন ইত্যাদি বলে মনে হচ্ছে, আর তার ফলেই আপনাকে সুখী দুঃখী বলে মনে করছে।

যদি জিজ্ঞাসা কর, এ রকম ভুল তার কেন হল? তাতে তাঁরা বলেন, সেটা বোঝবার বা বোঝাবার কথা নয় হে বাপু—সে ভুলটা আগে গেলে তবে বোঝা ব

াঝান আসে। তোমার মনবুদ্ধির দৌড়টা ঐ ভুলের গণ্ডির ভেতর। সেজন্য সে নটার কারণ মনবুদ্ধি কেমন করে জানবে হে? তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, কেমন র সে ভুলটা হল, হলে তা তাঁরা বলেন 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানটা ঢাকা পড়েছে, সেইজন্য এই কষ্ট। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে পায়? তা হলে তাঁরা বলেন, হাঁ, সেটার একটা উপায় ঠাউরিছি। সুখ-দুঃখ, লাভ-লোক-নের দিকে নজর না দিয়ে সৎকাজগুলো করে যাও দেখি। তা হলেই এই অজ্ঞানের ড় অহঙ্কারটা নষ্ট হয়ে যাবে; আর 'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।' ইরূপে কাজ করতে করতে পূর্ণভাবে নিষ্কাম হলেই সে জ্ঞান আপনা আপনি এসে ড়বে। তা হলেই ভ্রমটা ঘুচে যাবে। তখন শরীর মন যে আর কাজ করবে না তা নয়, থরেচ্ছায় আরও ভাল করে কাজ করবে। তখন বুঝবে, কখন বা কর্ম করা দরকার াবার কখন বা চুপ করে থাকা দরকার। আরও বুঝবে কর্মই বা কি, আর কর্ম থেকে রত হয়ে ঠিক ঠিক চুপ করে থাকাটাই বা কাকে বলে। তখনি মানুষের কাজ করা বা করা এ দুটো ক্ষমতাই আসবে। সাধারণ মানুষের তা নেই। সে কেবল কাজ করতে ানে। এক দণ্ডও কাজ না করে চুপ করে থাকতে জানে না। কাজ যেন ভূতের মত ার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এইরূপে কর্মের অধীন হয়ে সে মন জড়িয়ে পড়ে যে, বিশ্রাম বা মুক্তির ভাবটা তার নজর থেকে একেবারে উড়ে য়। মরবার অবসর পায় না। ইহাই বিপদ। যদি বল কেন? কোন কাজ না করে চ আমরা স্থির হয়ে কখন কখন বসে থাকি না, বা রাত্রিকালে ঘুমোই না? তখন ার কি কাজ করে ঘুরে বেড়াই? গীতাকার বলেন, হাঁ, ঘুরে বেড়াও না সত্য, কিন্তু । বলে কি কাজ করা একেবারে বন্ধ দাও? চিন্তা, ভাবনা বা স্বপ্ন এগুলোও যে কর্ম। ারপর নিঃশ্বাস ফেলা, হৃদয়স্পন্দন, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি কাজগুলো তো হতেই থাকে। বে আর একেবারে কাজ থেকে বিরত হলে কি করে? ওকথা কোন কাজের কথা য় হে বাপু। তুমি কর্মের দাস—একেবারে পরাধীন। ভুলে মনে করছ আমি স্বাধীন, ামি কাজ করলেও করতে পারি, না করলেও করতে পারি, বিরাম কাকে বলে, তার কছুই বোঝ না এবং একটু-আধটু বুঝলেও তোমার তা করবার শক্তি নেই। যদি িরাম কথাটার যথার্থ মানে বুঝতে চাও, তা হলে নিজের লাভ-লোকসানটা আজ থকে আর না খুঁজে—করতে হয় তাই করছ—বলে সব কাজগুলো করে যাও। া হলেই কালে বুঝতে পারবে, এই রকমে কাজ করার নামই হচ্ছে কর্মযোগ। যে াজগুলো করতে করতে লোকের নানাপ্রকার বন্ধন আসছে, সেইগুলোকে এমন ভাবে রা যে, যা কিছু শুনছ, যা কিছু বলছ, যা কিছু করছ—সেই সমুদয় কাজগুলো তোমায় ার জড়িয়ে না ফেলে কর্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেবে।

কর্মযোগ ব্যাপারটা কি? না, কর্ম করবার এইরূপ কৌশল। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' —এমন কৌশলে কর্ম করা যায় যে, কাজ করে আর জড়িয়ে পড়তে না হয়; যাতে ামাদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি। কি করলে তেমন কাজ করা ায়? নিজের লাভের দিকে দৃষ্টি না রাখলে। যেখানেই স্বার্থ, সেইখানেই ফলের আশা

আর সেইখানেই আসক্তি এসে পড়ে। তুমি কাজ কর, কিন্তু দেখো, কাজ যেন তোম না পেয়ে বসে। নতুবা কাজ তো করতেই হবে। পিতামাতার সেবা করতে হবে, য বিবাহিত হও তো স্ত্রীপুত্রদের পালন করতে হবে। যে সমাজে আছ তার প্রতি কর্ত আছে, যে দেশে জন্মেছ তার প্রতি কর্তব্য আছে, সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি কর্ত আছে। শাস্ত্র বলেন দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়।

কাজ করতেই হবে। তবে পরমহংসদেব যেমন বলতেন, সেইভাবে কাজগুলো ক —মনে কর, যেন তুমি বড়লোকের বাড়ীর চাকরানী। সে কাজকর্ম করছে, ছেলেদে খাওয়াচ্ছে-দাওয়াচ্ছে, তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হচ্ছে, কিন্তু মনে মনে জা আমি এদের কেউ নই। মনিব যেদিন ইচ্ছে করবে, সেইদিনই তাড়িয়ে দেবে। তুমি সংসারে এই ভাবে থেকো।

অর্জুন যতদিন রাজত্বভোগ, লড়াই-দাঙ্গা প্রভৃতি তাঁর জীবনের সব কাজগুে এইভাবে করে আসছিলেন, ততদিন তাঁর বুদ্ধি পরিষ্কার ছিল। ভালবাসার মো পড়ে ততদিন তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায়নি। ক্ষত্রিয়জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য—সত্যনি অন্যায় অত্যাচারের দণ্ডবিধান করে ন্যায় বিচার-স্থাপন, ধর্মের উচ্চভাব আপনার হৃদ পোষণ করে অপরকে তাতে প্রবৃত্ত করান, শরণাগতকে শরণদান, দুর্বল শত্রুর প্রা ক্ষমা ও দয়াভাব, আপনার আত্মীয় কুটুম্ব বা ভালবাসার পাত্রও অন্যায় অধর্ম কর তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ইত্যাদি—এতদিন বজায় রেখে কাজ করে যাচ্ছিলে মনে করেছিলেন, এ তো খুব সোজা। এইভাবেই চিরদিন কাজ করে যাবেন। কি মায়ার বিষম প্রতাপ! হঠাৎ একদিন কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাভিনয়ের আড়ম্ব উদ্যোগ, জীবনের পরিবর্তনসঙ্কুল পরীক্ষার দিন সামনে উপস্থিত। দেখলেন ঘটন স্রোতে আপনি একদিকে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে, ছাড়বার পথ নেই। ধর্ম, সত ন্যায়, বিচার সব তাঁর দিকে। অমিতপ্রজ্ঞ ধর্মবন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিকে, নেই কে তাঁরা যাঁদের জীবনের কিশোরকাল হতে শ্রদ্ধাভক্তি করে এসেছেন, ভালবেসেছে হৃদয়ের কোমল ভাবগুলো দিয়ে এসেছেন। নেই কেবল তাঁরা, যাঁদের হাত থেকে এম অত্যাচার, অবিচার, অধর্ম, নৃশংসতা পাবার প্রত্যাশা মানুষ স্বপ্নেও করে না। আব তাঁরা যে কেবল তাঁর দিকে নেই তাও নয়, তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এত সাথে ক্ষত্রিয়ধর্ম, জীবনের উচ্চ আদর্শ যদি রক্ষা করতে হয়—তো তাঁদের হত্যা করা ভি অন্য উপায় নেই। দেখলেন—তাঁদের হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতধারায় তর্পণ ভিন্ন ধর্মনিষ্ঠ দেবী প্রসন্না হচ্ছেন না। অর্জুনের বীর হৃদয় সে ছবি স্থির হয়ে দেখতে পারলে না ভেতরে সহস্র সহস্র বিপরীত ভাবের প্রবল তরঙ্গসমূহ এককালে ছুটোছুটি করে আব সঙ্কুল করে ফেললে। ভালবাসায় মোহ এল। মোহ ধর্মভাবের উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ ডুবি ফেললে। কাজেই বুদ্ধি আর দিঙ্‌নির্ণয়ে সমর্থ না হয়ে আবর্তের ভেতর নৌকা চালি অসহায় হয়ে পড়ল। তখন স্বার্থ এল। মান-অপমানের চিন্তা, জয়-পরাজয়ের ভয় ভাবনা সব একে একে এসে বললে, "পালাও পালাও, এ তো ধর্ম নয়, এ যে অধর্ম কর বসেছ। কাদের সঙ্গে লড়াই করতে কোমর বেঁধেছ? এদের সঙ্গে পারবেই বা কেম

করে ? ঐ দেখ ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, ঐ দেখ গুরু দ্রোণ, ঐ দেখ বিচিত্রকবচকুণ্ডলধারী একঘাতি-অস্ত্রসহায় কর্ণ, ঐ দেখ অমর কৃপ ও অশ্বত্থামা, ঐ দেখ পিতৃবরদর্পী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—এদের সঙ্গে পারবে ? এতটুকু জমির জন্যে এত বড বিশ্বব্যাপী নামটা কি খোয়াবে ? পালাও পালাও, ভিক্ষা করে খাও, সেও ভাল। আর যদি জেতও তো এদের মেরে সে রাজ্যভোগ' কি সুখের হবে ?" অর্জুন যে ধর্মের জন্যে, সত্যবিচারের জন্যে লড়াই করতে দাঁড়িয়েছেন, সে কথা ভুলে গেলেন। সব কালেই জীবনের এইরূপ স্থলে মানুষের এমনি হয়। উদ্দেশ্য ভুলে স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এটি বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ পজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

—রূপ-রসাদি ভাবতে ভাবতে কোন জিনিসটা প্রথমে মানুষের মনে ভাল লাগে ও মন সেই দিকে ঢলে পড়ে, biased হয়। অমনি কামের উদয় অর্থাৎ ঐটে আমার হোক, এইরূপ ইচ্ছা হয়ে সেইটে ধরতে এগিয়ে যায়। ওতে বাধা পেলেই বিরক্তি আসে। বিরক্তির পরিণাম ক্রোধ। তার বশীভূত হয়ে সে সেই বাধাটা দূর করতে চেষ্টা করে। তার পরিণামে মোহ আসে। মোহ এলে 'সত্যপথে চলব, ধর্মপথে থাকব' ইত্যাদি উচ্চ উদ্দেশ্যগুলি ভুলে যায়। এরই নাম স্মৃতির লোপ হওয়া। তখন ন্যায়ে হোক অন্যায়ে হোক সে জিনিসটা মানুষ লাভ করতে ছোটে। গুরু-উপদেশ প্রভৃতি এতদিন যা তাকে মন্দ কাজ, পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল, সে সব ভুলে যায়। ফলে বুদ্ধি গুলিয়ে যায় ও পাপ কাজ করে অশেষ প্রকারে কষ্ট পায়।

মনে কর, কেউ অর্থ-উপার্জন করতে চায়, দেশের উপকার করবে বলে। প্রথম প্রথম ঐ ভাব বেশ প্রবল থাকে। কিন্তু টাকা হাতে এলে টাকার প্রতি মায়া হয়, এবং ক্রমে অর্থলালসায় উদ্দেশ্য ভুলে নিজের সুখবিলাস অথবা কাঞ্চনকেই জীবনের লক্ষ্য করে ফেলে। সেইজন্য উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে হয়, ফলের দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না; এই হচ্ছে কর্মযোগ। কর্মযোগী কে হতে পারে ? যে আপনাকে বশ করতে পেরেছে, আপনার ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ করেছে; জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য যার অবিচলিত আছে, কাজ যাকে না চালিয়ে যে কাজকে চালায় সেই কর্মযোগী হতে পারে। উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে সে বুঝতে পারে, তার কাজ ফুরিয়েছে এবং কাজ থেকে অবসর নেয়।

গীতায় তাই শিক্ষা দিচ্ছেন, কাজ কর। কাজ না করার চেয়ে কাজ করা ভাল। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে ফল কামনা করো না। ফলকামনা এলেই বাধা পড়তে হবে। দেখতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে যারা কোন বড় কাজ করেছে, তারা সকলেই সংযমী পুরুষ, আপনার উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। ছাত্রজীবনে কে বড় হয় ? যে পাঁচটা আমোদে না মেতে উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। সংসারে কে বড় হয় ? ধর্মে কে বড় হয় ?—যে উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে পারে। উদ্দেশ্যহারা হলেই পড়তে হবে ও তোমার দ্বারা কাজের মত কাজ

আর একটাও হবে না। কেন না, তোমার বুদ্ধি গুলিয়ে যাবে। কোন্‌টা করা উচিত কোন্‌টা নয়, তা আর ধরতে পারবে না। ফলে কতকগুলো বাজে কাজে ছুটোছুটি করে মরাই সার হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, মন থেকে একেবারে ফলকামনা যদি যায়, তা হলে কাজ করব কেমন করে? কোন উদ্দেশ্যবিশেষ কামনা করা ভিন্ন কাজ কি করা যায়? ঠিক কথা; উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ হতে পারে না। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের দিকে যাবার সময় নিজের লাভালাভ খতাব কেন? আমরা কেবল নিজের লাভ-লোকসান খতাতে চাই। ওইটে আগে খতিয়ে তবে কাজে লাগি। লেখাপড়া শিখি রোজগার করতে পারব এবং নাম হবে বলে, জ্ঞানের জন্য নয়। স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে ভালবাসি নিজে সুখী হই বলে, তাদের জন্যে নয়। এইরূপে তলিয়ে দেখলে আমাদের সকল কাজেরই উদ্দেশ্য দেখতে পাই স্বার্থসেবা—আপনার অহংকারের ষোড়শোপচারে পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়। আমাদের মুখে একখানা থাকে আর মনে একখানা থাকে। এই ভাবের ঘরে চুরিটা প্রথমে না ঘুচলে কোন যথার্থ কাজই আমাদের দিয়ে হবে না। কোন সত্যের পথই আমাদের চোখের সামনে পড়বে না। সেইজন্য গীতাকার অর্জুনকে সামনে রেখে আমাদের সকলকে বলছেন, ফলকামনাই সর্বনাশের মূল। ফলকামনাই তোমায় অজ্ঞানে জড়িয়ে রেখেছে, কর্তব্য করতে দিচ্ছে না। চোখে ঠুলি বেঁধে সামনে সত্য থাকলেও দেখতে দিচ্ছে না। ফলকামনা ছাড়, ছাড়। ফলটার দিকে দৃষ্টি না রাখলেই অজ্ঞান অধর্মের মূল স্বার্থপরতার হাত থেকে এড়াবে। তখন ঠিক ঠিক সুখ কাকে বলে তা বুঝবে, ঠিক ঠিক ভালবাসা কাকে বলে তা দেখবে। ফলটার দিকে দৃষ্টি না রাখলেই তুমি যোগী হবে, জ্ঞানী হবে, ভক্ত হবে। তোমার সব দুঃখ দূরে যাবে।

শাস্ত্র পড় বা বক্তৃতা শোন, শাস্ত্রের কথাগুলি যদি জীবনে পরিণত করে কাজ না করতে পার, শাস্ত্র যদি জীবনে না খাটে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় সহায় না হয়, তবে সে পড়াশুনো সব মিথ্যে। তার কোন প্রয়োজন নেই। ছাত্রজীবনেই বল, সংসারে ভোগের ভেতরেই বল, আর সন্ন্যাসের ত্যাগের মধ্যেই বল, এটি করতে শেখা আগে চাই। তা হলেই মানুষ যেখানে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন, শাস্ত্রজ্ঞান জীবনের উচ্চ লক্ষ্য তার সামনে ধরে তাকে সেখান হতেই তুলে দেবে।

স্বামীজী বলতেন, আমাদের দেশে এখন আর শাস্ত্র কেউ বোঝে না, কেবল ব্রহ্ম, মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি কতকগুলো কথা শিখে মাথা গুলিয়ে মরে। শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যটা ছেড়ে দিয়ে কেবল কথাগুলো নিয়ে মারামারি করে। শাস্ত্র যদি মানুষকে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সাহায্য করতে না পারেন, তা হলে সে শাস্ত্রের বড় একটা আবশ্যক নেই। শাস্ত্র যদি সন্ন্যাসীকে পথ দেখান, আর গৃহীকে পথ দেখাতে না পারেন, তা হলে সে একদেশী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি দরকার? অথবা শাস্ত্র যদি মানুষ অন্য কাজ-কর্ম সব ছেড়ে বনে গেলে তবে তাকে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু সংসারের কোলাহলের ভেতর, দিনরাত খাটুনির ভেতর, রোগ-শোক-দৈন্যের ভেতর, অনুতপ্তের নিরাশার ভেতর, অত্যাচারিতের ধিক্কারের ভেতর, রণক্ষেত্রের করালতার ভেতর,

কামের ভেতর, ক্রোধের ভেতর, আনন্দের ভেতর, জয়ের উল্লাসের ভেতর, পরাজয়ের অন্ধকারের ভেতর এবং পরিশেষে মৃত্যুর কালরাত্রির ভেতর মানুষের হৃদয়ে আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে পথ দেখাতে না পারেন, তবে দুর্বল মানুষের সে শাস্ত্রে কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

মনে কর, ছাত্রজীবনে জ্ঞানলাভের জন্য বা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্যে আমায় বিলেত যেতে হবে। শাস্ত্র যদি না আমায় সে সময় সে বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন, তবে আমার দশা কি হবে ? কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, আমাদের শাস্ত্রের কোন দোষ নেই, দোষ আমাদের। আমরা শাস্ত্রোপদেশ কিরূপে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় লাগাতে হয় ও লাগাতে পারা যায়, তা একেবারে ভুলে গেছি। ভুলে গিয়ে মনে করছি, খাঁটি ধর্মকর্ম করতে হলে বনে যেতে হবে। গীতাকারের অন্য মত। তিনি একদিকে অর্জুনকে বলছেন, ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই না করলে তোমার ধর্মলাভ কিছুতেই হবে না, আবার উদ্ধবাদি অন্য প্রকৃতির লোককে বলছেন, তোমাকে সব ছেড়ে ছুড়ে পাহাড়ে বদরিকাশ্রমে গিয়ে অনন্যমনে ধ্যানজপাদি করতে হবে। তা না হলে তোমার ধর্মলাভ হবে না। অতএব শাস্ত্রের কথাই হচ্ছে এই, তুমি যেখানেই থাক, কর্মফল ছেড়ে ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম করলে সেখান থেকেই তোমার মুক্তি হবে।

পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে মানুষ যে কাজ করতে পারে, আমাদের চোখের সামনে পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দ স্বামী তাহা নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তাঁরা আমাদের মত শাস্ত্রের ছোবড়া নিয়ে টানাটানি করেন নি। আমাদের জীবনের সহিত শাস্ত্রোপদেশের ঐক্য চাই। তা হলেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারা যায়, তা দেখিয়ে গেছেন। কেমন করে শাস্ত্রজ্ঞান জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়, তাই শিখিয়ে গেছেন। আমাদের সেটি যত্ন করে শেখা চাই। তোমাদের সমিতিরও তাই উদ্দেশ্য, সেটা যেন কখনও ভুলো না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে ধর্ম নানাভাবে প্রকাশিত হবে, এইটি নিজে ভাল করে বুঝে জগতের সামনে জীবনে সেইটি দেখাতে হবে, এ কথাটা ভুলো না। শাস্ত্রের উপদেশগুলি একালেও যে জীবনে পরিণত করা যায়, আর করতে পারলে মানুষ যে-কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, বিশেষ সাহায্য পায়, জীবন-সংগ্রামে বিশেষ জোর পায়, তা দেখাতে হবে, ভুলো না। শাস্ত্রের যদি দোষ থাকত বা উহা যদি একালের অনুপযোগী, সেকেলে, একঘেয়ে উপদেশে পূর্ণ থাকত, তা হলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ধর্মবীর বিবেকানন্দের জীবনগঠনে কখনও সহায় হতে পারত না, এটা বেশ করে বুঝো, শাস্ত্রের দোষ দিও না। দোষো আপনার চোখকে, যেহেতু শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ ও ঠিক ঠিক উদ্দেশ্য তার দেখবার শক্তি নেই। দোষো আপনার শিক্ষাকে, যাতে চোখ, কান, নাক, মুখের ব্যবহার কেমন করে করতে হয়, তাও লোককে শিখতে দেয় না।

আমাদের ভেতর কটা লোক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করতে জানে ? ইন্দ্রিয়কে সূক্ষ্ম জিনিস ক্রমে ক্রমে ধরতে শেখালে তবে তো তারা ধরতে পারবে। আজকাল

আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, কেমন করে আমরা ভাল কেরানীটি হতে পারব। নূতন নূতন ভাবে চিন্তা করতে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা করতে, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়-চালনা করতে শেখান দূরে থাক্, চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে হাত-পাগুলো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ছেলেগুলোকে একেবারে জড় করে তুলছে। ইন্দ্রিয়গুলো সবল, কর্মঠ হলে তবে তো সকল বিষয় উপলব্ধি করতে পারবে এবং তবেই তো জ্ঞান হবে। আমরা চাই—অশিক্ষিত ভাঙ্গাচোরা শরীরেন্দ্রিয় দিয়ে যোগীর বহুকালের শিক্ষিত সতেজ অথচ বশীভূত ইন্দ্রিয় মনের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সব একদিনে অনুভব করব। আরে পাগল, তাও কি কখন হয়? আগে ইন্দ্রিয়গুলোকে সতেজ কর, শিক্ষাসহায়ে বশীভূত কর, বহুকাল ধরে অভ্যাস কর, শ্রদ্ধার সহিত চেষ্টা কর, তবে তো পারবি। তা করবো না, আর বলব—আমাদের শাস্ত্রটা সব আজগুবী ও মিথ্যাতে ভরা। হিন্দু-ধর্মটা কিছু নয়। এর চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে? ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম। গল্পটির নাম—চোখ থাকা ও না থাকার কত প্রভেদ। গল্পটি এই—দুজন লোক এক মাঠের ওপর দিয়ে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল। একজন সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বিশেষ কিছু না দেখতে পেয়ে মহা বিরক্ত হয়ে ফিরে এল। আর তার সঙ্গী কত কি নূতন নূতন গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে জমিটার উর্বরতা পরীক্ষা করে নানারকমের নূতন পাথরে জামার পকেট পুরে মহা আনন্দে ফিরে এল। দুজনে এক মাঠেই বেড়াতে গিছলো। কিন্তু শেষের লোকটি চোখের ব্যবহার জানত, এই প্রভেদ। স্বামীজীর সহিত যারা বেড়িয়েছে, তারা জানে, তাঁর কিরূপ দৃষ্টি ও ধারণা ছিল। কতবার দেখেছি, একই দেশের ভেতর দিয়ে একই স্থানে বাস করে, এক সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম। তিনি এসে তাদের বিচিত্র আচার ব্যবহার ইতিহাসাদির কত কথা বলতে লাগলেন। আমরা শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, ইনি এত কখন দেখলেন বা শুনলেন।

শাস্ত্র বলেন দৃঢ় শরীর, সতেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম, ধারণা-সমর্থমন-বিশিষ্ট পুরুষই বেদ-জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। সে পুরুষ এখন কোথায়? দেশের লোকের ভেতর এত যে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চুপ করে পডে থাকা দেখতে পাও, সবটা কি মনে কর ঈশ্বরবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস থেকে আসে? তা নয়। দুর্বলতা ও তমোগুণই হচ্ছে তার প্রধান কারণ। অদৃষ্ট বা দৈব মানুষকে সহায়তা না করলে কার্যসিদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু গীতাকার বলেন, কার্যসিদ্ধি হবার পাঁচটা কারণের ভেতর দৈবটা একটা কারণ মাত্র। দৈব সহায় না হলে যেমন কোন কাজ সফল হয় না, সেইরূপ তার সঙ্গে সঙ্গে সমান-ভাবে চাই "অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধং।—বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টাঃ…॥"—উপযুক্ত দেশ ও কাল, উদ্যমশীল কর্তা, সতেজ শিক্ষিত ইন্দ্রিয়গ্রাম ও তৎসহায়ে বার বার নূতন নূতন উপায়ে কর্তার উদ্যম করা। শাস্ত্র বলেছেন, দৈবসহায় ভিন্ন কোন কাজ হয় না। সেটি আমরা বেশ করে ধরে বসে আছি, কিন্তু শাস্ত্র যে তা ছাড়া আরও বলছেন—সবল হও, অনলস হও, ক্রমাগত চেষ্টা কর, কার্য কর, সেগুলো আমরা শুনেও শুনব না, দেখেও দেখব না। কেননা তা যে আমাদের বিলকুল নেই, আমরা যে মহা তমোগুণে পড়ে রয়েছি।

কাজের আগ্রহ চাই, তার ওপর দৈব চাই। দুটোরই দরকার, তবে ফলসিদ্ধি হয়। তোমার হাতে আছে উদ্যমী হওয়া, অনলস হওয়া, ফলসিদ্ধি তোমার হাতে নেই, তোমার দেখবার দরকারও নেই। তোমায় দেখতে হবে, উদ্দেশ্যটা ঠিক রাখতে পেরেছ কিনা। কর্মযোগে গীতাকার এইটি হতে তোমায় শিক্ষা দিচ্ছেন।

কর্মযোগের আর একটি উদ্দেশ্য আছে—শক্তিক্ষয় নিবারণ করা। যোগ হচ্ছে—কর্ম করবার কৌশল। কর্মবিশেষে যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ করা দরকার, ততটুকু তাতে লাগান —অল্পও নয়, অধিকও নয়। ফলকামনা না করলে সেইটি হয়। মনে কর, ফলের দিকে মন দিয়ে যদি অকৃতকার্য হল, তা হলে মনস্তাপে তোমার কত শক্তিক্ষয় হল। কর্মযোগ বলছে, শক্তিক্ষয় করো না। শক্তি সঞ্চয় কর এবং শারীরিক শক্তির সারভাগকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর। সংযম ও কর্মযোগের এই শিক্ষা। যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ দরকার, ততটুকু কাজে লাগাও। তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, ততটুকু করেছ কি না সর্বদা দেখো। কিন্তু যেটা তোমার হাতে নেই, সেটার জন্য মাথা খুঁড়ে হা-হুতাশ করে শক্তিক্ষয় করো না। ভোগী, ফলকামী পুরুষের শক্তি সর্বদাই ঐরূপে ক্ষয় হয়। কাজেই কর্ম করবার শক্তিও তার দিন দিন কমে যায়। সেইজন্য কেবল উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে কাজ করে চলে যাও।

ঐরূপে কাজ করবার উপযুক্ত কে?—যে আপনার মনটাকে বশ করতে পেরেছে। ঐরূপে কাজ করে গেলে কি হয়?—কর্মবন্ধন কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই কর্মযোগের অনুষ্ঠান বিশেষরূপে দেখা যায়। দেখা যায়, তাঁর ইন্দ্রিয় মন সর্বদা অশেষ কাজ করলেও তিনি অল্পমাত্রও ফলকাঙ্ক্ষী নন। তাঁর ন্যায় অবতারেরাই জগতের যথার্থ গুরু। তাঁদের জীবনই জ্ঞানের বিস্তারের জন্য, লোকের শিক্ষার জন্য। তাঁদের জীবন দেখে ঐ ভাবে কাজ করতে শেখ। নতুবা সংযম করতে না শিখলে, ফলাকাঙ্ক্ষায় কাজে প্রবৃত্ত হলে, মন ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়বে এবং ঐ ইন্দ্রিয়ই আমাদের মাটি করবে। ইন্দ্রিয়ের দাস হলে চলবে না, কাজ হবে না, উদ্দেশ্য হারাতে হবে। ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখতে হবে। মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে নিষ্কাম হয়ে কাজ করে যাও। দেখবে জ্ঞানযোগী তীব্র বৈরাগ্যসহায়ে যে অবস্থা লাভ করেন, কর্মযোগী কর্মের দ্বারা ঠিক সেই অবস্থায় পৌছুবেন। দুজনেরই উদ্দেশ্য এক, কিন্তু পথ আলাদা। পথে যতক্ষণ, ততক্ষণ উভয়ের মিল না থাকলেও উদ্দেশ্যে পৌছুলে আর বিরোধ থাকে না।

(১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি, কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

কর্মযোগ

কর্মযোগ বলে, মানুষকে কর্ম করতেই হবে। কর্ম ছেড়ে কথনই থাকতে পার না। যতদিন শরীর থাকবে, মৃত্যু না হবে, ততদিন কোন না কোন, কিছু না কি কাজ করতেই হবে। মানুষের পক্ষে কাজ ছাড়া অসম্ভব।

আবার অন্যদিকে শাস্ত্র বলছেন, "সমস্ত কাজ যতদিন না ত্যাগ করতে পার ততদিন মানুষের জ্ঞানলাভ ও মুক্তি অনেক দূরে।"

সাধারণভাবে দেখলে দুটি কথা বড়ই বিপরীত। সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন। তা গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ উপদেশ করে ঐ দুই বিরুদ্ধ বিষয়ের মীমাংসা ক দিচ্ছেন, বলছেন—সম্পূর্ণ কর্মরহিত অবস্থায় না পৌছুলে জ্ঞানও হবে না, শান্তি পাবে না, সেটা ঠিক; কিন্তু সে অবস্থাটা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই যে হল, তা নয় তাতে বরং তোমায় কপটাচারী করে তুলবে। সে অবস্থাটা লাভ হলে শরীরেন্দ্রিয়ে দ্বারা কাজ করলেও তোমার ভেতরে 'আমি কর্মরহিত—শরীরেন্দ্রিয় থেকে সম্পূ পৃথক্'—এই ভাবটি সর্বদা বর্তমান থাকবে। এমন কৌশলে কাজ করা যায়, যাতে কা করতে করতে ধীরে ধীরে মানুষ ঐ অবস্থায় পৌছায়। অতএব কর্মযোগের মূলমন্ত্র হচ্ছে—কর্মের ভেতরে থেকেও আপনাকে কর্মরহিত করে রাখতে শেখা।

শরীর-মনের দ্বারা নিয়ত কাজ চলবে অথচ নিজে কর্মরহিত হয়ে থাকতে হবে- এইটাই হচ্ছে ঠিক অকর্ম বা কর্মরহিতাবস্থা। হাত পা গুটিয়ে বসে আছি অথচ ম মনে নানারকমে 'লঙ্কা-ভাগ' কচ্ছি—সেটা কর্মরহিত হয়ে থাকা নয়। ঠিক ঠি কর্মরহিত হয়ে যিনি থাকতে পারেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "তিনি মানুষের ভেত বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তাঁর দ্বারাই সব কাজ ঠিক ঠিক সম্পন্ন হয়।" যথা—

> কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
> স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥

—কর্মের ভেতর থেকে যিনি আপনাকে করর্মহিত দেখতে পান আর অলস হয়ে ব ছেড়ে থাকলে কর্মরহিত হওয়া অনেক দূর, একথাও যিনি বোঝেন, মানুষের ভেত তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কাজ যথাযথ করতে পারেন।

অতএব শরীর মন প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত রাখতে হবে; আবার সেই সঙ্গে নিজে সম্পূর্ণ কর্মরহিত জেনে ভেতরে যোগীর অবিরাম শান্তি নিয়ত প্রবাহিত রাখতে হবে এইরূপে কর্ম ও জ্ঞানের সামঞ্জস্য আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে স্থাপিত হবে। মু পুরুষের এই ভাবটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হলেও সাধককে অনেক যত্নে অনে উদ্যমে সুখদুঃখজড়িত অনেক কর্মের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এই অবস্থা লা করতে হয়।

কর্ম ও জ্ঞান উভয়ের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য-স্থাপনই গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের বিশেষ লক্ষ্য। পূর্বে বলেছি, গীতাকারের সময়ে জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ সাধারণে ঠিক বুঝতে না পেরে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য গুলিয়ে ফেলেছিল। কর্ম ও জ্ঞান পরস্পর-বিরুদ্ধ—একটা করতে গেলে অন্যটা কখনই করতে পারা যাবে না, এইরূপ লোকে বুঝত। এখনও যে আমাদের দেশে অনেক বিষয়ে ঐ প্রকার ভুল ধারণা নেই, এ কথা কে বলবে ? মনে কর ধর্ম করতে গেলে বনে যেতে হবে, জগতের কোন জীবের জন্য কোন কাজ করলে আর ধর্ম হবে না—আমাদের ভেতর পুরানো লোকদের এই যে 'অন্ধ' বিশ্বাস, অথবা সংসারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য—সংসার ছেড়ে, কর্ম ছেড়ে জ্ঞানী হওয়া, সে আবার কি রকম জ্ঞান রে বাপ, সে একটা কোন রকম অস্বাভাবিক উপায়ে, মাথা বিগড়ে, জড়বৎ হয়ে যাওয়া—আমাদের সুশিক্ষিত (?) নবীন ছোকরা-দের ইংরেজ গুরুর পদতলে বসে এই যে অদ্ভুত 'চক্ষুষ্মান্' বিশ্বাস হয়েছে, সেগুলিকে 'পরের মুখে ঝাল না খেয়ে' নিজে নিজে শাস্ত্র পড়ে দেখলে কি মনে হয় ? শাস্ত্রের এই কথাটি একদল একেবারে ভুলে গেছেন যে, কর্মের দ্বারা প্রথমে মন-বুদ্ধি পরিষ্কার না হলে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। অন্যদল একেবারে 'না পড়েই পণ্ডিত'—পরমহংসদেব যেমন বলতেন, 'ও-কথা খবরের কাগজে তো লেখেনি' বা 'ইংরেজেরা মানে না'—তবে শাস্ত্র-কথিত জ্ঞানটাকে মানুষের উন্নতির চরম সীমা বলে তাঁরা কেমন করে মানেন।

শাস্ত্র বলেন, মানুষ প্রথমে বেদাভ্যাস করবে। তবে তার ধর্মে নিষ্ঠা হবে। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অতএব ধর্মলাভ করবে বলে সে নানা কাজ করবে। নানা কাজ করতে করতে তার নানা প্রকারের সুখদুঃখ-অনুভব হয়ে ধীরে ধীরে 'জগৎ অনিত্য' এই জ্ঞান হবে। তখন সে আর নিজে সুখী হব, বড় হব বলে প্রত্যেক কাজ না করে নিষ্কাম হয়ে কর্তব্য বলে কাজ করতে চেষ্টা করবে। উহাতে ক্রমশঃ মন-বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে সে নিজের লাভ-লোকসান-খতানটা একেবারে ছেড়ে দেবে। ইহারই নাম যথার্থ ত্যাগ। বিবেক-বুদ্ধি-প্রেরিত এই ত্যাগ একবার জীবনে এলে সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বস্তুলাভের বিশেষ আগ্রহ প্রাণে উদিত হয় এবং সেই বিষয়ের জ্ঞানও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। তখন সকল বিষয়ে সর্বপ্রকারে একত্বের অনুভব হয়। ভেতরে বাহিরে সে দেখে কেবল এক—এক—এক। একবার এই একজ্ঞান হলে আর তার লোপ হয় না। মরীচিকাকে একবার বালির ওপর আলোর খেলা বলে জানলে আর জল বলে বোধ হয় না।

তবে এই একজ্ঞান জীবনে অনুভব করেও কতকটা দ্বৈতবুদ্ধি, লোকশিক্ষার জন্য বা উচ্চ উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য ফের এনে কাজ করা যেতে পারে। পরমহংসদেব বলতেন, "যেমন সুরজ্ঞ গায়ক—অনুলোম ধরে ওপর গ্রামে উঠলো, আবার বিলোম ধরে নীচের গ্রামে নামলো। যখন সে সুর ইচ্ছে গলা দিয়ে বার করলে।" একজ্ঞানীর কাজ করা না করা ঠিক ঐ রকম মুঠোর ভেতর থাকে। তবে হাজার চেষ্টা করেও তিনি আর কখনও সাধারণ লোকের মত, কাম-কাঞ্চন-যশ নানাদিকে 'চিজ, বস্তু, মাল' বা জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য বলে দেখতে পারেন না। যেমন মরীচিকাটা একবার জল নয় বলে বোধ হলে আবার তুমি যেখানে ঐ রকম ভুল বুদ্ধি হয়, সেখানে যেতে ও সেই ভুলটা বার

বার দেখতে দেখাতে পার, কিন্তু আর কখন ঐ জলপান করে তৃষ্ণা মেটাতে যাবে না —সেইরূপ।

কর্ম যে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, এই কথাটা মনে না রাখতে পারলে বিষম গোল লাগবে। 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত সকল কর্মই এই জ্ঞানলাভরূপ উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়, যদি নিজের লাভ-লোকসানটা খতিয়ে সে উহা না করে। ভারতে গৃহী ও সন্ন্যাসীর লক্ষ লক্ষ লোক জ্ঞানলাভের চেষ্টা করছেন—সেটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু তাঁদের ভেতর পনর আনা লোকই নিজের লাভ-লোকসান-খতানটা আগে না ছেড়ে আগেই কর্মটাকে মায়া বলে যতটা পারেন ছাড়বার চেষ্টায় থাকেন। তাতে হয় এই যে, খাওয়া-পরা ইত্যাদি স্বার্থের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মগুলি ঠিক বজায় থাকে ; কেবল দান, দীনসেবা, দেশানুরাগ প্রভৃতি পরহিতের জন্য অনুষ্ঠিত কাজ-গুলিই আগে ত্যাগ হয়ে যায়—কেননা সেগুলি করায় ঢের 'বখেড়া', 'হাঙ্গাম'। কে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় ?' ফলে যা দেখছি, স্বার্থপরতায় দেশ পূর্ণ হয়ে সকলেই অধঃপাতে যেতে বসেছি। বিবেকানন্দ স্বামীজী যেমন বলতেন, "দেশের লোকগুলোর যোগ তো হলই না, ভোগও হল না, কেবল পরের জুতোলাথি খেয়ে কায়ক্লেশে কোন-রূপে দুটো উদরান্নের সংস্থান—তা কারুর হল, কারুর হল না।" ঐ সকল লোক যদি গীতাকার যেমন বলেছেন, এবং প্রতি ঘটনায় নিজের জীবনে দেখিয়েছেন, পরহিতের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য, গরীব-দুঃখীর সেবা ও শিক্ষার জন্য, যার যতটুকু সাধ্য নিষ্কাম হয়ে কাজ করে যান, তা'হলে জপ-ধ্যানের ন্যায় ঐ সকল কাজই তাঁদের প্রত্যেককে জ্ঞানলাভের দিকে এগিয়ে দেয়, দেশেরও এমন দুরবস্থা থাকে না। দেখা যায় একজনের স্বার্থত্যাগে যখন কত লোকের কল্যাণ হয়, তখন যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক স্বার্থবলি দিতে কোমর বেঁধেছে, সে দেশের কখনও দুরবস্থা থাকে ? অপর দিকে ইংরেজী শিক্ষিতদের ভেতর, ইংরেজ গুরুর দৃষ্টান্তে সকাম কর্মে একটু আস্থা হলেও, নিষ্কাম হয়ে কাজ করা তাঁরা একেবারে বোঝেন না এবং সেই সঙ্গে কর্মের উদ্দেশ্যই বা কি, তাও তাঁদের প্রাণে ঢোকে না। অতএব শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানলাভের দিকে তাঁদের আদৌ ঝোঁক নেই—উহা লাভ করতে উদ্যম করা যে দরকার এটাও তাঁরা বোঝেন না। বোঝেন না যে, এই জ্ঞান আমাদের ঋষিকুল হতে প্রাপ্ত বহুমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। যুগ-যুগান্তরের পরাধীনতার পেষণে ভারতের বিদ্যা, ধন, মান সব গিয়েছে—আছে বাকি যেতে কেবল ঐ জ্ঞান, একজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান, যা লাভ হলে মানুষ সকল অভাবের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হয়। প্রত্যেক হিন্দুর এই জাতীয় সম্পত্তি অতি-সাবধানে রক্ষা করতে হবে। ঐ জ্ঞানের যেদিন লোপ হবে, সেদিন হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে, ভারতের নিজের অস্তিত্ব লোপ হবে এবং কুলধর্ম, জাতিধর্ম, সব খুইয়ে জাতটা উৎসন্ন হয়ে যাবে।

গীতোক্ত এই জ্ঞান উপলব্ধির জিনিস। আমাদের ওঠা, বসা, নাওয়া, খাওয়া, শোয়া প্রভৃতি সকল অবস্থার ভেতর, সকল রকম কাজের ভেতর এর অনুভব চাই। তর্ক, যুক্তি বা কল্পনাসহায়ে ঐ জ্ঞানের একটু আভাস পেয়ে বসে থাকলে চলবে না। অবিদ্যাপ্রসূত কামকাঞ্চনকে জীবনের উদ্দেশ্য করলে চলবে না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের

চর্চা করতে হবে। জ্ঞানে তন্ময় হতে হবে, উন্মাদ হতে হবে, 'মত্ত' হয়ে যেতে হবে।

কর্মযোগের দ্বারা সূক্ষ্ম হলে, মার্জিত হলে তবেই সে বুদ্ধিতে জ্ঞানের উপলব্ধি হবে। পরমহংসদেব বলতেন, "ভগবান বিষয়বুদ্ধির বাইরে, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।" অতএব ফলকামনা ছেড়ে কর্ম করাই হচ্ছে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়; আর নিজের লাভালাভটা যদি আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে যে কাজই করি না কেন, তাহা দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হবেই হবে। কর্মে দোষ নেই—কখনই নেই; কিন্তু দোষ রয়েছে আমাদের ভেতরে। নিজের লাভটাকে কর্মের উদ্দেশ্য করেই আমরা দোষী হয়েছি, আপনার জালে আপনি বাঁধা পড়েছি এবং মুক্ত হবার খেই জনমের মত হারিয়েছি। নতুবা নিজের লাভের আশাটাকে যদি চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে স্বার্থ-গন্ধহীন কোন মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে যাই, তাহলে গীতাকার বলেন—

"হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

—নরহত্যার স্রোত বহালেও আমরা খুনে হব না বা অপরে আমাদের খুন করলেও আমরা মরব না—এই প্রকার অনুভব হবে। পতিব্রতা-উপাখ্যান, ধর্মব্যাধের কথা আমরা সকলেই মহাভারতে পড়েছি বা শুনেছি। কিন্তু সেই সকল আদর্শ চরিত্রের ন্যায় কাজ করতে একেবারে ভুলে গেছি। তাই এ দুর্দশা। গীতাকার সেজন্যই বলছেন, "নিষ্কাম হয়ে কাজ কর, অবিরাম কাজ কর—কিন্তু কর্ম করতে করতে ভেতরে কর্মরহিত হয়ে থাক ও যোগীর অচল শান্তি অনুভব কর।"

কথায় বলে, মানুষ হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে, তার সমস্তই এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে আছে—কিন্তু সমস্তই আছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, তার বৃহৎ প্রতিকৃতি আবার এই বহির্জগতে বর্তমান। মানুষের ভেতর যেমন এই কর্মের ভেতরে কর্মরহিতাবস্থা রয়েছে—কেবল অনুভবের অপেক্ষা মাত্র, সেইরূপ বহির্জগতের অনবরত পরিবর্তন এবং গতির মধ্যেও অচল ক্রিয়ারহিত শান্ত-ভাব সর্বদা বর্তমান। স্থূলভাবে দেখে মনে হয়, এ আবার কি কথা! নানাভাবে অনুক্ষণ স্পন্দনশীল জগতে আবার কোথায় কখন গতিরহিত ক্রিয়ারহিত অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়? প্রজ্ঞাচক্ষু দার্শনিক বলেন, সুখ-দুঃখ, আলো-আঁধার প্রভৃতি বিপরীত দ্বন্দ্বের ন্যায় ক্রিয়া ও ক্রিয়ারাহিত্য, গতি এবং বিশ্রামও জগতে সদা যুগপৎ বর্তমান। ক্রিয়া গতি প্রভৃতি তদ্বিপরীত ক্রিয়ারাহিত্য, গতিরাহিত্য প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেই আমরা বুঝে থাকি। যেখানে ঐরূপ তুলনা করবার উপায় নেই, সেখানে ক্রিয়া এবং গতিও আমাদের অনুভবের সাধ্য নেই। শুধু আমাদের অনুভব হয় না তা নয়, কিন্তু আমরা যাকে ক্রিয়া, গতি ইত্যাদি বলি, তা সেখানে বাস্তবিক নেই। জগতের ভেতরে নানা জিনিসের নানাভাবে অবস্থান দেখে, তুলনা করে আমাদের অনবরত গতি ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হচ্ছে; কিন্তু সমুদয় জগৎটাকে একটা পদার্থ বলে একবার ভেবে নিয়ে তার পর তাতে গতি রয়েছে ভাব দেখি। তার জো নেই। ঐখানেই শান্ত নিস্পন্দ ক্রিয়ারহিত অবস্থা। শুনে বলবে হয়তো 'ওঃ, ও তো কল্পনা!' দার্শনিক হেসে বলেন, না হে, কল্পনা-টল্পনা নয়—ওটাই ঠিক ঠিক সত্য। তোমার বিজ্ঞান ধর্ম প্রভৃতি

সব শাস্ত্রই তো বলে, জগৎটা একটা জিনিস ; এক বই দুই পদার্থ নেই—এক বই দুই শক্তি নেই। আবার ঐ পদার্থ ও শক্তিটাও একেরি বিকাশ। তবে তুমি আমি সর্বদা নানা জিনিসে মন রেখে রেখে আর জগৎটাকে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-নখ-কেশাদি-সমন্বিত মনুষ্যশরীরের ন্যায় একত্র সম্বদ্ধ একটা জীবন্ত জিনিস বলে ভাবতে পারি না। ওখানে আমাদের 'একঘেঁয়ে' প্রত্যক্ষটাই গোল করে, গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না, আর ভ.বে ক্রিয়ারহিত জগৎ আবার কোথায় ? মানুষের আত্মাতে দ্বন্দ্বপ্রসূত ক্রিয়ারাহিত্য অনুক্ষণ বর্তমান। প্রত্যেক পদার্থের শেষ স্তরেও ঐ ব্রহ্মভাব বর্তমান। আবার জীব-জড়াদির সমষ্টিভূত জগৎটাতেও ঐ। অতএব ঐ একভাবটা কবিকল্পনা বা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক নয়। মূলে ঐটাকে ধরেই জগৎটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ভেতরের সদা বর্তমান ঐ অবস্থাটা একবার ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ করতে পারলে আর অনিত্য জন্ম, জরাদি-পরিবর্তন এবং তার চরম ফল মৃত্যুও আর আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না। সেইজন্য ভগবান গীতাকার বার বার অর্জুনকে সামনে রেখে সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন—ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধ্যাদি সর্বদা কাজ করুক, কিন্তু তুমি ঐ অকর্ম ভাবটা প্রত্যক্ষ করে সব কাজ থেকে তফাত থাকতে শেখ। হে মানুষ ! তুমি মানহুঁশ হও, আপনার মহিমায় হুঁশ রাখ, জাগ—অজর অমর আত্মার উপলব্ধি করে অচল অটল শান্তিতে অবস্থান কর। কোনরূপ দুর্বলতায় গা ঢেলে দিয়ে অনিত্য জিনিসগুলিকে নিত্য ধরে রাখবার চেষ্টা করে দুঃখ পেও না। কর্মফলটা ত্যাগ করে কাজ করে যাও। উহারই নাম যথার্থ সন্ন্যাস এবং কর্মযোগও তাই।

'যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।'

দুই পথই এক জায়গায় পৌঁছে দেয়।

'সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।'

অর্জুনের মন থেকে কিন্তু কর্মের চেয়ে জ্ঞান বড়, একথা কিছুতেই যাচ্ছে না। তিনি ভাবছেন—জ্ঞান হলে যখন কর্ম থাকে না, তখন জ্ঞানটাই আসল জিনিস বা লক্ষ্য, অতএব কর্মের চাইতে নিশ্চয় বড। তিনি ভুলে গেছেন যে, গীতাকার যে জ্ঞানটা মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য বলে তাঁর সামনে খাড়া করছেন, সেটা দেশকালাতীত অসীম অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান। অর্জুন যেটাকে জ্ঞান মনে করেন, সেটা নয়। সেটা দেশকালের গণ্ডির ভেতর. কার্যকরণের শৃঙ্খলের ভেতর চির আবদ্ধ। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখতে পাই, ফের অর্জুনের ঐ প্রশ্ন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ফের ঐ বিষয় বোঝাবার চেষ্টা, এবার কিন্তু ভগবান আর একপথ দিয়ে অর্জুনকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন।

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন ! ভেবো না যে, কর্মযোগটা একটা নূতন পথ। জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি পথসমূহের ন্যায় ইহাও বহু পূর্বকাল থেকে মানবকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছে এবং জনকাদি বহু খ্যাতনামা রাজর্ষিগণ ঐ পথ আশ্রয় করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয় রাজারা। এই কর্মযোগের কথা আমি প্রথমতঃ সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলাম। সূর্য তাঁর পুত্র মনুকে বলেন। মনু আবার ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দেন। এইরূপে

উহা বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিত্যকর্মানুষ্ঠায়ী, পুরুষকারপ্রধান, তেজস্বী ক্ষত্রিয়রাজকুলের ভেতরই জীবন্ত ছিল। সে কর্মযোগের আজ লোপ হয়েছে। নিজের সুখটুকু ছেড়ে কেউ আর বহুজনকল্যাণের দিকে তাকিয়ে কর্ম করতে চায় না। ধর্মের ভেতরও ব্যবসাদারী পাটোয়ারী বুদ্ধি ঢুকেছে; অন্য কর্মাদির তো কথাই নেই। তাই তোমাকে আজ আবার সেই পুরাতন কর্মযোগের কথা বলছি। হীনবুদ্ধি, কাপুরুষ, ইন্দ্রিয়দাস, রুগ্নশরীর, ভগ্নোৎসাহ লোকের পক্ষে ঐ পথ-অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ করা সুকঠিন। কিন্তু তোমার ন্যায় বহুজনকল্যাণে চিরনিবদ্ধদৃষ্টি, শ্রদ্ধাবান, বুদ্ধিমান, তেজস্বী, বীরহৃদয়ই ঐ উদার ভাব বুঝতে পেরে দৃঢ়ভাবে ধরতে ও অনুষ্ঠান করতে পারবে। তাই তোমাকে বলা। আপনার শরীরটিতে পাছে কোন আঁচড় লাগে, আপনার ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব প্রভৃতি পাছে না লাভ হয়, এমন কি আপনার মুক্তিলাভ পাছে না হয়, এইরূপ ভাব যার হৃদয়ে সদা বর্তমান, সে কখনও কর্মযোগী হতে পারবে না। কর্মযোগী হবে তেজস্বী উদারমনা বীর, যে সত্যের জন্য বা অপরের কিছুমাত্র কষ্ট দূর করবার জন্য, স্বদেশপ্রেমের জন্য, মহাপুরুষের গৌরবের জন্য আপনাকে এককালে ভুলতে পারবে—আপনার সুখ ঐশ্বর্যাদির নাশ হলেও ভ্রূক্ষেপ করবে না।

পুরাতন জিনিসের আদর করা মনুষ্যমনের স্বভাব। পরিবর্তনের স্রোত অতিক্রম করে বহুকাল যা একভাবে থাকে, তারই মানুষের কাছে কদর। অনিত্যের ভেতর নিত্য পদার্থের অনুসন্ধান মানবের প্রাণে প্রাণে সর্বদা আছে বলেই বোধ হয় ঐরূপ হয়। সাধারণ মানবের চেয়ে গুণী মহাপুরুষদের হৃদয়ে আবার ঐ ভাবটা বিশেষ প্রবল দেখা যায়। অর্জুনের ন্যায় বীরাগ্রণীর হৃদয়ে ঐভাব প্রবল দেখেই ভগবান কর্মযোগের ইতিহাস কীর্তন করে তাঁকে ঐ দিকে নেওয়াচ্ছেন।

আর এক কথা—ক্ষত্রিয়েরাই, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় রাজারাই এই কর্মযোগ অনুষ্ঠান করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতেন এবং তাঁদের নিকট থেকেই ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণের ভেতর ঐ কর্মযোগের প্রচার হয়েছিল। এ কথাটায় অনেকের আশ্চর্য বোধ হতে পারে, বিশেষতঃ আজকালকার ব্রাহ্মণদের তো পারেই। কারণ তাঁদের বিশ্বাস, ভারতের যত কিছু শাস্ত্র-জ্ঞান ব্রাহ্মণবর্ণেরই একচেটে অধিকারে ছিল, আর তাঁরাই দয়া করে অন্য বর্ণকেও দিয়েছিলেন। এ কথা কোন কোন বিষয়ে সত্য হলেও সকল বিষয়ে যে নয়, তার ঢের প্রমাণ আছে। আমরা এইমাত্র দেখলাম, গীতাকার বলছেন, কর্মযোগ প্রথম ক্ষত্রিয় রাজাদের ভেতরেই ছিল। এইরূপে ছান্দোগ্য উপনিষদ্-পাঠে দেখা যায়, আরুণি ও শ্বেতকেতু—ব্রাহ্মণ পিতা-পুত্রে প্রবাহণ-জৈবলি রাজার এবং প্রাচীনশালাদি পঞ্চব্রাহ্মণ কৈকেয় অশ্বপতি রাজার শিষ্যত্ব স্বীকার করে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ নিচ্ছেন। এইরূপে কর্মযোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম উদয় যে ক্ষত্রিয়-রাজকুলের ভেতর হয়েছিল, একথা শাস্ত্রপাঠে খুব সম্ভবপর বলে বোধ হয়।

কর্মযোগের ইতিহাস-কীর্তন হতে অর্জুনের মনে আর এক প্রশ্নের উদয় হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সূর্যকে তিনি প্রথমে কর্মযোগ উপদেশ করেছিলেন। অর্জুন ভাবলেন, এ কেমন কথা? শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তো সেদিন হল, আর সূর্যের উৎপত্তি কত-

কাল পূর্বে হয়েছে। তাঁকে ইনি উপদেশ দিলেন কি করে? এই সন্দেহের প্রসঙ্গেই ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার ও তাঁদের স্বরূপসম্বন্ধীয় কথার অবতারণা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সূর্যকে আমি বহু পূর্বকালে অন্য মূর্তিতে ঐ উপদেশ করেছিলাম। কিন্তু আমিই যে সেই মূর্তিতে ঐ উপদেশ দিয়েছিলাম, এ বিষয় আমার বেশ মনে আছে। কেননা আমি ঈশ্বরাবতার, আমার জ্ঞানের কখন লোপ হয় না। তুমি এবং আমি উভয়ে বহু বার বহুস্থানে জন্মগ্রহণ করে 'বহু-জনহিতায়' বহু কর্মের অনুষ্ঠান করেছি ও করব। তোমার সে সব মনে নেই। আমার কিন্তু পূর্ব পূর্ব বারের সকল কথাই মনে আছে। অবতার-সম্বন্ধে ভগবান গীতাকার কি শিক্ষা দেন, তা আমরা পরবারে আলোচনা করব।

(১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

... ...

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

অর্থাৎ, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়,...তখনই আমি প্রকৃত ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই। যখনই ভক্তি ও জ্ঞান-শিক্ষার জন্য আচার্যের প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি আচার্যরূপে অবতীর্ণ হন। তিনিই যথার্থ গুরু এবং জগৎ ও তাঁকেই অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। তিনিই মায়ান্ধ ও বিষয়াসক্ত জীবের চোখ ফুটিয়ে দেন। একভাবে তিনিই সমস্ত জগদ্রূপে বিরাজিত, স্থাবর জঙ্গম যা কিছু দেখতে পাই সকলই তাঁর প্রতিকৃতি; অন্যভাবে তিনিই সমস্ত জীবজন্তুতে চৈতন্যস্বরূপে বর্তমান আছেন। আবার প্রকৃত ধর্ম ও শান্তিস্থাপন করবার জন্য তিনি জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি মনুষ্যশরীরে মায়ার অধীশ্বররূপে অবতীর্ণ হয়ে মায়াবশ জীবকে মুক্তির প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করেন। যুগে যুগে শরীর বিভিন্ন হলেও অবতার ভিন্ন ভিন্ন নন, একই। তিনিই প্রয়োজনানুসারে নানারূপে অবতীর্ণ হন। যখন যেরূপ ভাবের দরকার, তখন সেরূপ ভাবে অবতীর্ণ হয়ে তিনি লোকশিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে তিনি বহুবার অবতীর্ণ হয়ে বহু ভাব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এইজন্যই ভারতবর্ষ সকল জ্ঞানের আকর-স্বরূপ ছিল। যখনই আবশ্যক হয়েছে, তখনই তিনি হাত ধরে এই ভারতবর্ষকে তুলেছেন। সেইজন্যই এখনও পদদলিত, অত্যাচারিত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে কত কত ধর্মবীর ও কর্মবীর আবির্ভূত হয়ে আমাদিগকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। সেইজন্য

আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত ধর্মক্ষেত্রে অন্যান্য দেশাপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মেতেই আমাদের উন্নতি। আমাদের দেশ ধর্মগতপ্রাণ, ধর্মেতেই যেন বেঁচে আছে। এখানে নিত্যক্রিয়া শৌচাদি হতে বিবাহ-পদ্ধতি প্রভৃতি গুরুতর সামাজিক নিয়মসকলও ধর্মের অঙ্গস্বরূপে গণ্য হয়ে থাকে।

সমস্ত আমরা ঠিক ঠিক করতে পারি আর নাই পারি, আমাদের সমস্ত আচার-ব্যবহার, চালচলন সমস্তই যে ধর্মলাভের জন্য, তাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নেই। অবশ্য অন্যান্য দেশ অন্যান্য বিষয়ে খুব বড় হয়েছে। অন্যান্য দেশ রাজনীতি, সমাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঐহিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষস্থানীয় হয়েছে। ভারতের প্রাণ ধর্মের উপর স্থাপিত, ধর্মবলেই ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, আবার ধর্মকে অবলম্বন করেই যে ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি হবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। তারই সূচনাস্বরূপ আজকাল চতুর্দিকে নামে রুচি, সাধন-ভজনে শ্রদ্ধা ও ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষা দেখতে পাচ্ছি এবং চতুর্দিকেই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের আলোচনা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বে জ্ঞান বললেই লোকে কিম্ভূতকিমাকার ভাবত, জ্ঞানী বললেই নাস্তিক ভেবে ঘৃণার চক্ষে চাইত। 'অহং-ব্রহ্মাস্মি' বললে ভক্ত কানে হাত দিত। আবার জ্ঞানীও ভক্তকে কুসংস্কারাপন্ন বলে উড়িয়ে দিত। এইরূপে বহুকাল ধরে ভক্তি ও জ্ঞানপথের সাধকদিগের ভেতর এইরূপ বিরোধ চলে আসছে। কিন্তু যাঁরা জ্ঞান ও ভক্তির আচার্য ও প্রচারক, তাঁদের মধ্যে এ ভাবের বিরোধ কোনও কালে ছিল না।

একটা গল্প আছে, শিব ও রামের বিরোধ হয়েছিল, তাতে শিবের চেলা ভূত ও রামের চেলা বানরের ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে লাগল। তারপরে শিব ও রামের মিলন হল, উভয়ে একপ্রাণ, এক আত্মা হলেন, কিন্তু বানর ও ভূতের যুদ্ধ আর থামল না। আচার্যগণের কোন বিরোধ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁদের অনুবর্তিগণ চিরকালই বিবাদ করে মরছে। আজকাল বোধ হয়, সে বিরোধের ভাব যেন ক্রমেই কমছে। সে হাওয়া যেন ক্রমেই মন্দীভূত হচ্ছে। যোগ, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত ভাবই এক ভগবান হতে প্রসূত। এই চারটি পথ অবলম্বন করেই মানবের ধর্মলাভ হতে পারে—সর্বত্রই যেন লোকের এই ভাব, এই ধারণা হতে আরম্ভ হয়েছে।

পূর্বে বলেছি, প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্তে বাস্তবিক বিরোধ নেই। শাস্ত্রপাঠে দেখতে পাই, পূর্বে যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁদেরই মধ্য হতে নির্মল ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হয়ে জগৎকে পবিত্র ও কৃতার্থ করেছে। আবার যাঁরা প্রকৃত ভক্ত বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁরাই জ্ঞানের আলোক-বিস্তারে মানবকে সমদৃষ্টির পথে অগ্রসর করেছেন। এই জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে কোথায় আছে, ইহাই আজকের আলোচ্য বিষয়। শিবাবতার জ্ঞানাচার্য গুরু শঙ্কর-প্রণীত গ্রন্থপাঠে আমরা কি দেখতে পাই ? তৎপ্রণীত গঙ্গা, শিব, অন্নপূর্ণা ও বিষ্ণুর স্তব পাঠ করে কেমন করে বলব যে, তিনি ভক্তিশূন্য কঠোর জ্ঞানী নাস্তিক ছিলেন ? শারীরক ভাষ্য ও তৎপ্রণীত অশেষ দেবদেবীর স্তবাদি পাঠ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁর মধ্যে ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সামঞ্জস্য রয়েছে। সেইরূপ ভক্তাবতার আচার্য শ্রীগৌরাঙ্গের

মধ্যেও আবার অদ্বৈতজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যদি তিনি জ্ঞানের বিদ্বেষী হবেন, তবে কেন তিনি পূজ্যপাদ কেশব ভারতীর নিকটে স্বয়ং সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হলেন ? উভয় পথের আচার্যদের জীবনে ও শিক্ষায় তো কোন বিরোধ দেখতে পাই না। তবে বিরোধ কোথায় ? বিরোধ কথায় ও বাক্যবিন্যাসে। বিরোধ অনুবর্তীদের স্বার্থ-পরিচালনে। ভক্তি ও জ্ঞানের চরম লক্ষ্য একই। একই লক্ষ্যে উপনীত হবার ভিন্ন দুইটি পন্থামাত্র। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই উদ্দেশ্য কাঁচা 'আমিত্বের' বিনাশ করা। যে 'আমি' সংসার ও বিষয়বাসনায় জীবকে বদ্ধ করে রেখেছে, সেই তুচ্ছ মিথ্যা আমিত্বের স্থানে শ্রীভগবানের দাস বা তাঁর অংশ আমি—এই মহান্ আমিত্বের বিকাশ করা। ভক্তি ও জ্ঞান এই কাঁচা আমি বিনাশ করবার দুইটি উপায়মাত্র। ভক্ত চান তাঁর সমস্ত ভগবৎ-পাদপদ্মে অর্পণ করতে। সমস্ত কার্য ও চিন্তা, অর্থ স্ত্রী বা পুত্র, আপনার বলতে তাঁর যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর নয়, ভগবানের—এই ভাবটি সর্বাবস্থায় সর্বতোভাবে প্রাণে রাখা এবং তদনুযায়ী কার্য করাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শরীর-ধারণোপযোগী আহারাদি ব্যাপারও ভক্ত নিজের জন্য না করে ভগবানের সেবার জন্য করেন। জীবনধারণও তাঁর প্রিয়তমের সেবা ভিন্ন অন্য কোন কারণে নয়। ভক্ত চান, আমিত্বকে তুমিত্বরূপ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে, আমি অমুকের ছেলে, আমি বিদ্বান, আমি ধনী মানী জ্ঞানী প্রভৃতি অভিমানপ্রসূত আমিত্বকে ঠাকুরের পাদপদ্মে চিরকালের মতো ফেলে দিয়ে বিশ্বতোমুখ ভগবানের সেবা করতে। ভক্তের চক্ষে তাঁর প্রিয়তমই জড় চেতন নানারূপে খেলা করছেন, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি, তিনিই কুমার, তিনিই কুমারী, তিনিই দাসদাসী, সর্বত্রই তাঁর হস্ত পদ চক্ষু। এ সংসার তাঁরই মূর্তি—এই জ্ঞানে যথার্থ ভক্ত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিরূপে বিরাজিত তাঁর আরাধ্য প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ভক্তের বেঁচে থাকা সেবার জন্য, কিছুতেই আসক্তি নেই। স্বার্থপরতা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে। মরণেও আপত্তি বা কষ্ট নেই। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় স্বীয় ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়ে ভক্ত ইহজীবনেই সাক্ষাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করেছেন। ভক্তির আচার্য নারদ ঋষি ভক্তিসূত্রে ভক্তির লক্ষণ করেছেন, 'সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা'—ভগবানে যে ঐকান্তিক প্রেমভাব, তারই নাম ভক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় ঐ রকম ভক্তের কথা বলেছেন, যথা—'আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।'. যে রোগে বিপদে নিতান্ত অভিভূত হয়েছে, নিতান্ত নিরাশ্রয়, সে নিতান্ত ব্যাকুলভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। এরই নাম আর্তভক্তি।

মনে নানাপ্রকার সন্দেহ এসেছে। এই জগতের কেহ কর্তা আছেন কিনা, এই জগতের সর্বত্র সর্বদা পরিবর্তন হচ্ছে, কে করছে, এর কারণ কি—এইসকল জানবার জন্য প্রাণে বিশেষ আগ্রহ, বিষয়সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ আর ভাল লাগে না, কোন সৎপুরুষ বা জ্ঞানীপুরুষ দেখলেই জিজ্ঞাসার জন্য ছুটে তাঁর কাছে যায়, এই সব তত্ত্ব জানবার জন্য ব্যাকুলভাবে নিজনে চিন্তা করে, এই সব লক্ষণ হলে তাকে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলা যায়।

তৃতীয় অর্থার্থী। বিশেষ কোন কামনায় প্রাণ ব্যাকুল, আবার তৎকামনাপূরণে নিজের শক্তিও নেই, এজন্য যে ভগবানকে উপাসনা করে, সে অর্থার্থী ভক্ত। চতুর্থ

জ্ঞানী। জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। ভগবান বলেছেন, "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি-বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ"—সর্বদা তাঁর মন ভগবানে যুক্ত হয়ে রয়েছে, সেই একভক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। জ্ঞানীর মন সর্বদাই কাম-কাঞ্চন, বিষয়ানুরাগ, শরীরানুরাগ প্রভৃতির পারে বর্তমান। জ্ঞানীর সম্বন্ধে একভক্তি বিশেষণ এই নিমিত্তই প্রযুক্ত হয়েছে। অবিশ্রান্ত নদীর স্রোতের ন্যায় একভক্তির বিরাম নেই, সর্বদা ভগবৎপাদপদ্মে প্রবাহিত। এক ভক্তির বিশেষ লক্ষণ দেবীগীতায় সুন্দররূপে প্রদত্ত হয়েছে। পাত্র হ'তে পাত্রান্তরে তৈল ঢাললে যেমন অখণ্ডিত ঘনধারে পড়ে থাকে, সেইরূপ একপ্রকার ভক্তিধারা বিষয়বায়ুতাড়িত হয়ে কখন খণ্ডিত বা তরলায়িত হয় না। জ্ঞানীর লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"—সমস্তই ভগবানময় এইরূপ যাঁর জ্ঞান হইয়াছে, সেই মহাত্মা জ্ঞানী ; এই প্রকার লোক অতি দুর্লভ। এই প্রকার জ্ঞানীর দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র আমিত্ব চিরকালের মত বিদায় গ্রহণ করেছে। তখন তিনি বুঝতে পারেন "আমি সকলের অন্তরে-বাহিরে, আমি সকলের সাক্ষিস্বরূপ, আমারই শক্তিতে মন-বুদ্ধি ক্রিয়াশীল, আমিই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ, আমি সর্বভূতে আছি ও সর্বভূত আমাতে আছে।" এইরূপ জ্ঞান অনেক সাধনা ও চেষ্টার ফলে উপস্থিত হয়। এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পূর্বে ভগবানে টান হওয়া দরকার , যেমন বিষয়ীর বিষয়ে, সতীর পতিতে, কৃপণের ধনেতে টান, সেই রকম টান হওয়া চাই। যেমন মাতাল মদে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া চাই। গীতায় ভগবান বলেছেন, "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে"—বিষয়ের ধ্যান করতে করতে যেমন তাতে অত্যাসক্ত এসে জীবকে ধীরে ধীরে বিনাশের পথে নিয়ে যায়, ধর্মসম্বন্ধে ঐরূপ আসক্তির দরকার ; ভগবানের ধ্যান করতে করতে ঐরূপ আসক্তি উপস্থিত হলে মানব বিনষ্ট না হয়ে মুক্তির দিকে সত্বর অগ্রসর হয়।

প্রথমতঃ যাঁরা ভক্ত, ভগবৎপ্রেম যাঁদের জীবনকে পবিত্র করেছে, তাঁদের অপূর্ব ভাব দেখে সাধারণ মানবের মন আকৃষ্ট হয়ে সেইরূপ হওয়ার জন্য ইচ্ছা হয়। বিষয়ে যেমন আসক্তি হয়, এও সেই প্রকার আসক্তি। প্রভেদ এই, ইহা উচ্চ বিষয়-অবলম্বন হওয়াতে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। সেই হেতু দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি আচার্যেরা বলেছেন যে, কামাদি রিপু তত দিন, যতদিন উহারা রূপ-রসাদি-বিষয়াবলম্বনে মনে উদিত হয়, কিন্তু একবার উহাদের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারলে উহারাই ভগবানলাভের সহায় হয়। কোন কামনা পূরণ করার জন্য লোকে প্রথমতঃ ভগবানকে ডাকে, কেননা তাঁতেই সর্ব কামনা পূর্ণ করবার শক্তি বর্তমান। সকাম মনে ডাকতে ডাকতে মানব যখন একবার তাঁকে ভালবেসে ফেলে; তখন আর তার পালাবার পথ থাকে না। সকাম ভালবাসা হতেই ক্রমে ক্রমে নিষ্কাম প্রেম এসে উপস্থিত হয়। এই নিষ্কাম প্রেম হলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। শাণ্ডিল্য ঋষি এই প্রেমের লক্ষণ ধরে বলেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরে যে পরম অনুরাগ তাই প্রেম, তাই পরাভক্তি। ভক্তরাজ প্রহ্লাদও একস্থলে বলেছেন, "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী। ত্বমনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥" —হে ভগবান, বিষয়ীর বিষয়ে যেমন টান,

তোমাতে আমার যেন তদ্রূপ টান হয়। মনে হয় যেন প্রহ্লাদ অতি সামান্য কথা বলেছেন, কিন্তু তলিয়ে দেখলে এর সার্থকতা উপলব্ধি হয়। সাংসারিক ভাব হতে উচ্চ কল্পনা সাধারণ মানবের আসে না। সংসারে পিতা-মাতাকে, বন্ধুকে ও স্বামী প্রভৃতিকে যেমন ভালবাসা যায়, তেমন ভালবাসা বা মনের টান ভগবানে হলে ভগবানলাভ অতি সন্নিকট হয়।

বৈষ্ণবগণ এইজন্য ভক্তির পাঁচ ভাগ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, প্রত্যেক লোকের প্রবৃত্তি-অনুসারে এক একটি পার্থিব সম্বন্ধ অতি মধুর বলে উপলব্ধ হয়। মহাভারতে দেখতে পাই—ভীষ্ম, উদ্ধব, বিদুর, অর্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নানা লোকে এক শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব স্ব প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসছেন। কিন্তু সকলে তাঁর সহিত একই সম্বন্ধস্থাপন করতে পারছেন না। বিদুরের দাস্যভাব, অর্জুনের সখ্যভাব। ভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে এক একজন আবার এক এক কর্মে নিযুক্ত। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট গীতা শ্রবণ করে ও তাঁর পাদুকা নিয়ে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করতে চললেন। বিদুর নানারূপে সেবা ও নানা তীর্থ পর্যটন করে পরে পরমহংস-পদবীলব্ধ অদ্বৈতজ্ঞানে শরীরত্যাগ করলেন, অর্জুন আবার সেই গীতোক্ত জ্ঞানলাভ করে অলৌকিক উদ্যমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। গোপীদের আবার অন্য ভাব। শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করতে করতে তাঁরা গৃহকর্ম, স্বামী, পুত্র, কন্যা, এমন কি তাঁদের দেহ পর্যন্ত ভুলে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। একজন গোপিকা তাঁর স্বামিকর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হয়েছিলেন। ফল এই হল যে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে করতে তন্ময় হয়ে সমাধিতে শরীর পরিত্যাগ করলেন। একথা ভাগবতে লিপিবদ্ধ। আবার রাসলীলার কথা মনে হলে এই তন্ময়ত্বের ভাব আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হন, তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে এমন তন্ময় হন যে, আপনাদের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে 'আমিই শ্রীকৃষ্ণ' এইভাবে ভগবানের লীলানুকরণ করেছিলেন। ভক্তির চরমে এমন তন্ময় হয় যে, উপাস্য-উপাসক এক হয়ে যায়। শ্রীমতী রাধাকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "তুমি শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখ ?" তাতে তিনি উত্তর করেন, "নাসৌ রমণো নাহং রমণী," অর্থাৎ আমি একেবারে ভুলেছি যে, আমি রমণী এবং তিনি পুরুষ ও আমার স্বামী—এইজন্য আমি তাঁকে ভালবাসি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার প্রেম সাধারণ স্ত্রীর প্রেমের ন্যায় শরীরানুরাগ বা গুণানুরাগ-অবলম্বনে প্রবাহিত নয়, কিন্তু হেতুশূন্য হয়ে স্বতঃই সর্বদা প্রবাহিত থাকে। আমরা দেখলাম যে, ভক্তির চরমে দেহাত্মবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র আমিত্ব একেবারে চলে যায়। এখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ইহা কতদূর সত্য, দেখা যাক। জ্ঞানী বলেন, এই 'আমি' ঠিক নয়, মায়া, তবে কোন্‌টি প্রকৃত 'আমি' ? প্রকৃত 'আমি' শরীর, মন প্রভৃতি সকলের অতীত ও এদের সাক্ষিস্বরূপ, সকল অবস্থায়ই একরূপে বর্তমান, হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। এই 'আমি' সকলেতে। আমাদের এই ক্ষুদ্র 'আমি' সেই মহান্ 'আমিত্বে'র অংশমাত্র। সেই মহান্ আমিত্ব হতে এই ক্ষুদ্র আমিত্বের উদ্ভব। জ্ঞানীর উদ্দেশ্য, এই মহান্ আমিত্বের সর্বদা উপলব্ধি করা, এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে সেই মহান্ আমিত্বে ডুবিয়ে দেওয়া।

অতএব দেখা গেল, ভক্তের তন্ময়ত্ব ও জ্ঞানীর মহান্ আমিত্ব একই। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই ক্ষুদ্র আমিত্বকে ডুবাতে চাইছেন। হনুমানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি কি ভাবে রামচন্দ্রকে উপাসনা কর ? তাতে তিনি উত্তর করেন, "যখন আমার মন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে নিবদ্ধ থাকে তখন দেখি—তিনি প্রভু ও আমি তাঁর দাস। যখন আপনাকে জীবাত্মা বলে অনুভব করি, তখন দেখি—তিনি পূর্ণ ও আমি তাঁহার অংশ। তিনি সূর্যস্বরূপ এবং আমি সেই সূর্যের বহু কিরণের একটিমাত্র। আবার যখন আমার মন সমাধি-অবলম্বনে সকল উপাধির বাইরে যায়, তখন দেখি—তিনি ও আমি এক।" অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, স্থূল শরীরে ও স্বার্থপরতার মধ্যে মন থাকলে 'সোঽহং' বলা নিরর্থক। জীবাত্মা বলে আপনাকে উপলব্ধি করলে মানব আপনাকে ভগবানের অংশমাত্র বলে বোধ করবে, তখনই তার উপাস্যের সহিত অভিন্ন ভাব আসবে।

মনের অবস্থাভেদে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এসে উপস্থিত হয়। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর উপযোগী এই তিন প্রকার মতই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখতে পাই। আমরা দেখলাম, ভক্ত চায় সব ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করে ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ করতে। আর জ্ঞানীও বলেন, "মুক্তি হবে কবে, 'আমি' যাবে যবে।" আমিত্বই জঞ্জাল। অতএব উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, কেবল কথার প্রভেদ, লোকে বুঝতে পারে না। কিন্তু ঠিক ভক্ত ও জ্ঞানী কথায় ভোলে না। তারা চায় যথার্থ সত্য অনুভব করতে। উত্তরগীতায় আছে, "মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হি। সারং তু যোগিনঃ পীতাস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥"—সারবস্তু অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবানকে ছেড়ে পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র বাগাড়ম্বররূপ ঘোল খেয়ে থাকেন। জ্ঞানী পুরুষই দুগ্ধের সারবস্তু মাখনের ন্যায় সার গ্রহণ করে থাকেন। উত্তরগীতায় এ সম্বন্ধে আর এক শ্লোক আছে—

"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।"

অর্থাৎ চন্দনকাষ্ঠের ভারবাহী গর্দভ ভার বয়েই মরে, চন্দনের গন্ধ অনুভব করতে পারে না। পাণ্ডিত্যাভিমানীর এই দশা।

কার্যে পরিণত না করলে শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনা আর না-শোনা উভয়ই সমান। সত্য অনুভব করতে হবে, জ্ঞান ও ভক্তি জীবনে পরিণত করতে হবে। উন্নত হলে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ তিনটির প্রয়োজন। দুটি পাখা ও একটি পুচ্ছ না হলে পাখী উড়তে পারে না। এইরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ—এ তিনটি না থাকলে যথার্থ উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। জ্ঞানবিচারবিরহিত ভক্তের মন কীর্তনের সময় যেমন উচ্চে উঠে থাকে, কীর্তনান্তে তেমনি আবার বিষয়ের প্রলোভনে পড়ে যায়। বিচারবিবেকবিরহিত মনকে তখন ধরে রাখা অসম্ভব। জ্ঞান-বিচার ও যোগ সে সময়ে সমতা-রক্ষার সহায়ক। মনকে আয়ত্ত করতে হবে। সে শক্তিও আমাদের ভেতরেই আছে।

মন-মুখ এক করাই এই বিষয়ের প্রধান সাধন। পরমহংসদেব বলতেন, মন-মুখ এক করার নামই প্রকৃত সাধন। যদি কেহ মন-মুখ এক করে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে,

তিনি কি তাহা পূর্ণ করবেন না? ধ্রুবের গল্প স্মরণ কর। সে মন-মুখ এক করে ব
ভগবানকে ডাকছিল। কোন সহায় ছিল না, এমন কি গুরুর সহায়তা পর্যন্ত ছিল না
মন-মুখ এক করেছিল বলেই ভগবান গুরু দিলেন ও তাকে দর্শন দিলেন! মন-মুখ এ
হলে যা কিছু দরকার, তিনি জুটিয়ে এনে দেবেন। গীতাতেও আমাদিগকে বলছে
"মন-মুখ এক কর।" যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মনে মোহ ও ভয় এসেছিল। মোহ—আত্মী
স্বজনের জন্য, যাঁরা যুদ্ধার্থী হয়ে কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। ভয়—ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, সমক
কর্ণ, শস্ত্রাচার্য দ্রোণ, শিবপ্রদবরদর্পী জয়দ্রথকে বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে। ইঁহাদের স
যুদ্ধ সোজা নয়। মায়ার অপূর্ব প্রভাব! অর্জুনের ন্যায় মহাপুরুষেরও সাময়িক মো
ও ভয় এসেছিল। এরূপ মোহ ও ভয় মানবের স্বাভাবিক। তিনি তাঁর কর্তব্য ভু
গিয়েছিলেন। ভেতরে শোক, ভয় ও মোহের নিমিত্ত যুদ্ধত্যাগের সংকল্প ও মুখে ধর্মে
ভানে যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবার কথা বলেছিলেন। ভগবা
অন্তর্যামী, তিনি বলেছেন—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

অর্থাৎ তুমি পণ্ডিতদের মতো, ব্রহ্মজ্ঞানীর মতো কথা বলছ, আবার আত্মীয়-স্বজনে
জন্য শোক করছ। যথার্থ জ্ঞানী নিজের বা অপরের শরীরনাশেও শোক করেন ন
তোমার কথায় ও কাজে মিল নেই। পরমহংসদেবও আমাদের ঐ কথা বলতেন, "ম
মুখ এক কর।" মন-মুখ এক হলে উন্নতি কে রোধ করে? এক সাধনপ্রভাবে
কিছু দরকার, আপনি এসে উপস্থিত হয়।

পূর্বোক্ত প্রথম শ্লোকটি এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটি মনে রেখে জীবনে পরিণত কর
পারলেই ধর্মলাভের বাকি থাকে না।

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

অর্থাৎ মন-মুখ এক করে আমার শরণ গ্রহণ কর। আর একটি কথা আমরা সকলে
ভুলে গেছি—সর্বভূতে নারায়ণ-জ্ঞান। পরমহংসদেব বলতেন, "সংসারে ধনী লোকে
বাড়ীর চাকরানীর মতো থাকবি।" চাকরানী নিজের সন্তানের মতো প্রভুর ছেলেদে
মানুষ করে, কিন্তু জানে যে, যখন তাকে বিদায় দেবে, তখনই যেতে হবে। এ
প্রকারে সংসারে থাক। স্ত্রী-পুত্র তিনিই ন্যস্তস্বরূপ তোমার কাছে রেখেছেন। ন্যস্তস্বরূপ
বা কেন. তিনিই স্ত্রী-পুত্র নানা মূর্তিতে তোমার সেবা গ্রহণ করছেন। যা কিছু কর
তাঁরই সেবা করছ। কাঙ্গালীকে খাওয়াচ্ছ, কি ভিক্ষুককে একটি পয়সা দিচ্ছ—তিনি
ভিক্ষুক ও কাঙ্গালী রূপে তোমার সেবা নিচ্ছেন। এই ভাব মনে রেখে কাজ করে
অহংকার ত্যাগ করো। অহঙ্কারেই সর্বনাশ। এই ভাব পেলে আর ভয় নেই, কিছুতে
আর বাঁধতে পারবে না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা, যেন এই ভাব
সর্বতোভাবে আমাদের সকলের মনে আজ হতে উদিত থাকে।

ওঁ হরিঃ ওঁ। শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

[২৯শে পৌষ, ১৩১০, বালি হরিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ]

বেদান্ত ও ভক্তি

বাঙ্গলাদেশে জ্ঞান ও ভক্তির ধারণা

এদেশে ভক্তির প্রাধান্য। কোমলাঙ্গ, কোমলস্বভাব বাঙালী—ভক্তির ধর্মই বোঝে—ভক্তিশাস্ত্রের শব্দাবলী-(যথা—দর্শন, ভাব, প্রেম, সাত্ত্বিকবিকার ইত্যাদি) প্রয়োগে সুচতুর। বাঙ্গলার কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তির, ভালবাসার কথাই গেয়েছেন। আধুনিক কবিরাও "মহাজনো যেন গতঃ" বলে প্রধানতঃ সেই পথেই নৌকা চালিয়েছেন। ৪০০ বৎসর পূর্বে যে মহাপুরুষ বঙ্গদেশ ধন্য করেছিলেন—অপূর্ব প্রেম ও অলৌকিক ত্যাগের মিলনভূমি যাঁর জীবন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার পবিত্রতা রক্ষার প্রধান সহায—তিনিও ভেতরে যাই থাক, বাইরে ভক্তির কথাই জনসমাজে প্রচার করেছিলেন এবং ভক্তির প্রভাবেই বাঙ্গালীর হৃদয়ে রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন। বাঙ্গালীর দেশ, শরীর, স্বভাব, ভাষা, কবিতা ও পরে তৎসমস্ত ভক্তির বিশেষ উপযোগী না হলে কখনই আমাদের ভেতর ভক্তাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর আবির্ভাব হত না।

বাঙ্গলায় ভক্তি-ধর্ম যেমন প্রবল, জ্ঞান ও জ্ঞানের চর্চাও আবার তেমনি বিরল। "ইনি বড় জ্ঞানী ও বিচারবান"—একথা বললে দেশের অধিকাংশ লোকে ভাবে—সে আবার কি ? ইনি তো কীর্তনে নাচেন না ! কই ভগবৎপ্রেমে তো এঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি উপস্থিত হয় না ! আবার যদি কেহ জ্ঞানশাস্ত্র-পরিচিত সমাধি, অস্তি-ভাতি-প্রিয়, পঞ্চকোষ, সপ্তভূমিকা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেন, তা হলেই চক্ষুস্থির। অধিকাংশ শ্রোতা এদিক-ওদিক দেখে পাশ কাটাতে ব্যস্ত হন। কেহবা বলেন 'শুষ্ক মার্গ'। কেহ বা গোঁড়ামির স্রোতে গা ঢেলে, আর একটু অগ্রসর হয়ে 'বেদান্ত', 'অদ্বৈতবাদ', 'নাস্তিকতা,' 'ঈশ্বরাবমাননা', 'নরকে যাবার পথ'—সব একই কথা স্থির সিদ্ধান্ত করে নাসিকা উত্তোলন ও ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

বাস্তবিক কি তবে ভক্তি ও জ্ঞান-পথের সামঞ্জস্য নেই ? জ্ঞান ও ভক্তির মিলনভূমি ক কেহই স্পর্শ করতে পারেন না ?

ধর্মশাস্ত্রাদিতে জ্ঞান ও ভক্তির অদ্ভুত সামঞ্জস্য

শাস্ত্রপাঠে অবগত হই, ভক্তিশাস্ত্রের ভেতরেই কত জ্ঞানের কথা ! ভক্তপ্রধান শাস্ত্র বিষ্ণু ভাগবতে পদে পদে জ্ঞান ও অদ্বৈতবাদের অবতারণা। নারদাদি ভগবদ্-ভক্তেরা ব্রহ্মজ্ঞানের নিন্দা করা দূরে থাকুক, তার জন্য কত যত্ন, কত তপস্যাই করেছেন। পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থানের জন্য স্বয়ং প্রয়াসী, ভক্তাগ্রণী উদ্ধবকে তিনি 'একান্ত, তুষারধবলিত, সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের উদ্বাহভূমি বদরিকাশ্রমে জ্ঞানসাধনার্থ

পাঠাচ্ছেন, ভক্তি ও প্রেমের মূর্তিরূপিণী ব্রজাঙ্গনাদের ধ্যান ও জ্ঞান-বুদ্ধি করবার জন্য 'কোকিলকূজিত কুঞ্জ'-মধ্য হতে অন্তর্ধান হচ্ছেন। আবার, অনন্যচিন্ত তন্মনস্ক গোপিকাগণ কিশোর ভগবানের কমনীয় মূর্তি ধ্যান করতে করতে 'আমি বাসুদেব' ইত্যাকার একতাজ্ঞানের আভাস অনুভব করছেন। এমন কি, প্রেমের উজ্জ্বলভূমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও স্বয়ং কেশব ভারতীর নিকট হতে 'তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ও পূর্ণস্বরূপ'—এই মহামন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করছেন।

অন্যদিকে আবার কুমার-সন্ন্যাসী, ত্যাগ ও জ্ঞানের জ্বলন্তমূর্তি, ভগবান শঙ্করাচার্য —বৌদ্ধ বিপ্লবের পর যিনি সমগ্র ভারতে বেদ ধর্মের সনাতন ধ্বজা পুনরুত্তোলন করেন—শিবাবতার সেই মহাবীরের, ভক্তিসুধাপ্লুত হরি-হর-গিরিজা ও গঙ্গা-স্তোত্রাদির পাঠে কে না বিমোহিত হয়ে থাকেন? মায়াগন্ধহীন পরমহংসাগ্রণী মহাতেজা ভগবান শুক স্বয়ং ভাগবত-বক্তা। সনক-সনাতনাদি আত্মারাম মুনিগণ ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করছেন। বেদমূর্তি মহাজ্ঞানী ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করে শান্তিলাভ করেছেন। এমন কি 'জ্ঞানসিন্ধু' 'জগদ্-গুরু' মহাদেব—যিনি স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বের প্রধানাচার্য—হরিভক্তি প্রদান করে মহামুনি নারদের জীবন চিরকালের জন্য ধন্য করছেন।

অতএব আমাদের পূর্ব প্রশ্নের সামঞ্জস্য নিশ্চিত আছে। স্থির মনে শ্রদ্ধার সহিত পূর্ব পূর্ব আচার্যগণের পদপ্রান্তে জিজ্ঞাসু হয়ে বসলেই বুঝতে পারব।

জ্যোতির্ময় আত্মা-পক্ষী অনন্ত চিদাকাশে উড়বার প্রয়াস পাচ্ছে। জ্ঞান ও ভক্তি তার বিস্তারিত পক্ষদ্বয় এবং যোগ গতিনিয়ামক পুচ্ছ। তিনটি অঙ্গ সরল ও সমান ভাবে পরিবর্ধিত না হলে উড়বার চেষ্টা বৃথা। পক্ষদ্বয় না থাকলে গতি-শক্তিই সম্ভবে না। আবার সংযমপুচ্ছ না থাকলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শক্তি অন্যদিকে ব্যয়িত হয়, অভীষ্ট ফল প্রদান করে না; বেদমূর্তি তপোধন ব্যাস এই মহাসত্যের উপদেশ করেছেন। যে কোন যুগে, যে কোন দেশে, যে কোন ধর্মে যত ধর্মবীর, অবতার, আচার্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে ধরা ধন্য করেছেন, কামকাঞ্চন-স্বার্থপরতার উন্মত্ততা ও কোলাহলের মধ্যে যাঁদের অলৌকিক জীবন 'সূর্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং' ধর্মালোক বিস্তার করে হতাশ মানবের নয়ন মন স্তম্ভিত ও প্রবুদ্ধ করেছে, বসন্তাগমে বৃক্ষলতিকার ন্যায় যাদের আগমনে মৃত মনে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে মরুভূমির ধূসরতা হরিৎ-পুঞ্জে পরিণত করেছে—তাঁদের জীবনবেদ পাঠ করে জ্ঞান ও ভক্তির কি বিচিত্র সম্মিলন দেখতে পাওয়া যায়! জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব পরিণয় তাঁদের জীবনে যে কি মহান্ উদারতা প্রসব করেছিল, তা জগতের ধর্মেতিহাস-পর্যালোচনায় সম্যক্ বুঝতে পারা যায়। এই উদারতার বলেই শ্রীচৈতন্য যবন-হরিদাসকে শিষ্য করতে এবং আচণ্ডালে প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এই উদারতার বলেই ভগবান ঈশা সামারিটান্-কন্যার জলপান, বেশ্যা-মেরীর সেবা-গ্রহণ এবং য়াহুদী ও অন্য জাতিকে সমানভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব উপদেশ করেছিলেন, ইহার প্রভাবে ভগবান শাক্যসিংহ জ্ঞানের সুদৃঢ়স্তম্ভস্বরূপ হয়েও বিম্বিসারযজ্ঞে একটি ক্ষুদ্র নগণ্য ছাগশিশুর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করতে প্রসন্নচিত্তে উদ্যত হয়েছিলেন।

গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের অপূর্ব সম্মিলন, তেজ ও মাধুর্যের বিচিত্র সমাবেশ, ভারতের পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে বলেছিলেন, "মানুষ কেহই আমায় এককালে ছেড়ে অবস্থিত নয় ; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে আমার দিকে আসছে ; যেদিক দিয়েই যাক না কেন, আমি তাকে সেই দিক দিয়েই ধরি।"

হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমানভাবে বর্ধিত এমন লোক জগতে অতীব বিরল। একটি অপরটির ব্যয়ে বর্ধিত হচ্ছে, একটি বেড়ে অপরটিকে আওতায় ঘিরেছে—ইহাই সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমভাবে পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে সমভাবে কার্য করছে—হৃদয় একদিকে ভাবের সাগর হয়ে সমস্ত জগৎকে আপনার করে নিয়ে অত্যল্পমাত্র ভাবস্পন্দে নেচে উঠছে এবং মস্তিষ্ক অপরদিকে কূট জটিল প্রশ্নসমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করে ভেতরের সারবস্তু-গ্রহণে সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে—ইহাই আদর্শ এবং দেব ও গুরুর বিশেষ প্রসাদ ভিন্ন পাওয়া অসম্ভব। জ্ঞান ও ভক্তির আবহমানকাল ধরে যে বিবাদ, তার প্রধান কারণ ঠিক এইখানে পাওয়া যায়। গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা, হীনবুদ্ধি, একদেশী ভাব—এ সকলই হৃদয়-মস্তিষ্কের অযথা সংস্থাপনের ফল এবং ধৈর্য, বীর্য, শ্রদ্ধা, উদারতা, এমনকি জীবন্মুক্তিও ইহাদেরই যথাযথ সংস্থানের ফল। মুক্ত হওয়া আর কিছুই নয়—নীতি, চরিত্র প্রভৃতি তখন আর প্রয়াস করে রক্ষা করতে হয় না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালনাদির ন্যায় স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে আসে। তখনই মানুষের আপন মন গুরু হয়ে দাঁড়ায়, যাহা ভাল বলে গ্রহণ করে তাহা নিঃসংশয়ে ভাল হয় এবং যাহা মন্দ বলে, তাহা তেমনি নিশ্চিত মন্দ হয়। তখন "মা আর তার পা বে-তালে পড়তে দেন না।"

জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ কোথায়

তবে জ্ঞান-ভক্তির বিরোধ কোথায় ?—পথে ও কথায়। কথার বিবাদ মিটে গেলে বোধ হয় জগতের চার ভাগের তিন ভাগ ঝগড়া মিটে যায় ; এক শব্দে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লক্ষ্য করে, অথবা এক শব্দে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ভাব লক্ষ্য করে আমাদের মধ্যে যত বিবাদ উপস্থিত হয়। আমেরিকার সুবিখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত জন ফিস্ক বলেন, বিরুদ্ধ পক্ষের ভাব ও দৃষ্টি নিয়ে দেখবার শক্তিহীনতাই যত বিবাদ-বিসংবাদের কারণ। হারবার্ট স্পেন্সর আর একটু অগ্রসর হয়ে এই রোগের কারণ ও ঔষধ নির্দেশ করেছেন—"জয়ের আদর কমে আমাদের হৃদয়ে যত সত্যের আদর বাড়বে, আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ এত দৃঢ়তার সহিত কেন স্বমত পোষণ করে তার কারণ-অন্বেষণের চেষ্টাও আমাদের ভেতর তত বলবতী হবে এবং 'লক্ষ্য-বিষয়ে তারা এমন কিছু দেখেছে যা আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি না'—এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের তারা যতটুকু সত্য পেয়েছে, তার সহিত আমরা যতটুকু পেয়েছি, তার সংযোগের চেষ্টা হবে।" পরমহংসদেব এ বিষয়ে তাঁর সেই সুমিষ্ট গ্রাম্য ভাষায় বলতেন, "ওরে, কোনও জিনিসের 'ইতি' করিস্‌নি—ভগবান তো দূরের কথা। 'ইতি' করা, 'এটা এই—এছাড়া আর কিছু হতেই পারে না' মনে করা, হীনবুদ্ধির কাজ।"

অনন্ত ঈশ্বরে 'ইতি'—অসম্ভব

অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের খেলা—এই ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম-এর এক-একটি অংশও অনন্তত্বের পরিচয় দেয়। একগাছি তৃণ, একটি বালুকণা বা বিশেষ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ গ্রাহ্য একটি প্রাণিবীজের শরীরগঠন ও গুণ ইত্যাদির ইয়ত্তা কে করতে পারে? সেইজন্যই বেদ বলেছেন, "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" পূর্ণ তিনি, পূর্ণ তাঁর জগৎ; সেই পূর্ণানন্ত-স্বরূপ হতেই এই অসীম জগৎ প্রসূত, কিন্তু তাতে তাঁর হানি বা হ্রাস হয়নি। কারণ অনন্ত পদার্থ হতে অনন্ত পদার্থ নির্গত হোক না কেন—যে অনন্ত সেই অনন্তই থাকে।

বাস্তবিক মানব নিজেও অনন্ত এবং অনন্তের সহিতই চিরকাল খেলছে। করতলামলকবৎ' অনন্তকেই সে ধরছে, ছুঁইছে, দেখছে, শুনছে। কেবল তার ভেতর কি একটু কোথায় গোলমাল হয়েছে যার জন্য সে তাতে সান্ত বুদ্ধি করছে। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, জড়-চেতন, উচ্চ-নীচ, ক্ষুদ্র-মহান্—সকল স্থানে একবার সেই অনন্ত বুদ্ধি আন দেখি—ধরা স্বর্গ হবে; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু কোথায় লুকাবে: ধর্ম, ভক্তি, মুক্তি আর কাল্পনিক ধোঁয়া ধোঁয়া শব্দমাত্র থাকবে না; আর সর্বত্র সকলের মধ্যে দেখবে—সেই জীবন্ত বিশ্বরূপী বিরাট, সেই 'সর্বতঃ!' পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং', সেই ভীষণ হতেও ভীষণ এবং শোভন হতেও শোভন, নিবিড় আঁধার ও অনন্ত জ্যোতিহিল্লোলের বিচিত্র সমাবেশ, করালবদনা শবশিবা! এই দেবদুর্লভ পূর্ণদর্শনের প্রথম সোপানই হচ্ছে—'ইতি না করা'।

'আমি' ও 'তুমি'

'আমি' ও 'তুমি'—এ দুটি অতি সহজ কথা। জন্মাবধি মানুষ বোধ হয় এ দুইটি যতবার উচ্চারণ করে, ততবার আর কোনটির করে না। এ দুটি পৃথক ভাব জীবনে প্রথমেই শিক্ষা হয়; আবার এই দুই বস্তু এতই বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন যে এ দুটিতে গোল হবার আদৌ সম্ভাবনা নেই। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ বোধ হয় ঐ দুটি শব্দ হতে যত হয়েছে, এত আর কিছুতে হয়নি।

'তুমি' ও ভক্তি

ভক্ত বলেন—"ঠাকুর! আমি কিছু নই, তুমিই সব। রোগে-শোকে জর্জরীভূত, কাম-ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়, যশ-মানের কাঙ্গালী,! বায়ুর ন্যায় অস্থির-মতি—এ 'আমি'র আবার শক্তি আছে? এ 'আমি'র দ্বারা আবার সাধন হবে, ভজন হবে—তোমায় পাব? জলে শিলা ভাসা, বানরের সঙ্গীত, আকাশ-কুসুমও কোন কালে সত্য হতে পারে; কিন্তু এই নগণ্য 'আমার' শক্তি আছে এবং সেই শক্তিতে তোমায় ধরব—ইহা কখনও সম্ভব না। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, সর্বস্ব ধন; তোমার যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক। নাহং নাহং—তুঁহু তুঁহু তুঁহু তুঁহু।" ভক্ত দেখেন এক মহান্ 'তুমি'—যাঁর নিয়মে সূর্য-তারকা ফিরছে, অগ্নি জ্যোতি দিচ্ছে, মৃত্যু সমুদয় গ্রাস করছে। ভক্ত

দেখেন, সেই 'তুমি' আবার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, বাহুর শক্তি ; প্রেমই তাঁর স্বরূপ, তিনি পরম সুন্দর !! সে সৌন্দর্যের কাছে আর সকল সৌন্দর্য অন্ধকারে পরিণত, সে বীর্যের কাছে অন্য সকলের বীর্য পরাহত। এই মহান তুমি—নিকট হতেও নিকটে, আপনার হতেও আপনার। মোহিত স্তম্ভিত হয়ে ভক্ত এঁকেই ইষ্টদেব বলে বরণ করেন এবং 'তুমি'-নাম-মহামন্ত্রে মহোৎসাহে দীক্ষিত হন।

'আমি' ও জ্ঞানী

জ্ঞানী দেখেন, শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, মনও তদ্রূপ—ফিরছে, ঘুরছে, বাড়ছে, কমছে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবারির ন্যায় ভাবরাশি কখন উত্তাল তরঙ্গ তুলে গভীর গর্জনে ছুটছে, আবার কখনও বা অস্তমিত শক্তি—ফল্গুর ন্যায় ক্ষুদ্র ধারা—বালুকা ভেদ করতে না করতে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই বাল্য, যৌবন, বার্ধক্যের ভেতর—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির ভেতর—শরীর, মন, বুদ্ধির ভেতর—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের ভেতর—এক অনন্ত, অপরিবর্তনীয় নির্মল নিত্যস্রোত বইছে, যার আঘাত অন্তরে লাগায় অবিরত 'মহং' 'অহং' ধ্বনি উঠছে ; বুদ্ধি দোলায়মান চিত্তবৃত্তিকে বিশেষ বিশেষ রূপসম্পন্ন করে নিশ্চয়াকৃতি করছে, প্রাণচক্র পরিবর্তিত হয়ে ইন্দ্রিয়সকলকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত রেখেছে। জ্ঞানী এই অনিত্যের ভেতর সেই নিত্যের, অচেতনের ভেতর সেই সচেতনের, অশক্তিকের ভেতর সেই পরিপূর্ণশক্তিকের দর্শন পেয়ে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হলেন। আবার দেখলেন, সেই নিত্যের ছবি, স্ত্রী-পুরুষ, জীব-জন্তু, গ্রহ-নক্ষত্র, জড়-চেতন—সমুদয় জগতে বর্তমান। দেখলেন, এই ক্ষুদ্র 'আমি'-র যথার্থ স্বরূপ মহান ও নিত্য। মহোল্লাসে বলে উঠলেন, "আমাতেই এই জগৎ উঠছে, ভাসছে, লীন হচ্ছে। আমিই জ্ঞান ও শক্তির একমাত্র আকর ! আমিই নারায়ণ ! আমিই পুরান্তক মহেশ ! মৃত্যু ও শঙ্কা কি আমায় স্পর্শ করতে পারে ? জন্ম-জরা-বন্ধনই বা আমার কোথায় ?"—

"ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥"

ভক্ত ও জ্ঞানীর লক্ষ্য একই

তবে ভক্তের 'মহান্ তুমি' ও জ্ঞানীর 'মহান্ আমি'র মধ্যে আর প্রভেদ কোথায় ? —কেবলমাত্র বাক্যে। দুজনেই এক বস্তুকে লক্ষ্য করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রযোগ করেন মাত্র। উভয়েই বলেন, ইন্দ্রিয়সকল সংযত কর, নিত্য পদার্থে বিশ্বাস কর এবং এই 'ক্ষুদ্র আমি', 'কাঁচা আমি' ছেড়ে দাও—উহাই যত দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। কাঁচা 'আমি'কে ভক্তি বা বিবেক-বৈরাগ্যের জ্বলন্ত আগুনে পোড় খাইয়ে মহান্ আমি বা তুমির সহিত সম্বন্ধ পাতিয়ে 'পাকা' করে লও। আবার, জোর করে সম্বন্ধ পাতাতেও হবে না ; পরস্পর আকর্ষণ ও সখ্য উভয়ের নিত্যকাল বর্তমান দেখতে পাবে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ১
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা—দুটি পক্ষী

ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ এই সংসার-অশ্বত্থের দুই শাখায় দুটি পক্ষী বসে রয়েছে। দুটিই সুন্দর এবং চিরপ্রেমে পরস্পর আবদ্ধ। তাদের একটি সুখদুঃখময় ফলভোগে ব্যস্ত, 'আমি আমার'-জ্ঞানে নিরন্তর মোহিত ও ব্যথিত, অপরটি আপনার মহিমায় দীপ্তিমান, ভোগে আদৌ দৃষ্টি নেই। স সারের জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যখনই প্রথমটি ফলভোগের বাঞ্ছা ছেড়ে দেয়, অমনি অপরটির হিরণ্ময় রূপ এবং কোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহিমা তার নিকট প্রকাশিত হয়। আর তাকে সুখদুঃখ, পুণ্যপাপ স্পর্শ করতে পারে না। কামকাঞ্চনের আবরণে তার অঞ্জনবহিত চক্ষু আর কখনও আবৃত হয় না। অনিত্যের মধ্যে সেই একমাত্র নিত্যপদার্থের, বহুর মধ্যে সেই একের উপলব্ধি করে সে আপনাকে ও সকলকে সেই এক বলেই ধারণা করে এবং পরম সমতা ও শক্তি লাভ করে।

অজ্ঞানাবরণের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ

বাস্তবিক মনুষ্য কখনও ভগবান হতে দূরে অবস্থিত নয়। নীচ সঙ্গে, নীচ কর্মে সে যতই নীচগামী হোক না কেন, তাঁর দৃষ্টি সেই হিরন্ময় পুরুষের 'সূর্যকোটি-প্রতীকাশ' রূপ হতে কখনই একেবারে বঞ্চিত নয়। সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণায় অস্থির হলেই সে দেখতে পায়, রোগ-শোকে অভিভূত হলেই তাঁকে কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করে। নতুবা শিক্ষাবিহীন, হিংসাজীবন ঘোর স্বার্থপর বন্যের ভেতর কোথা হতে ধর্মভাব অঙ্কুরিত হয়? অন্ধতমসাবৃত তার জীবনে কোথা হতে শ্রদ্ধার আলোক উপস্থিত হয়ে ধীরে ধীরে স্বার্থপরতার রজনী অপহৃত করে? ধূমকেতু হতেও অনিয়তগতি তার চরিত্রে কোথা হতে সমাজবন্ধন, বিবাহবন্ধন, স্বজনস্নেহ, দেশহিতৈষিতা ইত্যাদি উপস্থিত হয়ে পরিশেষে জগতের মঙ্গলকামনায় তাকে নিযুক্ত করে? কেনই বা সে উদয়োন্মুখ সূর্যের, শৃঙ্গবিদারী বজ্রের, বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থের বা পরলোকগত আত্মার সম্মুখে অবনতজানু, অবনতমস্তক হয়? বলবে অজ্ঞতা, বলবে কুসংস্কার, বলবে কুহকিনী কল্পনার মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ভৌতিক জড়পদার্থ ও শক্তিতে চেতনে ইচ্ছাময়ী লীলার তরঙ্গভঙ্গ আরোপিত করে, বলবে ভয়ে বা ভালবাসায় অথবা অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্যে—যেখানে দৃষ্ট, অদৃষ্ট কত লোকের সহিত মেশামেশি আলোক ও আঁধারের বিচিত্র মিলনে অস্পষ্ট, ঈষদ্ব্যক্ত, অপরিস্ফুট ও অব্যক্ত ছায়াময়ী মূর্তিসকল ছায়ার জগতে ছায়ার নাম ধাম ও

সম্বন্ধ পাতিয়ে জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় অথচ প্রখর জ্ঞানসূর্যের কিরণবিস্তারে কোথায় সরে দাঁড়ায়—সেই স্বপ্নরাজ্যে প্রথম মানবের মনে শ্রদ্ধা ও ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়। সত্য, ধ্রুবসত্য হলেও একথা 'ধর্মের মূল কোথায়'—এ প্রশ্নের সম্যক্ তলস্পর্শ করতে পারে না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কি কখনও উন্নতির দ্বার খুলে দেয় ? কল্পনা কি কখনও যথার্থ সত্য প্রসব করে ? তবে এর নিঃসংশয় উত্তর কোথায় ? মানুষের ভেতর অদম্য অনন্ত শক্তি কুণ্ডলী-আকারে নিবদ্ধ। জন্ম-জরা-মৃত্যুও সে শক্তির নিকট পরাহত। অনন্ত বাধা-বিঘ্ন ভেদ করে দেশকালের সীমা অতিক্রম করে 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' রাজ্যে সে শক্তির প্রখর দৃষ্টি ছুটতে সমর্থ। তজ্জন্যই সে সেই নিত্য পদার্থের কিছু না কিছু রূপের ছায়া সকল বস্তুতে দেখতে পায়। তজ্জন্যই সে সেই অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলে ধারণা করে এবং যে-মুহূর্তে মানব সেই মহাশক্তির সঞ্চালনে, পূর্ণ সত্যের দর্শনে ঠিক ঠিক বাঞ্ছা করবে সেই মুহূর্তেই সে সংসারবৃক্ষের উচ্চ শাখায় অবস্থিত, হিরণ্ময়বপু, আদি কবির সত্য ও পরিপূর্ণ স্বরূপের অবাধ দর্শনলাভ করবে।

মূল বিষয়ে সকল শাস্ত্রই অভেদ

জগতের যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র ঐ কথাই একবাক্যে ঘোষণা করছে। হিন্দুর বেদ মুসলমানের কোরান, বৌদ্ধের ত্রিপিটক এবং খ্রীষ্টানের বাইবেলে এখানে মতভেদ নেই। কিন্তু কোন্ পথে অগ্রসর হলে এই চরমোন্নতি লাভ করা যায়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। স্বর্গ ও সৃষ্টির বর্ণনায় মুক্তি ও মানবাত্মার তৎকালীন অবস্থাবিষয়ে মতভেদ বিস্তর, কিন্তু মানব যে পূর্ণানন্দ স্বরূপ হতে কিছুকালের জন্য এই আপাত অপূর্ণ স্বরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে পুনরায় সেই পূর্ণানন্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ বিষয়ে সকলেই একবাক্য। ভক্তি বল, জ্ঞান বল, কর্ম বা নীতি বল, এ বিষয়ে সকলের এক কথা। জগতের যাবতীয় পুরাণসকলও রূপকের পল্লবিত ভাষায় মানবকে এই কথাই উপদেশ করছে। দেশীয় পুরাণসমূহের কথা তো ছেড়েই দি, বিদেশী য়াহুদি পুরাণ বাইবেলেও আগেই বলছে—প্রথম মানব নিষ্পাপ, পরিপূর্ণস্বরূপ হয়ে জন্মেছিল, ভগবানের আজ্ঞা-অবহেলায় সেই স্বরূপ হতে চ্যুত হয়, আবার তাঁর কৃপায় সেই স্বরূপ লাভ করবে। এখনও যাবতীয় য়াহুদি নরনারী রামধনুর বিচিত্র আবরণে এই আশাপ্রদ কৃপাবাক্য ভক্তিগদ্‌গদ হয়ে পাঠ করে। "নিষ্পাপ হও, ভগবদ্ভক্তি বা জ্ঞানলাভে নিরঞ্জনত্ব লাভ কর' —একথা ভক্তি বা জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই একবাক্যে বলছে। "কাঁচা 'আমি'কে পাকা করে লও, ইন্দ্রিয়-সংযম ও স্বার্থত্যাগ করে পরার্থ চেষ্টা কর, ভগবানে অচল অটল বিশ্বাস ও নির্ভর রাখ"—একথা ভক্তি ও বেদান্ত উভয়েই একতানে ঘোষণা করছে। তবে আর মূল বিষয়ে বিরোধ কোথায় ?

পথের বিবাদ মিটবে কিসে ?

বলবে, কথার বিবাদ মিটলেও মিটতে পারে, ভালবাসা ও সহানুভূতিতে পরকে আপনার করে নিয়ে তার চক্ষে, তার ভাবে তার ধর্ম ও ভাষার অনুশীলনে কথার

বিবাদ একদিন মেটা সম্ভব। কিন্তু পথের বিবাদ যে অতি বিষম। উহা মিটাবার উপায় কি? কেউ তো কারও পথ ছাড়বে না। আবার পথ ছাড়লেই বা তার ধর্মের উপায় কি? তার ধর্ম তো এককালেই মিথ্যাই প্রতিপন্ন হয়। আবার এক ধর্ম মিথ্যা হলে অপর ধর্ম সমূহ যে সত্য, তারই বা প্রমাণ কোথায়? পরিশেষে ধর্ম বৃদ্ধাস্ত্রী জল্পনা মাত্র এবং নাস্তিকতাই শ্রেয়, এই ধারণা অনিবার্য হবে।

না, পথের বিবাদ মিটবার ও উপায় আছে। ভারতের পূর্বতন ঋষি ও আচার্যপাদেরা এ বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করে গেছেন। ধর্মজগতে তাঁদের দৃষ্টি যে নানারূপের বিঘ্ন-বাধা ভেদ করে যথার্থ সত্যের পরিপূর্ণ স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হয়েছিল, এতেই তা প্রতীয়মান হয়। ইহাই তাঁদের প্রাতঃস্মরণীয় উজ্জ্বল গরিমা। ইহাই ধর্মবীর প্রসবিনী অবতারবহুল পুণ্যভূমি ভারতের জাতীয় গৌরবের একমাত্র অত্যুচ্চ ধ্বজা। স্বদেশপ্রাণতা, সমাজবন্ধন, রাজনীতি, ব্যবহারব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধান, গৃহরক্ষা, বাণিজ্য এবং যুদ্ধ-বিগ্রহাদি শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদিগকে অবনতমস্তকে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহকে গুরুস্থানীয় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আত্মা, পরলোকবাদ, ধর্মসমন্বয়, ধর্মপ্রাণতা, গুরু ও ইষ্টনিষ্ঠা—এবিষয়ে আমাদের ঋষি ও আচার্যগণ এখন এবং নিত্যকাল জগতের পূজ্য ও গুরুস্থানীয় থাকবেন, এখন এবং চিরকাল তাঁদের আশাপ্রদ অমৃতময়ী ঔপনিষদিক বাণী সর্বদেশের নরনারীর চক্ষুপ্রান্ত হতে কামকাঞ্চনের যবনিকা উত্তোলন করে অভয় আনন্দস্বরূপকে দেখিয়ে দেবে, এখন এবং নিত্যকাল তাঁদের সেই 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' গম্ভীর নিনাদ বিষয়ের কোলাহল স্তম্ভিত করে নরনারীর প্রাণমন মহাবেগে অনন্ত আনন্দের দ্বারে উত্তেলিত করবে 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'রূপ তাঁদের ঘোষণা বহু নাম ও বহু পথ যে সর্বকাল সেই এক নিত্য বস্তুর দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে, চিরকাল এই শিক্ষা নরনারীকে প্রদান করবে।

বিবাদ মিটাবার উপায়—স্বধর্ম ও ইষ্টনিষ্ঠা

একই গঙ্গা হিমাচলের নীহাররাশি ভেদ করে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে, তথা হতে শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্রে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সাগর-সঙ্গমে প্রবাহিত। শত শত লোক শত শত তীর্থে সেই জলে স্নান-পান সমাধা করছে। সকলে নিজ নিজ সন্নিকট তীর্থেই যাচ্ছে। এইরূপে বহুতীর্থ হলেও সকলে সেই একই 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি' স্পর্শে পবিত্র হচ্ছে। বহু-তীর্থ বলে তো বিবাদ হচ্ছে না। তবে ধর্মজগতে পথ নিয়েই বা এত বিবাদ কেন? পথসকল 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে'—সেই এক অখণ্ডসচ্চিদানন্দসাগরে মিশছে। এজন্যই ঋষিরা স্বধর্ম ও ইষ্টনিষ্ঠার উপদেশ করেছেন।

মানুষের প্রকৃতি ও মন ভিন্ন ভিন্ন। গাছের একটি পাতা যেমন অপরটির সহিত মেলে না, হাতের একটি অঙ্গুলীর যেমন অপরটির সহিত বিশেষদৃষ্টিতে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, সেইরূপ একটি মনের সহিত অপর একটি মনের সর্ববিষয়ে সমতা নেই। প্রত্যেকটির জন্মজন্মান্তরীণ কর্মজনিত সংস্কারোপযোগী বিভিন্ন গঠন ও আকার। কোন শরীর ও মনে পশুভাব, আবার কোনটিতে বা দেবভাব প্রবল। কোনটি বা ভ্রষ্ট

তারকার ন্যায় লক্ষ্যচ্যুত, কামকাঞ্চনের আকাশে ছুটোছুটি করছে, আবার কোনটি বা সমুদ্রগর্ভবিদারী পর্বতপুঞ্জের ন্যায় বিষয়ের উত্তাল তরঙ্গকুলের ঘন ঘন ঘাত অচল অটল ভাবে অকাতরে সহনে সমর্থ। এই অদ্ভুত বিচিত্রতাভূষণ ভিন্ন ভিন্ন মানবের কখনও কি এক ধর্ম উপযোগী হতে পারে? রুগ্ন ও সবলকায় সকল বালক-বালিকার জন্য মাতা কি কখনও একই খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন? শিশু ও যুবার জন্য কখনও কি সমপরিমাণ বস্ত্রাবরণ সম্ভব? অথচ ধর্মজগতে কি এতদিন ঠিক তদ্রূপ চেষ্টাই আসছে না? খ্রীষ্টান পাদরি বলছেন, আমার ঈশাহি ধর্ম তোমার মনের উপযোগী হোক আর নাই হোক, গ্রহণ না করলেই তোমার অনন্ত নরক। মুসলমান বলছেন, আল্লা নামের উপাসনা ও নিরাকার ঈশ্বরে দাসভাবে ভক্তি-ভজনা না করলে তোমার এ পৃথিবীতেই বেঁচে থাকবার প্রয়োজন নেই, দেহান্তে স্বর্গলাভ তো বহু দূরের কথা। জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত সকলেরই এই এক কথা। সকলেই বলছেন, আমার ধর্মে সকলকে দীক্ষিত হতে হবে। আমার ধর্ম আমার মনের উপযোগী, অতএব সকল মনের উপযোগী হতেই হবে। এই তুমুল কোলাহলের ভেতর দিয়ে আর্য-ঋষির গম্ভীর অন্তঃসারপূর্ণ বাণী আকাশপথে উত্থিত হয়ে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—"স্বধর্ম পরিত্যাগ করো না। আপন আপন প্রকৃতি উপযোগী ধর্মদোষযুক্ত হলেও ছেড়ো না, জগতে সকল গুণ দোষমিশ্রিত। 'মন মুখ এক করে' চেষ্টা করলে সকল মতেই আনন্দস্বরূপকে ধরা যায়। সকলেই সমভাবে সেই অমৃতের অধিকারী।" সসাগরা ধরা স্তম্ভিত হয়ে সে আনন্দধ্বনি শুনতে লাগল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই আবার সেই অসার পথ নিয়ে সকলে বিবাদে নিবিষ্ট হল।

ধর্মাধর্মের পরীক্ষা—নিঃস্বার্থতা

বাস্তবিক স্বধর্ম ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক ঠিক ধর্মলাভের ও ধর্ম-জগতে বিবাদমেটাবার একমাত্র সেতু। অখণ্ডস্বরূপের অনন্ত ভাব অনন্তকোটির মানবমনের উপযোগী হয়ে রয়েছে। মানব কটা ভাবই বা তাঁর গ্রহণ করতে পেরেছে? নাস্তিকত, অবিশ্বাস প্রভৃতি কেন মানবমনে শ্রেয় বলে বোধ হয়? জগতে যত প্রকার ধর্ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয়েছে, যত প্রকার ভাবে মানুষ ভগবানের উপাসনা করেছে, তার কোনটিও সম্পূর্ণভাবে প্রাণের পিপাসা মেটাতে না পারলেই লোকে নাস্তিক, সংশয়াত্মা হয়ে থাকে। আরও লক্ষ লক্ষ নূতন ধর্ম জগতে উপস্থিত হোক না কেন, মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না। আজ যারা সংশয় সন্দেহ নিয়ে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের শত শত লোক সেই সকল নূতন পথে তাদের মনের উপযোগী ধর্ম ও শান্তিলাভ করে কৃতার্থ হবে। তোমার প্রকৃতি-উপযোগী ধর্ম তুমি গ্রহণ কর, আমাকেও আমার প্রকৃতি-উপযোগী ধর্ম নিতে দাও। বলবে, তবে তো লম্পট চোরও বলতে পারে, 'আমাদের প্রকৃতি-উপযোগী ধর্ম আমাদের করতে দাও।' তা হলে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি থাকে কোথায়? তারও উপায় আছে। ধর্ম ও অধর্ম পরীক্ষা করবার একমাত্র কষ্টিপাথর আছে—তাহা নিঃস্বার্থতা।

যেখানে যত স্বার্থ, যত আপন শরীর-মন অপরের ব্যয়ে সুখে রাখবার চেষ্টা, সেখানে তত আঁধার, তত অধর্ম। আর যেখানে যত পরার্থ-চেষ্টা, আপন শরীর-মনের ব্যয়ে অপর কাউকে সুখী করবার উদ্যম, সেখানে তত আলোক ও ধর্ম। অতঃপর স্বার্থজীবন দুষ্কৃতকারীদের আর ওকথা বলবার পথ কোথায়? এই নিঃস্বার্থতাই যে সমস্ত নীতি-স্বার্থের ভিত্তি, একটু ভেবে দেখলেই সে কথা বুঝতে পারা যায়। এই নিঃস্বার্থতার ধীর বিকাশেই মানব উচ্ছৃঙ্খলতা হতে নিয়মবন্ধনে এবং তার পূর্ণতায় নিয়মাতীত পরমহংস-অবস্থায় উপনীত হচ্ছে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় ব্যক্তিসমষ্টি সমাজ ও সমাজ-সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডও এই নিয়মে উন্নতির পরাকাষ্ঠার দিকে ছুটেছে।

সমাজের আদর্শ

নিয়মের সম্পূর্ণ অভাব হতে নিয়ম এসে ব্যক্তি ও সমাজ-মন অধিকার করছে এবং নিয়মের পূর্ণত্ব আবার নিয়মাতীত অবস্থায় তাদের উত্তোলন করে শৈশবের বিবেকরহিত মূঢ়তাকে বার্ধক্যের বহুদর্শিতা এবং পরিশেষে যোগীর সংযমসহজাবস্থায় পরিণত করছে। সেইরূপ অনীতি, নীতি ও নীতির অতীতাবস্থা-রূপ সোপানপরম্পরায় ব্যক্তি ও সমাজমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। বলতে পার, যুগারম্ভ হতে পৃথিবীতে কিয়ৎ-সংখ্যক ব্যক্তি ভিন্ন এখনও এমন কোনও একটি সমাজ দেখা যায়নি, যাতে সমাজাঙ্গ সমস্ত ব্যক্তিই এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। উত্তরে বলা যেতে পারে—মস্তক, হস্ত-পদাদির সমষ্টিতে যেমন এক অপূর্ণ ব্যক্তি, সেইরূপ ব্যক্তিসমূহের সমষ্টি সমাজকেও এক সুমহান্ শরীর ও মন-বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি যে নিয়মে চালিত ও পুষ্ট হয়ে উন্নত হতে থাকে, অপরটিও ঠিক সেই নিয়মে পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। একটিকে যদি এই পরিপূর্ণ আদর্শ অবস্থায় উপনীত হতে দেখে থাক, অপরটিও কালে এই অবস্থায় এসে দাঁড়াবে, একথা কি এতই অসম্ভব বলে বোধ হয়? সমাজের এই আদর্শ অবস্থা সকল কালেই চিন্তাশীল মনীষিগণ কল্পনায় চিত্রিত করেছেন। একেই সত্যকাল, সুবর্ণযুগ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সর, লে কন্ট, ফিক্ক প্রমুখেরাও এটা বিজ্ঞানবিরোধী বা অযুক্তিকর বলে স্বীকার করেন।

জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য এবং ইষ্টনিষ্ঠা

জ্ঞান ও ভক্তির দুটি পথমাত্র। একটি 'সোঽহং, সোঽহং' এবং অপরটি 'নাহং, নাহং' করে মানবকে সত্যস্বরূপে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। লক্ষ্য বস্তু যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সাধকের নিকট উভয় পথ এবং পথের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত হয়ে থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই আর সাধকের নিকটে সে ভিন্নতা প্রতীত হয় না। তার বিশদ সাক্ষ্য বেদের 'তত্ত্বমসি', সুফীর 'আনলহক্' ও খ্রীষ্টের 'আমি ও আমার পিতা এক'। তার উজ্জ্বল প্রমাণ—ভক্তিপ্রাণা ব্রজগোপিকাদের ভক্তির উন্মত্ততায় শারদোৎফুল্লমল্লিকারজনীতে গহনকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভিনয়। তবে পথিক সাধকের

আপন পথে নিষ্ঠা রাখা আবশ্যক। বাতাত্মজ, বীরাগ্রণী শ্রীরামদূতের ন্যায় তাঁর প্রাণ যেন নিরন্তর বলে—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

অর্থাৎ জানি আমি, সেই এক পরমাত্মাই শ্রীনাথ ও জানকীনাথ উভয়রূপে প্রকাশিত, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব ধন। পরমহংসদেব তাঁর সেই মধুর ভাষায় বলতেন, "ইষ্টনিষ্ঠা যেন গাছের গোড়ায় বেড়া দেওয়ার মতো। ছোট গাছের গোড়ায় বেড়া না দিলে লোকে মাড়িয়ে ফেলে; ছাগল-গরুতে মুড়িয়ে খায়। সেইজন্য বেড়ার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু গাছ বড় হয়ে গুঁড়ি বাঁধলে আর বেড়ার দরকার নেই। তখন সে গাছের গুঁড়িতে হাতী বেঁধে রাখলেও আর তার কিছুই অপকার হয় না।"

বেদান্ত কি ভগবান লাভের একটি পথমাত্র?

তবে কি 'বেদান্ত' ভগবানলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথের একটি পথমাত্র? 'হাঁ' এবং 'না' উভয়ই বটে। জনসমাজে, এমন কি পণ্ডিতসমাজেও একটা ধারণা হয়েছে, বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ একই কথা। 'সোঽহং সোঽহং' করে সেই দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত সত্যলাভ করবার পথমাত্র বেদান্ত। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। 'বেদান্ত'-অর্থে যদি বেদের শেষ উপনিষদ্‌ভাগই বোঝা যায়, তা হলেও তো সেই ভাগে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত—এ তিন মতের উপযোগী বচনপরম্পরা দেখতে পাওয়া যায়। অধিকারিভেদে উপদেশ করে বিশেষ বিশেষ স্থানে বেদ তো এ তিন মতেরই প্রাধান্য স্থাপন করেছেন বোঝা যায়। আবার 'বেদান্ত'-অর্থে যদি বেদের সার কথা বুঝতে হয়, তা হলে অদ্বৈতজ্ঞানেরও পারে অবস্থিত বস্তুকে লক্ষ্য করে বেদ অদ্বৈতমতই কেবল প্রচার করেছেন, একথা বলায় বেদে অসম্পূর্ণতা-দোষ উপস্থিত হয়। তবে এর মীমাংসা কোথায়? মীমাংসা ঠিক এইখানে। বেদ বাক্যমনের অতীত বস্তুই উপদেশ করেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্যে মানুষের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত ক্রমশঃ এসে উপস্থিত হয় এবং সেই সোপানপরম্পরা অবলম্বন করে মানব কালে সেই পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপের উপলব্ধি করে। সোপানের প্রত্যেক অঙ্গটিই আবশ্যক। একটি না থাকলে অপরটিতে উঠা যায় না। সেইরূপ এ তিনটি মতই পরস্পরের সহায়—অবস্থাভেদে মানবের স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়। দেশকালের সীমার মধ্যে নাম-রূপের রাজত্বে প্রাপ্ত যত কিছু সত্যের ন্যায় এই মতত্রয়ও অবস্থাভেদে সমান সত্য বলে প্রতীত হয়। এ তিন মতই বেদান্তের অন্তর্ভূত। জগতের যাবতীয় ধর্ম কি প্রণালীতে মানুষকে ধীরে ধীরে নামরূপের পারে নিয়ে উন্নতির চরম সোপানে পরম সত্য দর্শন ও উপলব্ধি করাচ্ছে—সেই প্রণালীনির্দেশই বেদের সার কথা এবং তা-ই বেদান্ত। এজন্যই বেদ ও বেদান্ত-জ্ঞান কোন বিশেষ পথ বা বিশেষ মত নয়, কিন্তু সমস্ত মতের—সমস্ত ধর্মের সারভূত বস্তু। এইজন্যই বেদান্ত সার্বভৌম দর্শন

বলে সকলের শীর্ষস্থানীয় হয়েছে এবং ধর্মের প্রথম অঙ্কুর হতে শেষ পর্যন্ত উন্নতি-প্রণালী নির্দিষ্ট থাকায় বেদ 'পুরুষনিঃশ্বসিতম্'—ভগবানের সহিত নিত্যকাল বর্তমান ইত্যাদি হয়ে হিন্দুর চক্ষে নিত্যকাল মাননীয় হয়ে রয়েছে।

জ্ঞান ছাড়লে ধর্মলাভ হয় না

বেদান্তের আর একটি কথা—জ্ঞান ছাড়লে ধর্মলাভ হবে না। ভক্তিশাস্ত্রে অহেতুকী ভক্তিই প্রধান ও উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত থাকলেও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই যে তা লাভের উপায়, একথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। ভক্তির প্রধানাচার্য প্রমুখেরাও একথা বুঝিয়ে গিয়েছেন। চৈতন্যদেবও গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথনের সময় একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আজকাল অনেকেই জ্ঞানকে উপেক্ষা করে একেবারে অহেতুক ভক্তিলাভ করতে প্রয়াসী হন। বলা বাহুল্য যে, ইহা তাঁদের বাতুলের চেষ্টার ন্যায় কখনই অভীষ্ট ফল প্রদান করবে না।

উপসংহার—আচার্যদেবের উপদেশ

পরিশেষে সেই গঙ্গাবারিবিধৌত বিশাল উদ্যানে 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' 'শবশিবারূঢ়া' মূর্তির তন্ময় সেবক, সেই মাধবীহারগ্রথিত চিরপরিণীত অশ্বত্থবটের নিবিড় আলিঙ্গননিবদ্ধ পঞ্চবটীতলস্থ তপস্যাজাগ্রত সাধনকুটীরে ধ্যানশীল বাল-স্বভাব, সরলতা, মাধুর্য ও তেজের অপূর্ব সম্মিলন আচার্যদেব—যাঁর উপদেশের প্রতিপঙ্‌ক্তিতে বেদ, বেদান্ত, দর্শনের নিগূঢ় ও জটিল সত্যসকল জীবন্ত ও জ্বলন্ত হয়ে হৃদয়ের সংশয় ছিন্ন করে সুকুমারমতি বালকেরও মর্মস্থল স্পর্শ করত—তাঁরই দু'চারটি কথা স্মরণ করে আমরা আজ উপসংহার করি।

"ভক্ত হবি, কিন্তু তা হলে বোকা হবি কেন? বোকা হলেই কি ভগবানে বেশী ভক্তি হবে?"

"ভক্ত হোস্, কিন্তু গোঁড়া বা একঘেয়ে হোসনি। একঘেয়ে হওয়া অতি হীনবুদ্ধির কাজ।"

"যত মত তত পথ। আপনার মতে নিষ্ঠা রাখিস্, কিন্তু অপরের মতের দ্বেষ বা নিন্দা করিস্ না।"

সাধনা ও সিদ্ধি

আমরা একটু স্থিরচিত্তে আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, সমস্ত শাস্ত্রই এক কথা ও একই লক্ষ্য বলেছে। সব শাস্ত্রে একই কথা বটে, তবু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললে লোকের রুচিকর হয়। সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে সেই শাস্ত্রেরই দু'চারটি কথা আজ আমরা একটু অন্যভাবে আলোচনা করব। সাধারণতঃ লোকে বলে, "যেমন সাধন, তেমনি সিদ্ধি"। শাস্ত্রেও আছে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। যার যেমন ভাবনা, তার তেমনি সিদ্ধি হয়। সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে কার্যকারণগত নিত্য সম্বন্ধ সর্বদা বর্তমান। যিনি যে বিষয়ে চেষ্টা করবেন, তিনি তাতেই সিদ্ধ হবেন। আমাদের ধর্ম বক্তৃতা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জিনিস নয়—অনুভূতির জিনিস। অধিকারিভেদে ও মনের অবস্থানুসারে সাধনপ্রণালী অনেক হতে পারে এবং এইটিই ধর্মরাজ্যে নানা সম্প্রদায় হওয়ার কারণ।

আমাদের দেশে যত ধর্মসম্প্রদায় আছে, তাদের বিশ্লেষণ করে দেখলে চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা—জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত ও যোগী। যাঁরা সমস্ত বিষয় ও বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁরা জ্ঞানপথ অবলম্বন করেন। আর যাঁরা সংসারে বিষয় ও বৈষয়িক কর্মের মধ্যে থেকে নিজেদের অল্প শক্তি প্রত্যক্ষ করে সর্বশক্তিমান ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁরা ভক্ত। যাঁরা কর্ম করেন, তাঁরা কর্মী। আর এক দল লোক আছেন, যাঁরা একাগ্রতা সহায়ে মনের অন্তস্তল পর্যন্ত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে সমস্ত বাসনাবীজ দূর করে দিতে চেষ্টা করেন, তাঁরা যোগী।

আমাদের বাংলাদেশে ভক্তির চর্চাই অধিক। অন্যগুলি আমরা বুঝি না। আমরা নিজেদের অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে করে থাকি, এটি আমাদের মহাদোষ। নিজেকে যতই দুর্বল ও পাপী মনে করব, ততই আমরা দুর্বল হয়ে থাকব। অহঙ্কার যেমন লোকের পতনের কারণ হয়, সেরূপ "আমি দুর্বল, আমি পাপী"—এ বিশ্বাসও মানবকে ধীরে ধীরে উত্থানশক্তিরহিত করে উন্নতিপথের অন্তরায় হয়; অতএব দুটিই পরিত্যাজ্য, একথা পরমহংসদেব বলতেন। কোন সময়ে তাঁকে একখানা বাইবেল পড়ে শুনান হয়েছিল। তাতে প্রথম হতেই কেবল পাপবাদের কথা। কতকটা শুনে ওতে কেবল পাপের কথা দেখে আর শুনতে অস্বীকার করলেন; তিনি বলতেন, "যেমন সাপে কামড়ালে বার বার বিষ নেই, বিষ নেই বলে রোগীর বিশ্বাস জন্মাতে পারলে সত্যই বিষ থাকে না, সেই রকম আমি ভগবানের নাম নিইছি, আমার পাপ নেই, বার বার একথা আপনাকে বলতে বলতে সত্যই পাপ থাকে না।" আমি পাপী, আমি দুর্বল—এরূপ ভাব আমাদের ভেতর থেকে যত যাবে, ততই ভাল। সকল মানুষের মধ্যে সর্বশক্তিমান ভগবান বিদ্যমান। আমরা ভগবানের অংশ, ভগবানের ছেলে; আমরা আবার দুর্বল? সেই অনন্ত শক্তিমান ভগবান থেকে আমাদের শক্তি আসছে; আমরা

আবার পাপী ? অতএব সবাপেক্ষা অধিক পাপ হচ্ছে—নিজেকে পাপী ও দুর্বল মনে করা। এ অবিশ্বাসী নাস্তিকের কাজ। যদি কিছু বিশ্বাস করতে হয়, তবে এই বিশ্বাস কর যে, তোমরা তাঁর ছেলে, তাঁর অংশ, তাঁর অনন্ত শক্তি ও অপার আনন্দের অধিকারী। বিশ্বাস কর যে, তোমার শরীর ও মন হচ্ছে পবিত্র দেবমন্দির, যেখানে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ভগবান চিরপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস কর যে, প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে তিনি, বৃক্ষলতায় তিনি, জড়চেতনে তিনি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ভিন্ন আর কেউ নেই। আকাশের নীলিমায়, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে, নারীর মুখচ্ছায়ায়, বালকের সরলতায়, শ্মশানের করালতায় এবং যোগীর নিস্পন্দতায় তাঁরই প্রকাশ দেখতে চেষ্টা কর। এই চেষ্টাই যে একপ্রকার সাধন।

গীতার ১০ম অধ্যায়ে আমরা এই ভাবটি স্পষ্ট দেখতে পাই। অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়াদি কামকাঞ্চনমোহিত, তাদের আকর্ষণে মানুষ রূপ-রসাদির পশ্চাৎ গমন করছে, অথচ আমরণ মানবকে জগতের ব্যাপার নিয়েই থাকতে হবে ; অতএব তার বাঁচবার উপায় কি ? ভগবান উত্তর করেন—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

অর্থাৎ যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, তা আমারই তেজের অংশ। চন্দ্র, সূর্য, পশু, পক্ষী ও জগদ্‌বিমোহিনী স্ত্রীমূর্তিতে যা কিছু সৌন্দর্য দেখতে পাও, সমস্তই তাঁর তেজের অংশ। তাঁর জ্যোতি এই সকল মূর্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। মানুষ বাস্তবিক এদের প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ করতে পারে না বলেই বিষয়ে আকৃষ্ট হচ্ছে। ভগবান গীতায় আবার বলেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

অর্থাৎ হে অর্জুন, আমার বিভূতির বিষয় আর কত বলব, আমিই একাংশে এই ব্রহ্মাণ্ড হয়ে রয়েছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অমৃতময়ী বাণীই কি আমাদের বলছে না যে, আপনাকে এবং অপরকে পাপী বলে ধারণা করতে নেই ? এতেই কি আমাদের শেখাচ্ছে না যে, মানুষকে দেবতা বলে, ভগবানের সাক্ষাৎ মূর্তি বলে ধারণা কর ? নিজেরা এইটি শেখ এবং সন্তানসন্ততি ও প্রতিবেশী সকলকে শেখাও। আমরা মুখে বলছি এক, কাজে করছি আর এক। মন মুখ এক না করতে পারলে সমস্ত রাত্রি হরি হরিই কর অথবা সমিতিই কর, কিছুতেই কিছু হবে না। এই তো দেখছি, ঘরে ঘরে হরিসভার ধুম অথচ কিছুদিন পরে আর কেউ আসতে চায় না।

এর কারণ কি ? কারণ এই—আমাদের মন মুখ এক নেই। ধর্মের প্রথম সাধন হচ্ছে, মন মুখ এক করা। পরমহংসদেব বলতেন, “মন মুখ এক করাই প্রধান সাধন।” মন মুখ এক করেছে, এরূপ লোক কোথায় ? হাজারটা খুঁজলে কটা পাওয়া যায় ? প্রত্যেক কাজেই দেখছি মনে এক, মুখে আর। অতি সামান্য একটি কাজ করতে

পারিনি, বড় কাজ করতে দৌড়ুই। সম্মুখে পিপাসার্তকে একটু জল দিতে পারিনি, অথচ সমিতি করে সকলকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা অথবা সমস্ত অভাব দূর করে দেশোদ্ধার করতে যাই। মন ও মুখের বিপরীত গতির দৃষ্টান্ত দেখুন। চণ্ডীতে আছে —"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ। স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু॥" —হে দেবি, যত কিছু বিদ্যা আছে, তা তোমারই শক্তির প্রকাশমাত্র, আর জগতের যত স্ত্রীমূর্তি আছে, তোমারই মূর্তি।" আমরা সকলেই চণ্ডীপাঠ করছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কজন আছেন যিনি স্ত্রীলোককে দেবীর প্রতিমা বলে দেখছেন? কত লোক একদিকে চণ্ডীপাঠ করেন, আবার পাঠান্তে সামান্য কারণে স্ত্রীকে প্রহার পর্যন্ত করতে সঙ্কুচিত হন না। স্ত্রীলোককে দেবীর মূর্তি বলে সম্মান ও পূজা করার পরিবর্তে তাদের সন্তানপ্রসব ও রন্ধনাদি করবার যন্ত্রবিশেষমাত্র ধারণা করে রেখেছেন।

বৈদিক যুগে কত স্ত্রীলোক ঋষি ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখতে পাই, জনক রাজার সভায় গার্গী নাম্নী জনৈকা সন্ন্যাসিনী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ধর্মসম্বন্ধীয় কত গভীর প্রশ্ন করছেন। লীলা, খনা প্রভৃতি আরও কত বিদুষী স্ত্রীর কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

অল্পদিনের কথা, অহল্যাবাঈ-এর অদ্ভুত জীবন অনেকেই জানেন। তিনি নিজেই রাজ্যশাসন করতেন। প্রত্যেক বড় বড় তীর্থে তাঁর কীর্তি অদ্যাপি বর্তমান। এমন এক পাহাড়ের বিজন প্রদেশে পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য তাঁর নির্মিত রাস্তা অদ্যাপি তাঁর পরিচয় দিচ্ছে। যাদের মধ্যে জগজ্জননীর অপূর্ব শক্তি নিহিত, তাদের আমরা দাসীমাত্র করে রেখেছি! কেবল পূজাদির সময় দুই একবার বলে থাকি মাত্র যে, সমস্ত স্ত্রীলোকই মা ভগবতীর মূর্তি!

আরও দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে আছে এবং আমরা বলেও থাকি যে, সকল মানুষই নারায়ণের মূর্তি। কিন্তু কার্যতঃ কি করি? একজন মেথর বা নীচজাতীয় ব্যক্তিকে দেখলে অমনি তাকে ছাগল-গরু অপেক্ষাও বেশী ঘৃণা করতে সঙ্কুচিত হই না। মানুষের চেয়ে গরুর সম্মান যারা অধিক করে থাকে, তাদের বুদ্ধি-ধারণা আর কত দূর অগ্রসর হবে? শাস্ত্রে বিশ্বাস করলে, আমাদের কর্তব্য—নিজেকে কখনও দুর্বল মনে না করা এবং অপরকে নারায়ণজ্ঞানে পূজা করা। আমাদের ভাবা উচিত যে, আমরা তাঁর অংশ, তাঁর ছেলে, আমাদের এই শরীর এবং সমস্ত শরীরই তাঁর মন্দির। যেমন হিমালয় থেকে গঙ্গার সমস্ত জলরাশি আসছে, তেমনি সর্বশক্তিমান ভগবান থেকে আমাদের সমস্ত শক্তি আসছে। এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে ক্রমে উঠতে পারব। জগতে যেখানেই জ্ঞানের চর্চা হয়েছে, সেখানেই লোকে বুঝেছে যে, মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। অনেক সময় সৎকার্যের উদ্যম করতে বা পরোপকারের কোনরূপ চেষ্টা করতে বললে উত্তর পাওয়া যায়—আমাদের টাকা কোথায়? টাকা না থাকলে কি কোন কাজ হয়? আরে নির্বোধ! বল যে, আমাদের মনুষ্যত্ব নেই, মানুষ হলে টাকা যে তার পায়ের কাছে আপনি এসে পড়বে। টাকায় কখনও মানুষ করে না, কিন্তু মানুষই টাকা উপার্জন করে। আজ থেকে সমস্ত দুর্বলতা ফেলে দিয়ে মানুষ হতে চেষ্টা কর।

নিজেকে দুর্বল ভাবলে অন্তর্নিহিত ভগবৎশক্তি বিকাশ না হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে বিশ্বাস কর যে, তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সুকর্ম ও সুচিন্তা দ্বারা সেই শক্তির বিকাশ কর।

অতএব আমাদের প্রথম সাধন—নিজেকে দুর্বল না ভাবা এবং সর্বপ্রকার দুর্বলতার হাত থেকে আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। দ্বিতীয় সাধন—মন মুখ এক করা। গীতায়ও বিশেষ বিশেষ অধিকারীর জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনার উপদেশ করবার পূর্বে সর্বাবস্থায় সকলেরই প্রয়োজনীয় এই দুই সাধনার উপদেশ দেখতে পাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ সৈন্যদলে আত্মীয়-স্বজন ও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে অর্জুনের মনে যুগপৎ শোক, দুঃখ, মোহ ও ভয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ভয়, মোহ প্রভৃতি ভাব লুকিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে, সামান্য রাজ্যের জন্য আত্মীয়-স্বজনদিগকে হিংসা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবনধারণও শ্রেয়ঃ। পূর্বে ক্ষত্রীয়ধর্মানুসারে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তব্যবোধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন ; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন ও মহাবীরগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে মোহ ও ভয়বশতঃ সেই কর্তব্য ভুলে গিয়ে মুখে ধর্মভানে নানাপ্রকার অসম্বন্ধ বাক্য বলছেন। কিন্তু কার কাছে মনের ভাব লুকাবেন ? ভগবান অন্তর্যামী। তিনি বললেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

অর্থাৎ হে অর্জুন, তোমার মত লোকের তো এরূপ দুর্বলতা সাজে না। তুমি হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে ওঠ। দুর্বলতা হতে যত নীচতা আসে ; ইহাই পাপের খনি। কেবল অর্থকরী বিদ্যা দ্বারা কি হবে ? যাতে আবালবৃদ্ধবনিতার শরীর ও মন সবল হয়, তার যত্ন করাই প্রকৃত শিক্ষা।

পূর্বেই বলেছি যে, ধর্মলাভ করবার চারটি পন্থা। বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে এই চারটি মানবকে এক স্থানেই নিয়ে যায়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি পড়লে ইহাই দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য এক, কিন্তু উহা লাভ করবার নানা পথ এবং যত পথ, তত মত। আমাদের প্রতিদিন-পাঠ্য মহিম্নঃস্তবে এই ভাব শ্লোকে নিবদ্ধ আছে—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

অর্থাৎ হে ভগবান। বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতগুলি বিভিন্ন হলেও তোমাতে যাবার এক একটি পথমাত্র। লোকের রুচি-অনুসারে সরল ও জটিল যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, তুমিই সকলের গম্যস্থান। পরমহংসদেব বলতেন, "যেমন কালীঘাট যাওয়ার বহু পথ, সেইরূপ নানা মত ভগবানে যাওয়ার এক একটি পথমাত্র।"

ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারাপন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত ও সাধনপ্রণালী শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন মত আপাতবিরোধী হলেও বাস্তবিক তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ গম্যস্থান বা লক্ষ্য একই।

সাধনা-শব্দের অর্থ ভগবৎপাদপদ্ম-দর্শনে পূর্ণমনস্কাম মহাপুরুষগণের যে প্রকার অবস্থা বা অনুভূতি হয়, তাই আপনাতে আনবার বা তাঁদের মত হবার জন্য চেষ্টা করা। সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ ভগবান গীতায় বলেছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

অর্থাৎ মনোগত সমস্ত কামনা ত্যাগ করে যিনি আত্মা বা ভগবানমাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, সুখ-দুঃখ বা শরীরমনের নানাপ্রকার নিত্য পরিবর্তন যাঁকে বিচলিত করতে পারে না, তিনিই স্থিরবুদ্ধি ও মুক্ত। যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ তাঁদের কামকাঞ্চন-ত্যাগ স্বতঃই হয়ে থাকে। তাঁদের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি এমন ভাবে গঠিত হয়ে গেছে যে, তাঁহাদিগকে আর বিপথে চলতে দেয় না। সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ বা সিদ্ধিসম্বন্ধে আমাদের অধিক বলবার দরকার নেই, কারণ এখনও আমরা সিদ্ধিলাভের অনেক দূরে রয়েছি। আমাদের প্রয়োজন এখন, যত প্রকার সাধনা দ্বারা বা উপায়ে ভগবান লাভ করা যায়, তা জানা এবং তার মধ্যে বিশেষ একটি নিয়ে নিজ জীবন গঠন করা।

পূর্বে শাস্ত্রীয় সত্য যাতে সাধারণে না পড়তে পায়, এই ভাবে লুকিয়ে রাখা হতো। এতে পুরোহিতের আধিপত্য অটুট রইল, কিন্তু জাতীয় জীবন বিদ্যাহীন হয়ে অনেক নীচে পড়ে গেল। পুরোহিত তাঁর ঈদৃশ কার্যের কারণ দেখালেন যে, অধিকারী হবার পূর্বে মানুষকে সকল সত্য বললে অনেক সময় না বুঝে উল্টো উৎপত্তি হয়ে থাকে, যেমন বেদান্ত ঠিক না বুঝলে অনেক সময় নাস্তিক্য এসে মানুষকে অধিক বিষপরায়ণ করে থাকে। এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে, তোমার যখন অধিকারী চেনবার শক্তি নেই, তখন সকলকেই পড়বার ও আলোচনা করবার ক্ষমতা দাও। সে নিজেই তার উপযোগী পথ বেছে নেবে। আজকাল সমস্ত শাস্ত্র মুদ্রিত হচ্ছে, এ সময় লুকোবার চেষ্টাই বৃথা।

আমরা এখন দেখবো জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী ও কর্মী—এই চার প্রকার সাধকেরা কোন্ কোন্ প্রধান সাধনসহায়ে চরমে একই স্থানে উপস্থিত হন। জ্ঞানী সদসদ্বিচার করে অনিত্য বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্বক আপনার ভেতর নিত্য বস্তু কোন্‌টি, তার অন্বেষণে নিযুক্ত থাকেন এবং সেই বস্তুকেই প্রকৃত 'আমি' বলে নির্দেশ করেন। শরীর-মনে আবদ্ধ, বিষয়বাসনাযুক্ত ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ করে এই মহান্ আমি হয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য। জ্ঞানীর সাধনা 'নেতি নেতি'-বিচার এবং স্ব-স্বরূপের ধ্যান। জ্ঞানী বলেন, বিচারে অনিত্য বলে যা কিছু সিদ্ধান্ত হবে, তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর। এইরূপে দেখবে, শরীর মন প্রভৃতি কোনটিই নিত্য নয়, এই সকলের চিন্তাবাসনা দূর করে

দিতে পারলে নিত্যবস্তু আত্মার সাক্ষাৎকার এবং তাঁতে অবস্থান। আবার একবার তাঁতে অবস্থান করতে পারলেই দেখবে, সূর্যের সহিত সূর্যরশ্মির ন্যায় লীলা নিত্যের সহিত চিরসম্বন্ধে গ্রথিত। সেইজন্যই জ্ঞানী বলেন, জগতে যা কিছু দেখতে পাই, সমস্তই আত্মার বিকাশ, আত্মা-মাত্র এবং 'আমি' সেই আত্মা। এইটি সর্বদা মনে জাগরুক রাখাই জ্ঞানীর প্রধান সাধন।

যোগী বলেন যে, মনুষ্য জন্মে জন্মে বিষয়ের সহিত আপনাকে একীভূত করে কতকগুলি সংস্কারের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং সেজন্য কতই না কষ্ট পেয়ে থাকে। কিছুতেই আর আপনাকে তাদের হাত থেকে ছাড়াতে পারে না। যোগী ছাড়াবার উপায়-সম্বন্ধে বলেন—স্থির হয়ে বস, আপনাকে ভুলে কোন চিন্তার পশ্চাৎ যেও না, মনকে চিন্তা করতে দাও এবং তুমি সাক্ষিস্বরূপ হয়ে স্থিরভাবে মনের তরঙ্গভঙ্গ দেখতে থাক। পরে মনকে কোন এক বস্তুবিশেষে নিবদ্ধ করে তাতেই একাগ্র কর। এই একাগ্রতাই সংস্কারবীজ দগ্ধ করে সত্য প্রকাশ করে দেবে। যথার্থ একাগ্রতা আসলেই তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন। অতএব দেখা গেল, যোগীর প্রধান সাধন—সবাবস্থায় আপনাকে সাক্ষিস্বরূপ ধারণা করা এবং মনকে কোন এক বিষয়ে সম্পূর্ণ একাগ্র করা।

ভক্ত বলেন, ভগবানে আপনাকে সম্পূর্ণ ফেলে দাও, তাঁর সঙ্গে কোনও এক বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন কর। পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, স্বামী প্রভৃতি যে-কোন সম্বন্ধ তোমার ভাল লাগে, সেই সম্বন্ধ স্থাপন কর। শরীর, মন, স্ত্রী, পুত্র যা-কিছু তোমার আছে, সমস্ত তাকে অর্পণ কর। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যাঁকে দেখতে পাই না, তাঁর সঙ্গে কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন করব? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যাঁর কাছে গেলে তুমি প্রাণে শান্তি পাও, তাঁকেই মানুষবোধ না করে ভগবানবোধে পূজা কর। তা হলেই ভগবানের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থাপিত হবে।

পরমহংসদেবকে একদিন জনৈক স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করেন যে, মন কিছুতেই স্থির হয় না, কেবল ভ্রাতুষ্পুত্রের চিন্তা মনে আসে। তিনি উত্তরেব লেন, "তাকেই ভগবানবোধে চিন্তা ও সেবা কর।" কিছুদিন এইরূপ করাতে স্ত্রীলোকটির মন সমাধিস্থ হয়। তাঁর সঙ্গে যতদিন না কোন বিশেষ সম্বন্ধ হবে, ততদিন তাঁকে আপনার বলে বোধ হবে না এবং ভালবাসা জমবে না। রামপ্রসাদ বলেছেন—

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে
কি ধরতে পারে।
হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন,
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥

তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে, একেবারে তাঁর হয়ে গেলে স্বার্থপূর্ণ আমিত্ব বিনষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন আসবে।

কর্মী বলেন, ভগবানের জন্য কর্ম কর, ফল তাঁতেই অর্পণ কর। স্বার্থের জন্য কর্ম করো না, স্বার্থই মৃত্যু। সর্বদা কর্ম কর, কিন্তু কর্মফলে আসক্ত হয়ো না। পূজা ও

সাধনাস্বরূপ কর্ম কর। ধন, মান, যশের জন্য করো না। সেই বিরাট পুরুষের সেবার জন্য কর্ম কর। তিনিই নানারূপে জগতে খেলা করছেন। তোমাদ্বারা তাঁর একটু সেবা হলে আপনাকে ধন্য মনে কর। এই প্রকারে কর্ম করলে যে ক্রমে স্বার্থনাশ ও আত্ম-প্রকাশ উপস্থিত হবে, একথা আর বলতে হবে না।

চার শ্রেণীর লোকের জন্য চার রকম সাধনা নির্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু উদ্দেশ্য একই—স্বার্থপর আমিত্বের বিনাশ করা। ভেবে দেখলে এদের মধ্যে বিবাদ কেবল কথার মাত্র। বাস্তবিক কোন বিবাদ নেই, স্বার্থপর আমিত্ব গেলেই মুক্তি। পরমহংসদেব বলতেন, "মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে;" "পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।" যখন অবিদ্যার 'আমি' যাবে, তখনই শিবত্বপ্রাপ্তি ও মুক্তি। পরমহংসদেব বলতেন, "যেমন জলকে নানা লোকে নানা নামে বলে, সেই রকম এক ভগবানকেই নানা নামে লোকে ডাকে।"

এইগুলিই প্রধান প্রধান সাধনার কথা। জীবনগঠনে এবং লক্ষ্যে পৌছবার জন্য এদের বিশেষ প্রয়োজন। মন-মুখ এক করে যার যেটি ইচ্ছা গ্রহণ কর এবং আজ থেকে নিজ জীবনগঠনে কৃতসঙ্কল্প হও। আর যা কিছু দরকার তিনিই সব এনে দেবেন।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—মন-মুখ এক করে তাঁর শরণাপন্ন হলে দুর্বলতা পাপ কিছুই থাকতে পারে না। তিনি সব থেকে রক্ষা করেন। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, তাঁর নামের জোরে আমাদের সকল দুর্বলতা ও পাপ চিরকালের মত দূর হয়েছে, এই বিশ্বাসটি যেন আজ থেকে আমাদের সকলের হয়।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

[কোন্নগর হরিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ

বেদ-কথা

এই সভাতে বেদাদি-সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হবে, তা কথাবার্তাচ্ছলে বলব, বক্তৃতার ভাষায় বললে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে দূরত্ব-অনুভব হবে। আমরা ভাবব, আমরা সকলে একসঙ্গে ধর্মশিক্ষা করতে এখানে একত্র হয়েছি এবং পরস্পরের সন্দেহ-সকল প্রশ্নদ্বারা বিচারপূর্বক মীমাংসা করে সত্যলাভ করব। মহাপুরুষের ধর্মজীবন আলোচনা করে দেখলে বেদোক্ত ধর্মাদির সহজে উপলব্ধি হয়, সেইজন্য উহাও আমাদের আলোচ্য হবে। আবার অন্যান্য মহাপুরুষদিগের অস্তিত্ব অথবা পুরাণনিবদ্ধ চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ঐরূপ হতে পারে না; কারণ আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছি। অতএব তাঁর চরিত্রে বেদান্তোক্ত ধর্ম কিরূপে কিভাবে প্রকাশিত

ছিল, তাও সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করব। প্রথমে বৃহদারণ্যক উপনিষদ হতে কিছু পাঠ করি—

এক সময়ে মিথিলার রাজা জনকবিদেহ এক যজ্ঞ করেছিলেন ; এই মিথিলা-রাজ-বংশের কোন রাজা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাতে, তাঁদের বংশের উপাধি 'বিদেহ' হয়েছিল। এই যজ্ঞে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। রাজা জনক এক সহস্র গাভী দক্ষিণা দেবেন মনস্থ করে তাদের শৃঙ্গ স্বর্ণদ্বারা মুড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আপনাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই গাভী গ্রহণ করুন।" কেহই অগ্রসর হলেন না। কাকেও অগ্রসর হতে না দেখে অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বীয় শিষ্যদিগকে বললেন, "তোমরা এই গাভীসকল আমার নিমিত্ত গ্রহণ কর।" একথা শুনে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বললেন, "ইনি আমাদের অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ, তা বিচার করা যাক ; আমাদের অপেক্ষা যদি ইনি কিছ অধিক জানেন, তা হলে এঁকে গাভী দেওয়া যাবে।" এইরূপ স্থির হলে গার্গীনাম্নী একটি স্ত্রীলোক সভায় দণ্ডায়মানা হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। নানা বিষয়ের যথাযথ উত্তর করে যাজ্ঞবল্ক্য তাকে নিরস্ত হতে বললেন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার আরম্ভ করলেন। অবশেষে গার্গী আবার বললেন, "আমি আর দুটি প্রশ্ন করতে চাই। যদি যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তর দিতে পারেন,তাহলে বুঝব এঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারবেন না। প্রথম, কার দ্বারা এই সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং দ্বিতীয়, তিনি কে ?" যাজ্ঞবল্ক্য ঐ দুই প্রশ্নের উত্তর করলে গার্গী বললেন, "হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এঁকে পরাস্ত করতে পারবেন না ; কারণ ইনি ব্রহ্মকে জেনেছেন এবং এঁর জানবার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

দেখা গেল, বেদোক্ত ব্রহ্মকে জানলে লোকে সর্বজ্ঞ হয়। এখন দেখা যাক, বেদ কাকে বলে। বেদ অর্থে জ্ঞান , যে জ্ঞান লাভ হলে জগতের সমস্ত বিষয় জানতে পারা যায় , যেমন মৃত্তিকা কি, জানলে মৃত্তিকার বিকারপ্রসূত সরা, খুরি ইত্যাদি সমস্ত পদার্থকেই জানতে পারা যায়, সেইরূপ যে বস্তুকে জানতে পারলে সৃষ্টির অন্তর্গত সমস্ত পদার্থকে জানতে পারা যায়, আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না, সেই জ্ঞানই বেদ। এই জ্ঞানলাভের অধিকারী কে ? বেদের অধিকারী কে ? শাস্ত্রে কেবল দ্বিজমাত্রকেই অধিকারী বলে নির্দেশ করেছেন। গীতা ও মহাভারতাদি শাস্ত্রে এই দ্বিজত্ব গুণগত এবং জাতিগত উভয় প্রকারেই প্রকাশিত হয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য প্রভৃতি এইরূপই নির্দেশ করেছেন , কারণ পিতার গুণ সহজে পুত্রে সংক্রমিত হয়, এইজন্য গুণ ক্রমে জাতিগত হয়ে পড়ে, কিন্তু বহু প্রাচীনকালে দ্বিজত্ব কেবল গুণগত ছিল বলে বোধ হয়। সত্যকাম জাবালির উপাখ্যান উহার প্রমাণ। সত্যকাম বেদপাঠের নিমিত্ত উপস্থিত হলে তাঁর গুরু তাঁর পিতার নাম জিজ্ঞাসা করেন, সত্যকাম পিতার নাম বলতে পারলেন না। তিনি মাতার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করাতে মাতা বললেন তিনি যৌবনে একে একে অনেককে পতিরূপে বরণ করেছিলেন ; অতএব সত্যকাম কার ঔরসজাত, তা তিনি জানেন না। সত্যকাম গুরুকে এসে তাই বললেন। গুরু বললেন, "ঘৃণিত ও নিন্দিত হবার সম্ভাবনা দেখেও আপনার ঐরূপ জন্মবৃত্তান্ত যে

জিজ্ঞাসিত হয়ে সর্বসমক্ষে এরূপ অকপটে বলতে পারে, সে মহা সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ, অতএব তোমাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখছি, তোমাকে আমি বেদপাঠ করাব।" এই কথা বলে তাঁকে উপবীত প্রদান করে বেদাভ্যাস করালেন। এই সত্যকামই পরে একজন প্রবীন আচার্য হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিগত হয়ে পড়েছে। গুণ থাক আর নাই থাক, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হবে, কিন্তু বৈদিক সময়ে গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বের নির্দেশ হত। এই শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা আমরা বেদের অধিকারী বলে ব্রাহ্মণত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থির করব। যাঁতে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, তিনিই বেদপাঠের অধিকারী। আবার বেদমধ্যে দেখা যে, সকলকেই বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ দিতে ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রমতে এই বেদ অনাদি, ইহা জ্ঞানরূপে ব্রহ্মের সহিত অনাদিকাল স্থিত। যখন এই বেদোক্ত, বিশেষতঃ উপনিষদুক্ত জ্ঞান কারও অন্তরে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইহার আবিষ্কারক ঋষিমাত্র বলে বর্ণিত হন। সকল বেদ-মন্ত্রের ঋষি ও দেবতা আছেন। যে বিষয়ের জ্ঞান আবির্ভূত হয় তাকে দেবতা বলা হয় এবং যাঁকে আশ্রয় করে ঐ জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাঁকে ঋষি বলে।

বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। দর্শনকার জৈমিনি কর্মকাণ্ড-মীমাংসায় বলেছেন,—'অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ এর পর ধর্ম-জিজ্ঞাসা করতে হবে। কার পর? নিয়মপূর্বক বেদাধ্যয়নাদি করে তারপর ধর্ম-জিজ্ঞাসা করবে। ইহাতেও পরোপকার, সত্যবাদিতা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু ইহাতে সত্যের জন্য সত্যকথন না হয়ে স্বর্গাদি বা অন্য কোন বাসনায় ঐ সকল কৃত হয়ে থাকে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের সকল কার্যই সকাম। অতএব বৈদিক কর্মকাণ্ড ও জৈমিনি-প্রণীত পূর্বমীমাংসা-পাঠকালে বর্তমান শিক্ষানুযায়ী হয়ে কর্ম-কথাটি, যাহা কিছু করা যায় তাই কর্ম (anything done)—এইরূপ বুঝলে ভুল হবে। বেদের দ্বিতীয় বিভাগ—জ্ঞানকাণ্ড। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা স্থির করেছেন যে, আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞানের বাইরে এক অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, জ্ঞাতের বাইরে এক অজ্ঞাত দেশকালাপরিচ্ছিন্ন পদার্থ আছে, কিন্তু ইহা আমাদের বুঝবার বা জানবার জো নেই। বেদান্তও বলেন, এই জ্ঞান আমাদের বাক্য-মনের অগোচর, কিন্তু ইহা অপরিজ্ঞেয় হলেও আমরা ইহা লাভ করতে পারি, ইহার সহিত একীভূত হতে পারি। ব্যাসসূত্র বা উত্তরমীমাংসায় জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের শ্লোকসকলের তাৎপর্য সূত্রাকারে গ্রথিত হয়েছে এবং উপনিষদের মধ্যে যে বিরুদ্ধ ভাব নেই ও সমগ্র উপনিষদ্ যে একই ভাব প্রকাশ করছে, ইহাই মীমাংসা করেছেন। জৈমিনি-দর্শনের ন্যায় উহাও 'অথাতো' বলে আরম্ভ করেছেন। উহাতে প্রযুক্ত এই 'অথ'-শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এক—মঙ্গল-বাচক শব্দ বলে কিংবা অনন্তর অর্থে। কার অন্তর? কর্মকাণ্ডের অনন্তর হতে পারে না, কারণ কর্ম হতে কখনও জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না, কর্ম কর্মেরই উৎপাদক। অতএব আচার্য শঙ্কর ইহার অর্থ—সাধন-চতুষ্টয়ের অনন্তর বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই সাধন-চতুষ্টয় কি? প্রথম—নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, জ্ঞান-বিচারদ্বারা কি নিত্য, কি অনিত্য স্থির করতে হবে। অনেকে জ্ঞানকে অতি হেয় বলে গণ্য করে থাকেন।

সত্য বটে, জ্ঞান-বিচার সেই নিত্য বস্তুকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাতে পারে না, তা বলে ইহার যে কোন কার্যকারিতা নেই, তা বলা মহাভ্রম। এই জ্ঞান-বিচার দ্বারাই তো পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা জেনেছেন এক অজ্ঞেয় দেশকালাপরিচ্ছিন্ন বস্তু (Unknown) আছেন। তিনি নিশ্চিত আছেন—একথাও তো তাঁরা ইহার সাহায্যে জানতে পেরেছেন। তিনি আছেন বলে যে নিশ্চয় বিশ্বাস করেছে, তার তাঁকে প্রাপ্ত হতে আর অধিক বিলম্ব নেই। দ্বিতীয়—ইহা মূত্রফলভোগবিরাগ, অর্থ—ইহলোকের সুখ, কি পরলোকে প্রাপ্য স্বর্গাদি-সুখ উভয়েতেই বৈরাগ্যবান হওয়া আবশ্যক। তৃতীয়—শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি : শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয় পদার্থ। (১) শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন মনে কতরূপ কামনার উদয় হচ্ছে, কতরূপ চাঞ্চল্য আসছে, এই সমস্ত দমন করা। সর্বাগ্রে ব্রহ্মচর্যই প্রধান সাধন, যার উহা নেই, তার সমস্তশক্তির ব্যয় হয়ে যায়। মন অনন্তশক্তির আধার, সংযমের দ্বারা এই শক্তি ক্রমে বিকাশিত হতে থাকে। আমাদের ভিতর অনন্তশক্তি রয়েছে, এই শক্তি বিকশিত করলে আমরা প্রায় সর্বশক্তিমান হতে পারি। অবতারাদি পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষেরা ইহাই দেখিয়ে গিয়েছেন যে, আমরাও ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে তাঁহাদের ন্যায় শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারি। যদি তাই না হয়, তবে অবতারের আসবার প্রয়োজন কি ? অবতারাদি মহাপুরুষেরা আমাদের কি করতে হবে এবং কিরূপে করতে হবে ইহাই নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে যান। তাঁরা আমাদিগকে এক নূতন আদর্শ দেখিয়ে যান, যাতে আমরা সকলে সেই আদর্শের অনুরূপ হতে পারি। অনেকে মনে করেন বিবাহাদি হলে, গৃহস্থ হলে ইন্দ্রিয়সংযম করা অসম্ভব। ইহা অত্যন্ত ভুল। ইচ্ছা থাকলে গৃহস্থও ইন্দ্রিয়সংযম করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মন-মুখ এক করলে সব হয়। মন-মুখ এক কর দেখি, ইন্দ্রিয়সংযমাদি সকল বিষয় তোমার নিশ্চয়ই করায়ত্ত হবে। আমার একজন পাশ্চাত্য বন্ধু আছেন, তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি পূর্বে কোনরূপ নূতন কলকারখানার উদ্ভাবনা করতে পারতেন না। যা পড়েছেন, তাই কার্যে পরিণত করতেন মাত্র। তিনি বিগত চার বৎসর স্ত্রীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেছেন এবং তার ফলে সম্প্রতি একজন বিখ্যাত যন্ত্রাবিষ্কারক হয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, এখন কোন বিষয়ের চিন্তা করতে গেলে সেই বিষয়ের একখানি ছবি যেন তাঁর মনের সম্মুখে বিস্তারিত হয়, তিনি তাতে সমস্তই দেখতে পান। ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানের এমনই ফল। ব্রহ্মচর্য না থাকার জন্যই আমাদের এত দুর্দশা হয়েছে। (২) দম—বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, হস্তাদি ও চক্ষু প্রভৃতিকে মনের বশে আনয়ন করতে হবে। (৩) তিতিক্ষা, অর্থ—সহ্য করা। সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ ইত্যাদি যার যে পরিমাণে সহ্য হয়, সেই পরিমাণে সহ্য করা। (৪) উপরতি, অর্থাৎ রূপরসাদিবিশিষ্ট বাইরের বস্তুসকল হতে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনকে ভেতরে আনয়ন করা। (৫) শ্রদ্ধা, অর্থ—বেদশাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। (৬) সমাধান—ঈশ্বরবিষয়ে মনের একাগ্রতা। চতুর্থ—মুমুক্ষুতা। এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হলে জ্ঞান-কাণ্ডে অধিকার জন্মে।

আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি, কর্মকাণ্ডেও পরোপকার, সত্য-কথন প্রভৃতির অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে। বেদের কর্মকাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম মন্ত্রভাগ—ইহাতে ইন্দ্রাদি নানা দেবতা-সম্বন্ধে স্তবাদি আছে এবং দ্বিতীয় ব্রাহ্মণভাগে যাগযজ্ঞাদি করবার নিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন সভা—রবিবার, ৭ই আগস্ট, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ

সৃষ্টি-রহস্য

সৃষ্টির অনাদিত্ব

আজ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হতে একটি গল্প পাঠ করব—শ্বেতকেতু নামে একটি ব্রাহ্মণপুত্র ছিলেন, তাঁর পিতার নাম আরুণি বলে তাঁকে আরুণি শ্বেতকেতু বলত। একদিন তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, "শ্বেতকেতো, তুমি ব্রহ্মচর্য আচরণপূর্বক গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন কর।" শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য গ্রহণপূর্বক দ্বাদশ বর্ষ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। শাস্ত্রাদি পাঠ করে, নিজের পাণ্ডিত্য চিন্তা করে কিছু অহঙ্কারী হয়েছেন দেখে তাঁর পিতা তাকে বললেন, "শ্বেতকেতো, তুমি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ সত্য, কিন্তু এরূপ কিছু জেনেছ, যা জানলে জগতের সমস্ত পদার্থই জানা যায়? মাটিকে জানলে যেরূপ মাটির বিকার—সরা, খুরি প্রভৃতি সমস্তই জানতে পারা যায়, সেইরূপ এমন এক বস্তু আছে, যাকে জানলে জগতে জানবার আর কিছু বাকি থাকে না। এরূপ কোন বস্তু কি জানতে পেরেছ?" শ্বেতকেতু বললেন, "না, আমি এরূপ বস্তু জানি না, আমার গুরুও ইহা জানেন না, জানলে অবশ্যই সে বস্তুর কথা আমাকে বলতেন। অতএব আপনি, যদি তা জানেন, অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন।" আরুণি বললেন, "শ্বেতকেতো, অগ্রে কেবল এক সৎ বস্তুই বিদ্যমান ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই সমস্ত সৃষ্টি করেছেন, তিনি ঈক্ষণ করলেন—ইচ্ছা করলেন—আমি বহু হব এবং তিনি বহু হলেন।" এইরূপে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণনা করে শিক্ষা দিলেন। এক্ষণে আমাদের বুঝা আবশ্যক, এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনায় বলা হয়েছে—অগ্রে কিছুই ছিল না, কেবল এক সৎ ছিলেন। এর অর্থ কি? সৃষ্টি আদৌ ছিল না, বা হয় নাই—এই কি অর্থ? না, আমাদের শাস্ত্রের কোথাও এরূপ উল্লেখ নেই। এর অর্থ—সৃষ্টি বীজরূপে সেই সদ্বস্তুতে বর্তমান ছিল, সৃষ্টি সেই সদ্বস্তু হতে পৃথক নয়, তিনিই বহু হয়েছেন। যখন এই সৃষ্টি তাঁর অংশ হল তখন ইহা ছিল না, এরূপ কিরূপে হবে? প্রকাশভাবে সৃষ্টি না থাকুক, বীজভাবে ছিল। বৃক্ষ যেমন বীজ হতে উৎপন্ন হয়ে ক্রমে শাখাপত্রাদির আকারে প্রকাশিত হয় ও পরে আবার বীজে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়, সেইরূপে সৃষ্টির বারংবার প্রকাশ ও লয় হয়ে থাকে, ব্যক্তাবস্থা হতে আবার অব্যক্ত অবস্থায় লুক্কায়িত হয়। এইরূপে প্রকাশ ও প্রলয়—এই দুই অবস্থায় প্রবাহরূপে সৃষ্টি

অনাদিকাল বর্তমান আছে। সদ্‌বস্তু যেরূপ অনাদি, এই সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি। সৃষ্টির আদি আছে বললে দুটি দোষ উপস্থিত হয়, ইহা আমরা গত বারে দেখেছি। প্রথম বৈষম্যদোষ—আমরা জগতে বৈষম্য দেখতে পাই—কেহ রুগ্ন, কেহ সুস্থকায়; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ ইত্যাদি; এইরূপ বৈষম্য কেন ও কোথা হতেই বা হয়? সৃষ্টিকর্তা-কৃত বললে তাঁতে পক্ষপাতিত্ব-দোষ পড়ে এবং দ্বিতীয়, তাঁতে নৈর্ঘৃণ্য-দোষ হয়, তাঁর নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ হয়, কারণ-অকারণে তিনি কাকেও সুখী এবং কাকেও মহাদুঃখী করছেন। বেদাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলে বর্ণিত। উহা প্রবাহরূপে অনাদি, উহা তাঁরই রূপ, তাঁরই অংশ তিনিই। সৃষ্টির আদি আছে বললে আর এক দোষ উপস্থিত হয়, উহা এই—যখন সৃষ্টি ছিল না, তখন ভগবানের সৃষ্টিকর্তৃত্ব না-থাকার জন্য তাঁর পূর্ণত্ব ছিল না, তিনি অপূর্ণ ছিলেন। সৃষ্টিকর্তা হয়ে তাঁর অধিক গুণপ্রাপ্তি হয়েছে অথবা গুণের হ্রাস হয়েছে, বলতে হয়। এজন্য কি বেদ, কি পুরাণ কি মহাভারত, কি স্মৃতি—সকল শাস্ত্রেই সৃষ্টি অনাদি বলে কথিত হয়েছে।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া—প্রাণ ও আকাশ

মহাভারতাদিতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করে সাধারণতঃ আমরা অনেক ভুল বুঝে থাকি। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার প্রথমেই আছে যে, প্রথমতঃ, প্রাণ ও আকাশ প্রকাশিত হল, এখন প্রাণ মানে আমরা নানারূপ বুঝে থাকি। কেহ নিঃশ্বাস অর্থ বুঝলেন, কেহ জীবাত্মা বুঝেন ইত্যাদি, কিন্তু এরূপ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়নি। সেইরূপ আকাশ-অর্থে আমরা অবকাশ বুঝি, এই আকাশের তিনরূপ অর্থ আছে। প্রথম মহাকাশ—বাহ্য জগতের সকল বস্তু এই মহাকাশে বর্তমান। সম্মুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, বৃক্ষাদি সমস্তই এই অবকাশে রয়েছে; দ্বিতীয়, চিত্তাকাশ—আমরা যে সমস্ত চিন্তা করি, বিচার করি বা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের মনে বর্তমান রয়েছে। এইজন্য মনকে আকাশ-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয়—চিদাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানময় আকাশ; আমাদের যে জ্ঞান, তাহা সামান্য জ্ঞান, কিন্তু চিদাকাশ পূর্ণজ্ঞানের আকাশ। আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানে জড়িত; কিন্তু এই জ্ঞানে অজ্ঞান নেই—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ; এই আকাশে বাহ্যিক মহাকাশ ও আন্তরিক চিত্তাকাশ উভয়ই রয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনায় আকাশ আর এক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ইহা পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ, ইংরেজীতে যাকে matter বলে; ইহা জড়ের সূক্ষ্ম অংশ এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত শক্তির মূল শক্তি। জড় জগতের যত কিছু শক্তি, যেমন গতিশক্তি, শারীরিক শক্তি, অন্ন-পরিপাক-শক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি—সমস্তই সেই এক প্রাণেরই বিকার, সেইরূপ আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসশক্তিও সেই প্রাণের বিকার এবং এই নিঃশ্বাস-শক্তি বর্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাকে বলে একে বিশেষরূপে প্রাণ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শাস্ত্রের সৃষ্টিবর্ণনস্থলে 'প্রাণ' বলতে এক মূলশক্তিকে বুঝতে হবে, অন্য সকল শক্তিই যার বিকার-প্রসূত; এবং 'আকাশ' বলতে বুঝতে হবে, মূল জড় বস্তু—আর সমস্ত জড় বস্তুই বিকারমাত্র।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া—শাস্ত্র ও বিজ্ঞান

শাস্ত্রের সৃষ্টিবিষয়ক মত আমরা না বুঝেই অনেক সময় ভ্রান্ত বলে অগ্রাহ্য করি, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনেক স্থলে সত্য বলে প্রমাণ করে দেয়। শাস্ত্র বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে পূর্বোক্ত আকাশের উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য হতে আরম্ভ হয়। ইহার প্রথম ফল বায়ু বা কম্পন, অর্থাৎ আকাশের পরমাণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়। বায়্=বা ধাতু—কম্পন-অর্থ। আকাশ হতে এই বায়ুর বা কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হতে তেজঃ জন্মায়। বিজ্ঞানও আজকাল ইহা প্রমাণ করছে। কোন বস্তুর গতিরোধ করলে তা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বাতাস অত্যন্ত জোরে বইলে উত্তাপ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহনক্ষত্রাদি ও সমুদয় পৃথিবী প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্তাবস্থায় ছিল, ক্রমে শীতল হয়ে বাসোপযোগী হয়েছে। এখনো সূর্য্যলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত, তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্তু বাষ্পরূপে বর্তমান রয়েছে। এই তেজ শীতল হয়ে অপ্ বা জল হয় ও ক্রমে কঠিন হয়ে পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকাদিরূপে পরিণত হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পঞ্চমহাভূত পূর্বোক্তাদিরূপে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে এই স্থূল জগৎ নির্মিত হয়।

সৃষ্টিতত্ত্বে—সাংখ্য ও বেদান্ত

বেদান্তমতে এই স্থূল জগৎ এক সত্যেরই রূপান্তরমাত্র। এক সদ্‌বস্তুকেই অবলম্বন করে এই জগৎ রয়েছে; তিনিই এই জগৎ হয়েছেন। সাধারণতঃ বেদান্তের অর্থ লোকে এইরূপ করে যে, জগৎ মিথ্যা, জগৎ নেই; কিন্তু বেদান্তের এরূপ অর্থ নয়। যখন সদ্‌বস্তু হতে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তখন ইহা একেবারে মিথ্যা কি করে বলব? যখন তিনিই সকল জীবজন্তুর প্রাণরূপে বর্তমান রয়েছেন, তখন ইহা কিরূপে মিথ্যা হতে পারে? আমাদের এইস্থলে 'মিথ্যা' এই কথা "কম সত্য, সেই পূর্ণ সত্য অপেক্ষা কম সত্য" এরূপ বুঝলে আর কোন গোল হবার সম্ভাবনা নেই। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব এরূপ—পুরুষ ও প্রকৃতি দুই অনাদি বস্তু। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হন, যেরূপ চুম্বকলোহের সান্নিধ্যবশতঃ লৌহ আকৃষ্ট হয়। এই প্রকৃতি হতে মহান্ অর্থাৎ বুদ্ধি, বুদ্ধি হতে অহংজ্ঞান, অহঙ্কার হতে পঞ্চসূক্ষ্মভূত ইত্যাদির ক্রমে সৃষ্টি হয়।

সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভেদ—ঈশ্বরতত্ত্বে

এখন সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে প্রভেদ এই, সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না, বেদান্ত করেন। বেদান্ত বলেন, যেমন মানুষের এই দেহ, সেইরূপ সমগ্র সৃষ্ট জগৎ একটি মহান্ বিরাট দেহ। আমাদের দেহসকল সেই সমষ্টি দেহের অংশমাত্র। প্রত্যেকের যেরূপ মন আছে, সেইরূপ এই স্থূল জগতের ভেতর এক অনন্ত মন আছে, আমাদের প্রত্যেকের মন সেই মহান্ মনের অংশমাত্র। সমস্ত দেহ পরস্পর সম্বন্ধ, কারণ তারা এক বিরাট দেহের অংশ। সমস্ত মন পরস্পর সম্বন্ধ, কারণ তারা এক বিরাট মনের অংশ।

বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের কার্যকারিতা নিঃস্বার্থপরতা

যখন একটি দেহ ক্লেশ পায় বা একটি মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন আর আর দেহ ও মনেও সেই তরঙ্গের প্রতিঘাত হবে! কারণ, তারা পরস্পরসংলগ্ন ও সেই একেরই অংশ হয়ে রয়েছে। অতএব তোমার মঙ্গলে আমারও মঙ্গল ও তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল। তোমার উন্নতি ও অবনতি তোমাতেই অবসিত হচ্ছে না, তার প্রতিঘাত আমাতে ও সর্বজগতে গিয়ে লাগছে। সেইরূপ একজাতির উন্নতি অবনতি অপর জাতিসমূহকে স্পর্শ করে। আমরা বেদান্তের এই মহান সত্য যে দিন হতে ভুলেছি, সেই দিন হতেই আমাদের অবনতির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্বার্থের বশীভূত হয়ে আমরা যে স্ত্রী ও শূদ্রজাতির প্রতি অত্যাচার করেছি, এখন তারই ফলভোগ করছি। সমাজ-শরীরের এক অংশ রোগগ্রস্ত হলে অপর অংশও রুগ্ন হয়—পাশ্চাত্যগণ বেদান্ত না পড়েও বহুদর্শিতায় ইহা বুঝেছে ও এখন সেই সত্যটি কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা পাচ্ছে; একদেশে মহামারী হলে অপর দেশে হবার সম্ভাবনা, অতএব পরের দেশের মহামারী নিবারণের চেষ্টা করছে; স্ত্রীজাতির অবনতিতে সমাজের অপর অঙ্গ পুরুষ জাতিরও অবনতি হয়ে থাকে এবং অপর দেশের অমঙ্গলে নিজেদেরও অমঙ্গল, ইহা বুঝেছে। জগতস্থ সকল ব্যক্তি ও বস্তুই সেই বিরাট মূর্তির অঙ্গ, এই মহান্ ভাব বেদান্ত প্রচার করেছেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, "হে অর্জুন, যা কিছু শক্তিমান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখবে, তা আমি; নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ" ইত্যাদি বলে অবশেষে বলছেন, "ঐরূপে এক একটি আমার বিভূতির কথা আর আমি কত বলব, আমিই একাংশে সমস্ত জগৎ হয়ে রয়েছি।" এই বিরাটের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। 'সাধন ভজন' শব্দের অর্থ এক কথায় বলতে হলে বলতে হয় যে, উহা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন পথে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা নেই। আপনাকে ভুলে যাওয়া—যে আপনাকে ভুলতে পেরেছে, স্বার্থত্যাগ করতে পেরেছে, তার সাধন ভজন সব হয়েছে। ঈশ্বর কি খোসামোদের বশ যে, যে তাঁকে স্তবস্তুতি করল, তার প্রতি প্রসন্ন হবেন, আর যে করল না, তার প্রতি বিমুখ হবেন? না, তিনি এরূপ নন। একজন ভগবান মানে না কিন্তু সে স্বার্থশূন্য, পরের সেবা তার ব্রত, জেনো তার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নেই। আর যে দিবারাত্র ঈশ্বরপূজায় ব্যস্ত কিন্তু মহাস্বার্থপর, তার সাধন-ভজন পণ্ডশ্রমমাত্র। সবভূতে ভগবানকে দেখতে হবে, সকলকেই তাঁর মূর্তি জেনে সেবা করতে হবে। বেদান্ত ইহাই বলেন, আমরা সকলেই বিরাটের অংশ। সেই বিরাট মনের এক ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে আমি বলছি, আমার মন—তুমি একটু নিয়ে বলছ, তোমার মন। যেমন গঙ্গার স্থানে স্থানে বেড়া দিয়ে আমরা এক একটা নাম দিচ্ছি—ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গা ইত্যাদি। সকলেই জানেন কিন্তু গঙ্গা বাস্তবিক এক!—এক জল, এক তরঙ্গ কেবল নামরূপে আমরা প্রভেদ করছি মাত্র। সমুদ্রের একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা একই সমুদ্র। সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলছি। যখন দু'জনের মন পরস্পরের প্রতি স্বার্থশূন্য ভালবাসায় সংযুক্ত হয়, তখন ঐ দু'জন একভাবে ভাবিত হয়,

তখন তাদের শরীর পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকলেও মনের কথা জানতে পারে ; আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এইরূপে আমাদের মন ও শরীর যে পরস্পর সংলগ্ন রয়েছে, ইহা এক মহাসত্য। অতএব একথাও সত্য যে, যখন আমাদের মনে পাপচিন্তার উদয় হয়, তখন অন্যান্য মনের পাপচিন্তাসকলও প্রবাহিত হয়ে উহাকে আরও পাপে নিমগ্ন করে। আবার কোন সৎ বা ধর্মচিন্তার উদয় হলে, যত সাধু মহাপুরুষদিগের চিন্তা আমাদের মনের উপর কার্য করে, উহাকে আরও উন্নত করতে থাকে। এইরূপে আমাদের সমস্ত সাধন-ভজন আমাদের স্বার্থশূন্য করে বিরাটের উপলব্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করে।

ঈশ্বরের প্রকাশ ব্যক্তিভেদে

যার যেরূপ মন, সে বিরাটকে সেইরূপে ভেবে থাকে ; যে নিষ্ঠুরস্বভাব, ভগবানকে সে নিষ্ঠুরভাববিশিষ্ট দেখে , যে পুণ্যবান, সে ভগবানকে অনন্ত পুণ্যময় দেখতে পায়। এইরূপে আমাদের নিজের স্বভাব-অনুযায়ী আমরা ভগবান কল্পনা করি। ইহা স্বাভাবিক এবং ইহা সত্য, কারণ মনের উন্নতি-অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকে ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণা করি। ঐ ধারণাই সেই সময়ে ভগবানের স্বরূপ বলে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ঐসকল ধারণা আবার একভাবে সত্য এবং অন্যভাবে মিথ্যা বলে বুঝতে পারা যায়। যেমন সূর্যকে আমরা পৃথিবী হতে যেরূপ দেখি, তা সূর্যের প্রকৃত রূপ নহে,কিন্তু আমরা যা দেখি তাও মিথ্যা নয়। সূর্যের দিকে যতই অগ্রসর হ'ব, সূর্যকে আমরা ততই ভিন্নরূপে অবলোকন করতে থাকব এবং ঐরূপে সূর্যলোকে যদি কখন উপস্থিত হতে পারি, তখন সূর্যের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নয়নগোচর হবে। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখ—দূর হতে পর্বত দেখলে বোধ হয়, একখানি কাল মেঘ উঠেছে , যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ঐ পর্বতস্থ বৃক্ষমন্দিরাদি দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমে আরও অগ্রসর হলে জীবজন্তু প্রভৃতি দেখা যায়। ঐরূপ যতই সেই বিরাট পুরুষের নিকটে যাওয়া যায়, ততই আমরা তাঁর নূতন নূতন ভাবসকল দেখতে ও বুঝতে থাকি এবং ক্রমে পূর্ণজ্ঞানে তাঁর সহিত সম্মিলিত হয়ে যাই। পরমহংসদেব ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেন—"যেমন ঘরের ভেতর একটু আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আসছে। যে ভেতরে আছে তার আলোজ্ঞান সেইটুকু , যার ঘরে অনেক ছিদ্র, সে অধিক আলো দেখতে পায় , দরজা জানলা কব তো আরও আলো হয় , আবার ঘর ছেড়ে মাঠে গিয়ে যে বসেছে, তার কাছে আলোয় আলো। ভগবান এইরূপে লোকের মানসিক অবস্থা-অনুযায়ী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

বেদান্ত কি নাস্তিক ?

লোকে ভুল বুঝে বেদান্তশাস্ত্রকে নাস্তিকশাস্ত্র বলে। যে বেদান্ত সকলেরই ভেতর অনন্তকে দেখিয়ে দেন, সকলকেই ব্রহ্মের অংশ বলে পূজা করতে বলে, তা কখনো কি নাস্তিকশাস্ত্র হতে পারে ? আমরা অতি হীন হয়েছি, নিজেরা শাস্ত্র পড়ি না, বুঝি

না, তাই আমাদের এই দুর্দশা। আবার শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে হবে। সকলের ভেতর আনন্দময় ব্রহ্মকে দেখতে হবে, সমস্ত জগতে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই উন্নতির সময় আসবে।

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, রবিবার, ২৮শে আগস্ট, ১৮৯৮)

সাধন-নিষ্ঠা

গীতায় ভগবান বলছেন, "ঈশ্বরোপাসনা করতে অগ্রসর হয়ে ইহলোকে মানবের নিষ্ঠা দ্বিবিধ হতে দেখা যায়। প্রথম জ্ঞাননিষ্ঠা, দ্বিতীয় কর্মনিষ্ঠা। পুরুষ কর্মানুষ্ঠান না করলে জ্ঞানপ্রাপ্ত না হলেও কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। কর্মত্যাগ করে ক্ষণমাত্র বাঁচবার উপায় নেই। ইচ্ছা না থাকলেও প্রাকৃতিক গুণ মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। তুমি নিয়ত কর্ম অনুষ্ঠান কর—কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। সর্বকর্মশূন্য হলে তোমার শরীরযাত্রা নির্বাহ হবে না" ইত্যাদি। আমরা পূর্বে দেখেছি বেদের প্রতিজ্ঞা কি। বেদ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় কি, তাই শিক্ষা দেন। আত্মজ্ঞান কাকে বলে এবং কি উপায়েই বা উহা লাভ হতে পারে, বেদ সেই বিষয়েই সকলকে বলে থাকেন। বেদ বলেন, সকলের ভেতরেই পরমাত্মা রয়েছেন। জীবজন্তু কীট-পতঙ্গের ভেতর তিনি, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের ভেতরেও তিনি। তিনি এই সমস্ত সৃষ্টিকার্যের ভেতরে ও বাইরে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রয়েছেন।

তাঁকে কে লাভ করতে পারে? যার দৃঢ়তা আছে, যে সাহসী, সে-ই তাঁকে লাভ করতে সমর্থ। যে দুর্বল-দেহ, যার মন নিস্তেজ, আত্মজ্ঞান তার পক্ষে লাভ হওয়া কঠিন। তেজীয়ান হতে হবে; তা হলেই ভগবানকে লাভ করতে পারা যাবে। বেদ বিশেষ করে সনাতনধর্মের বিষয়ই বলেন। সনাতনধর্মের অর্থ এই—যে ধর্ম কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেরই নিত্য সমভাবে অনুষ্ঠেয়; যা সকল সময়ে এক এবং অপরিবর্তনীয় রূপে বিদ্যমান। আর স্মৃতি, পুরাণ, বাইবেল, কোরানাদি দেশকাল ও পাত্রভেদে যুগধর্মের বিষয় বর্ণনা করেন। দেশকালপাত্র-বিবেচনায় নানাপ্রকার যুগধর্ম কালে কালে জগতে প্রচলিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস বর্তমান যুগধর্ম কি হওয়া উচিত তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজজীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন। উহা সংক্ষেপে এইরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে—নিজধর্মমতে নিষ্ঠা রাখবে কিন্তু অপরের ধর্মকেও ভাল-বাসবে, ঘৃণা করবে না। উহা তিনি যে শুধু বলে গিয়েছেন তা নয়, কিন্তু নিজজীবনে উহার অনুষ্ঠান করে আমাদের দেখিয়েও গিয়েছেন। তিনি সাধন দ্বারা উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করেছিলেন—"যত মত, তত পথ।" সকল ধর্মই সত্য; যে যেরূপ অধিকারী, সে আপনার অনুরূপ পথ বেছে নেয়।

শাস্ত্রে বলে সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির আদি স্বীকার করলে ভগবানে অপূর্ণতাদোষ

হয়। যদি বলা যায়, তিনি সৃষ্টির পূবে পূর্ণ ছিলেন, তবে সৃষ্টির পর তিনি পূর্ণতর হলেন, বলতে হয়। আর যদি বলা যায়, সৃষ্টির পর তিনি পূর্ণ হলেন, তবে সৃষ্টির পূর্বে তিনি অপূর্ণ ছিলেন, বলতে হয়। এ উভয় পক্ষেই দোষ রয়েছে। 'পূর্ণতর' কথাটি স্ববিরোধী ; কারণ যা পূর্ণ হতে পূর্ণতর হল, তা বাস্তবিক অপূর্ণই ছিল বলতে হয়। পূর্ণের আবার নবীন বিকাশ কি ? সৃষ্টির আদি স্বীকার করলে আবার তাঁকে নিষ্ঠুরতা-দোষে দোষী করা হয়। দেখা যায়, জগতে কেহ বা দরিদ্র, রুগ্ন ও মূর্খ, কেহ বা ধনী, সুস্থকায় ও বিদ্বান। ভগবান যদি বিভিন্ন ব্যক্তিকে এইরূপ বিভিন্ন-অবস্থাপন্ন করে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তাতে পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা-দোষ অনিবার্যরূপে এসে পড়ে। এই হেতু শাস্ত্র বলেন, সৃষ্টি অনাদি। যখন ইহা সূক্ষ্মভাবে বীজরূপে থাকে, তখন ইহার প্রলয়াবস্থা ; যখন স্থূলভাবে প্রকাশ, তখন সৃষ্টি। এক সৃষ্টি ও এক প্রলয় নিয়ে এক কল্প হয়। এইরূপে সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরূপে অনাদিকাল বর্তমান। ইহা ভগবান ছাড়া অন্য কিছু নয়, তিনিই ইহা হয়েছেন। শাস্ত্র বলেন, তিনি ঈক্ষণ করলেন (আলোচনা করলেন) যে, আমি প্রজারূপে বহু হব এবং তৎক্ষণাৎ এই সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত ও বহু হলেন। সৃষ্টিকার্যে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, কারণ তিনি পূর্ণ। কার্যের উদ্দেশ্য কার থাকে ? যার কোনরূপ অভাব আছে। সেই অভাবমোচনের জন্য সে নানাভাবে কার্য করে এবং নানা বিষয়ের সাহায্য নেয়। ভগবানের কোন অভাব নেই। তাঁর কিছু পাবার আবশ্যক নেই, কারণ তিনি পূর্ণ। অতএব তাঁর এই সৃষ্টি করবার কোন উদ্দেশ্যও নেই। পাশ্চাত্ত্যেরা এ কথা বুঝতে পারে না। সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য নেই বললে তারা ভেবে বসে, তবে বুঝি সৃষ্টিতে কোন নিয়ম-বন্ধন নেই, এটা একটা পাগলামিমাত্র। উদ্দেশ্যহীন কোন কার্য যে হতে পারে, ইহা তারা মনে করতে পারে না। কারণ, তারা নিজেদের এবং অপর সাধারণের অপূর্ণত্ব দেখে স্থির নিশ্চয় করে, উদ্দেশ্যহীন কার্য সাধারণ মানুষের দ্বারা কোন কালে হয় না, দেখে, তাদের অভাব আছে বলেই তারা কার্য করে, সুতরাং অনুমান করে, সৃষ্টিকার্যও এরূপ হয়েছে। ভগবান কোন এক মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়েই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনুধাবন করে দেখলে এই যুক্তি ভ্রমপূর্ণ বলে বোধ হয়। কারণ এতে ভগবান মনুষ্যতুল্য এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে। সৃষ্টিকার্যে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য নেই, ইহা তাঁর খেলা, ইহা তাঁর লীলামাত্র। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন হলে কখনও কি কার্য হতে পারে ? শাস্ত্রকারেরা বলেন, অবশ্য হতে পারে। দৃষ্টান্ত দেন—যেমন বালকের কার্য ; বালক পথে যেতে যেতে পতঙ্গ দেখে, তাই ধরতে যায়, উদ্দেশ্যহীন নানা কার্য করে, ভগবানের সৃষ্টিকার্যও তদ্রূপ। সৃষ্টিতে তিনিই নানারূপে এই প্রকারে সেজেছেন—ইহা তাঁহার খেলা বা লীলামাত্র।

দেখতে পাই, সংসারে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র ; কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত। এই বৈষম্যের কারণ কি ? শাস্ত্র বলেন, ইহার কারণ কর্ম। 'কর্ম'-শব্দ শাস্ত্রে অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাস্ত্র বলেন, পৃথিবী ও নক্ষত্রাদিও কর্ম-সম্ভূত। এ কথার অর্থ কি ? এখানে কর্মের অর্থ কারণ বা বীজভাব হতে কার্য

বা প্রকাশিত অবস্থায় পরিণত হওয়া, ঐরূপ পরিণতিকেই কর্ম বলে। সৃষ্টি যখন অনাদি হল, তখন সৃষ্টি-বৈষম্যের কারণ 'কর্ম' ও যে অনাদি, ইহা আর বলা বাহুল্য।

কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। যে কর্ম কর না কেন, তাহার ফলভোগ করতে হবেই হবে। কেউই এর অন্যথা করতে পারে না। চিন্তার উদয়রূপ মানসিক কর্মেরও ফল আছে। কোন পাপচিন্তার উদয় হলে তৎক্ষণাৎ ফলস্বরূপ মন কলুষিত হয় এবং যখন ঐ পাপচিন্তা প্রবল হয়, তখন উহা শারীরিক কার্যরূপে বাইরে প্রকাশিত হয়। আমরা অনেক সময় কর্মের ফল দেখতে না পেলেও কোনো-না-কোনো রূপে তা বর্তমান থাকে ইহা নিশ্চিত। শরীর-সম্বন্ধীয় অনিয়ত রোগরূপে আমাদের কষ্ট দেয়। ঔষধ দিয়ে রোগের উপশম হয়। ইহাতে শারীরিক অনিয়মের ফল, ঔষধসেবনরূপ অন্য এক কর্মফল দ্বারা রূপান্তরধারণ করল মাত্র। দুটি ভিন্ন কর্মের ফলই আমাদের উপভোগ করতে হল। কোনটির বিনাশ হল না, উভয় কর্মফল মিলে একটি কর্মফলরূপে প্রতীয়মান হল, এইমাত্র প্রভেদ। যেরূপ নৌকার মাস্তলে দড়ি বেঁধে উভয় তীর হতে গুণ টানলে নৌকা কোনো তীরে না গিয়ে নদীর মধ্য দিয়ে যেতে থাকে, সেইরূপ দুই ভিন্ন ভিন্ন কর্মের সংযোগে এক বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়, এইমাত্র। কিন্তু কর্মফলের নাশ কখনও নেই।

অনেকের বিশ্বাস, কোন এক অবতারে বিশ্বাসস্থাপন করলেই আমাদের সমুদয় পাপমোচন হয়ে যায়। বেদান্ত বলেন, তা নয়। স্বয়ং হরি, হর বা ব্রহ্মা তোমার উপদেষ্টা হলেও তোমার মোক্ষ তোমার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করছে। * তবে অবতারাদি কি করেন? তাঁরা নিজ ধর্মপরিণত জীবন আমাদের সম্মুখে ধরে আমাদের কি করতে হবে, তাই দেখান। আমাদের সম্মুখে একটি আদর্শ জীবন রেখে দেন, যা দেখে আমরা তদনুরূপ হতে পারি। তাঁরা আদর্শ দেখিয়ে যান এবং উহা মনুষ্যজীবনে পরিণত করবার সহজ উপায়ও বলে যান, যার প্রভাবে লক্ষ জন্মের কার্য শত জন্মে, এমন কি, এক জন্মে শেষ করতে সমর্থ হয়ে মানুষ ধর্মের চরম সীমায় উপনীত হয়। অতএব শাস্ত্র বলেন, কর্ম ও তার ফল নিত্যসম্বন্ধ—কার্য-কারণসূত্রে আবদ্ধ। প্রলয়কালে ইহা বীজভাবে ও সৃষ্টিকালে বিকাশভাবে থাকে; এইমাত্র প্রভেদ।

সচরাচর চারপ্রকৃতির মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। কেউ জ্ঞানপ্রধান প্রকৃতির লোক। এঁরা বিচার ভিন্ন কোন তত্ত্বই গ্রহণ করতে চান না। লোকের কথার উপর বিশ্বাস করে কোন কার্য করতে চান না। দ্বিতীয়, ভক্তিপ্রধান প্রকৃতির লোক। এঁরা কারও উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করে তদবলম্বনে অল্পস্বল্প বিচার করে থাকেন। তৃতীয়, কর্মপ্রধান প্রকৃতির লোক—এঁরা পরোপকারাদি ধর্মই একমাত্র কর্তব্যবোধে সর্বদা কর্মেরই অনুষ্ঠান করে থাকেন। চতুর্থ, যোগপ্রধান প্রকৃতির লোক। এঁরা মানসিক শক্তিসমূহের তন্ন তন্ন বিচার করে উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন। মানুষ এই

---

* হরিশ্চেত উপদেষ্টারঃ হরঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ববিস্মরণাদৃতে॥

চারটি ভাবের কোন একটিমাত্র লয়ে অবস্থান করে, এরূপ বলা ভ্রম। তবে উহার মধ্যে একটি ভাব প্রত্যেকের মনে অধিক প্রবল থাকে, এইমাত্র। যার যে ভাব প্রবল থাকুক না কেন এবং যে যে-পথ অবলম্বন করে চলুক না কেন, উন্নতির চরম সীমায় সকলেই ভগবানের সহিত একতা উপলব্ধি করে থাকে এবং শাস্ত্র ঐ একতা উপলব্ধির চারটি বিশেষ পথ উপদেশ করে থাকেন। উহাদের নাম জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ। ভগবানের সহিত আমাদের যুক্ত করে বলেই এই চার মার্গ 'যোগ'-শব্দে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে সংক্ষেপে কর্মযোগের বিষয় বলছি। অহংভাব পরিত্যাগ করে বাসনাশূন্য হয়ে ভগবানের জন্য কর্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম। আহার-বিহার প্রভৃতি যে কোন কর্ম করবে, ভগবানের জন্য করছি এই ভাব মনে করবে। আমি কিংবা আমার জন্য ইহা করছি, ইহা না ভেবে ভগবানের জন্য করছি, এই ভাববে।

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

কর্মের দ্বিবিধ রূপ

শাস্ত্রে কর্মশব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণতঃ মানুষ যা কিছু করে, তাকেই কর্ম বলা হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্র যেখানে বলছেন, কর্ম হতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে—কর্ম হতে সূর্য চন্দ্র হয়েছে, সেখানে কর্মশব্দ, যে অচিন্তনীয় কার্যকারণপ্রবাহ সমগ্র জগৎকে বীজাবস্থা হতে বিশিষ্ট নামরূপদ্বারা প্রকাশিত করছে, সেই কার্যকারণ-প্রবাহকে লক্ষ্য করে ব্যবহৃত হয়েছে। অদৃষ্ট অবস্থা হতে বস্তুর দৃষ্ট অবস্থান্তরে পরিনমণকেই কর্ম বলা হয়েছে, অতএব পরিবর্তন ও পরিনমণ-শক্তিই কর্মের প্রধান লক্ষণ। গীতা সেজন্যই বলেন—"ভূতভাবোদ্ভব করো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ"—অর্থাৎ যে ত্যাগ বা বর্জনের দ্বারা ভূতান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাই কর্ম।

কর্ম দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। শাস্ত্র কোন কর্মকেই মিথ্যা বলেননি। অনেকে বলেন, 'সংসারে থেকে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সংসারে মানুষ যা কিছু কর্ম করছে, সব মিথ্যা। তা দিয়ে কখনও ভগবদ্দর্শন হতে পারে না। সর্বকর্মসন্ন্যাসই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।' ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শাস্ত্র অবস্থাবিশেষে কর্তব্যনির্দেশ করেছেন মাত্র। সংসারকে ছোট, সন্ন্যাসকে বড় করেননি। অবস্থাবিশেষে সংসার কারও পক্ষে ঠিক, আবার সন্ন্যাস কারও পক্ষে ঠিক—এই কথা বলেছেন। সকল কর্মই আমাদিগকে ভগবানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কোন কর্মই মিথ্যা নয়। যাহা অত্যন্ত স্বার্থপর কর্ম, তাহা করতে করতেও লোকে নানারূপে ভুগে বহুদর্শিতা লাভ করে এবং ক্রমে নিষ্কাম কর্মের দিকে অগ্রসর হয়। ঐ নিষ্কাম ভাব আবার কালে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে স্বভাবতঃ সন্ন্যাস এসে উপস্থিত হয়। ইহাই যথার্থ সন্ন্যাস। ইহা ভোগ ও ত্যাগ—এই দুই লক্ষণের অধিকারভুক্ত নয়। ইহা ঐ দুয়ের বাইরে। প্রথম হতে একেবারে কর্মত্যাগ

করে সন্ন্যাসগ্রহণ করলে মানুষ অগ্রসর হতেই পারবে না। পরমহংসদেব এজন্যই বলতেন, "চর্মরোগ-আরোগ্য হলে শুষ্ক চর্ম শরীর হতে আপনিই খসে পড়ে। কিন্তু আরোগ্যলাভ হবার পূর্বেই ঐ চর্ম উঠাতে প্রয়াস পেলে যন্ত্রণা, রক্তপাত ও ক্ষতবৃদ্ধিই হয়ে থাকে।"

তিনি ঐ কথা আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতেন, "সংসার, সন্ন্যাস, কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকলই মনুষ্যের উন্নতির মাত্রায় আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হয়, সেজন্য যার যেরূপ শরীর ও মনের অবস্থা, তার পক্ষে সেরূপ কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে ছেলের যেরূপ স্বাস্থ্য, তা বুঝে মা তার জন্য উপযোগী পথ্য ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক জগতেও সেরূপ। কোন কর্মই ধর্ম ছাড়া নয়, তবে যার যেরূপ অধিকার, তার পক্ষে সেরূপ ধর্মের ব্যবস্থা আছে। একরূপ ধর্মাচরণ সকলের পক্ষে উপযোগী হতে পারে না।"

শাস্ত্রে দুটি মার্গের বর্ণনা আছে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। যার সুখভোগের ইচ্ছা প্রবল, সে ধর্মানুষ্ঠান করতে গেলে স্বভাবতঃ যাগযজ্ঞাদিলক্ষণ সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হবে। সুখাদি-ভোগের পর কালে যখন সে দেখবে তার প্রাণ অন্য কিছু উচ্চ বস্তু চাইছে, তখন সে আপনিই উহা ছেড়ে নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করবে। রাজা যযাতি পুরুর নিকট হতে তাঁর যৌবন গ্রহণ করে সহস্র বৎসর ভোগ করে যখন আবার তাঁকে ঐ যৌবন ফিরিয়ে দিলেন, তখন বললেন, "কাম্যবস্তুসকলের উপভোগে কামনা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি-দানের ন্যায় উহা বৃদ্ধিই পেতে থাকে।" যযাতির এই জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহস্র বৎসর বিষয়োপভোগ ও সকাম কর্মের দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছিল।

প্রবৃত্তিমার্গ যেন ছাতের সিঁড়িস্বরূপ ; ইহা অবলম্বন করে নিবৃত্তিমার্গে ছাতের উপরে উঠতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে, কার কিরূপ কর্ম করা উচিত, তা কে নির্ধারণ করবে ? ইহা নির্ধারণ করতে একমাত্র সদ্‌গুরুই সমর্থ। যার যেরূপ মানসিক অবস্থা গুরু তার জন্য সেরূপ ধর্ম ব্যবস্থা করেন।

গুরুকরণ করতে হলে গুরুকে বিশেষ পরীক্ষা করে নিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের মত। গুরুর পুত্রকেই গুরু করতে হবে, ইহা সৎশাস্ত্রানুমোদিত নয়। শাস্ত্র বলেন, গুরুকে বিশেষরূপে দেখে তবে তাঁতে বিশ্বাসস্থাপন করবে। কিন্তু একবার বিশ্বাস করলে আর কোনরূপ সন্দেহ করবে না। পরমহংসদেব তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলতেন, "খুব বাজিয়ে নে।" বিশেষ পর্যালোচনা করে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি শাস্ত্র ছাড়া কোন কাজ করতেন না। তাঁর জীবন বেদবেদান্তের টীকাস্বরূপ। তাঁর ন্যায় ধর্মবীর মহাপুরুষগণ ধর্মরক্ষা করতেই আসেন। হিন্দু, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের মহাপুরুষগণই একবাক্যে বলে গেছেন যে, তাঁরা পূর্ব পূর্ব শাস্ত্র ও ধর্ম-রক্ষণের জন্যই এসেছেন, কোনও শাস্ত্র বা ধর্ম-ধ্বংসের জন্য তাঁদের শরীর পরিগ্রহ হয়নি।

নিষ্কাম কর্মের অর্থ—স্বার্থশূন্য হয়ে কর্ম করা, আপনাকে ভুলে নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি না করে ভগবানের জন্য কাজ করা। সকল অবস্থাতেই স্বার্থশূন্য হয়ে কাজ করতে পারা যায়। স্বার্থশূন্য হয়ে কাজ করার নামই কর্মযোগ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, স্বার্থপরতা কখনো কাহারও কি নিঃশেষে ত্যাগ হতে পারে ? আমরা দেখতে পাই, কারও স্বার্থ নিজের শরীর-মনের উপরেই আবদ্ধ, কারও নিজের পরিবারের উপর,

কারও দেশের উপর, আবার কারও বা সমুদয় জগতে বিস্তৃত। বুদ্ধদেব একটা ছাগলের জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাতেও কি স্বার্থপরতা নেই? অপরের জন্য ঐরূপে প্রাণ-বিসর্জনে যে আনন্দলাভ হয়, উহাই তাঁর স্বার্থ। উত্তরে বলা যেতে পারে, স্বার্থের ঐরূপ বিস্তৃতি ও নিঃস্বার্থতা একই বস্তু। যার মন-বুদ্ধি নিজের শরীর-মনের উপর আবদ্ধ, সে-ই যথার্থ স্বার্থপর ও কৃপাপাত্র। নিজের শরীর-মন ছেড়ে অপরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া-রূপ স্বার্থই নিঃস্বার্থতা নামে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কারণ সে স্বার্থ বন্ধনের কারণ না হয়ে মনুষ্যকে মনুষ্যনামের উপযুক্ত করে ও ভগবানের দিকে অগ্রসর করে দেয়। মনুষ্য যে পরিমাণে উন্নত হতে থাকে, তার স্বার্থদৃষ্টিও সেই পরিমাণে নিজ শরীর-মন প্রভৃতির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে উচ্চ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে থাকে। পরিশেষে তার ক্ষুদ্র আমিত্ব এককালে চলে গিয়ে তার স্থলে এক বিরাট মহান্ আমিত্বের সমাবেশ হয়, যার ঘাত-প্রতিঘাত সমগ্র জগৎ জুড়ে হতে থাকে। একেই ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থা বা মুক্তি বলে।

আমরা তিন প্রকারে অপরের উপকার করতে পারি। কেউ ক্ষুধার্ত হলে অন্ন দিয়ে তার ক্ষুধানিবৃত্তি করতে পারি। ঐ উপকার স্থূলশরীর সম্বন্ধীয় ও ক্ষণস্থায়ী, ছয় ঘণ্টা পরে আবার তার ক্ষুধার উদ্রেক ও অভাববোধ হবে। দ্বিতীয়তঃ, তাকে এরূপ শিক্ষা দিতে পারি, যাতে সে সর্বদা উপার্জন করে নিজের জীবনোপায় নিজে করে নিতে পারে। এই উপকার অনেক দিন স্থায়ী ও মানসিক। তৃতীয়তঃ, আধ্যাত্মিক উপকার, ইহার ফল আরও বিস্তৃত। এর প্রভাবে তার মনের সর্বপ্রকার অভাব-বোধ চিরজীবনের জন্য নিবৃত্ত হয়ে যায়। এরূপ উপকার ধর্মোন্নত মহাপুরুষেরাই কেবলমাত্র করতে পারেন।

একদিন ভগবান ঈশা রৌদ্রে ঘর্মাক্ত হয়ে একটি কূপের নিকট বসেছিলেন। একজন নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক জল নিতে এল। ঈশা তার নিকট জল পান করতে চাইলে সে আশ্চর্য হয়ে বললে, আমার হাতে আপনি জলপান করবেন?

প্রত্যুত্তরে তিনি সম্মতিজ্ঞাপন ও জলপান করে বললেন, "এর বিনিময়ে আমি তোমাকে যে জল দিব, তাতে তোমার চিরজীবনের মত তৃষ্ণা মিটে যাবে।" এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারের চরিত্রে এবং পওহারীবাবা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের জীবনেও দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা যে কাজই করি না কেন, ভগবানের জন্য করছি, নিজের জন্য নয়—এরূপ ভেবে করতে হবে। সামান্য রাস্তা ঝাঁট যে দেয়, সে যদি সর্বসাধারণকে ভগবানের অংশ ভেবে তাঁর সেবার জন্য রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছি এরূপ চিন্তা করে, তা হলে তার আর ঐ কর্মে কোন কষ্টবোধ হয় না। এরূপ কোন কর্মই নেই যা সম্পূর্ণ ভাল, অথবা যাতে কিছুমাত্র দোষ নেই। আমরা এই যে ভগবচ্চর্চা করছি, তাতেও সকলে উপকৃত হচ্ছে না; মুখনিঃসৃত উষ্ণ বায়ুতে বায়ুসাগরে ভাসমান কত কীটাণুর মৃত্যু হচ্ছে। সকল কর্মই এরূপে ভালমন্দমিশ্রিত হলেও যদি নিঃস্বার্থভাবে করা করা যায়, তা হলে উহার দোষ আমাদিগকে স্পর্শ করে না। শরীররক্ষার উপযোগী আহার-শয়নাদির সম্বন্ধেও

যদি ভাবা যায় যে, আহার শয়নাদির উদ্দেশ্য শরীররক্ষা, শরীর থাকলে তবে ভগবৎ-সাধন হবে; অতএব আহার-শয়নাদিও ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্যই করছি, তবে এগুলিও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হল। সকল কার্যে ঐরূপ করলে কর্মফলের দিকে আর দৃষ্টি থাকে না ও তজ্জনিত সুখদুঃখে আমাদিগকে আর আক্রান্ত হতে হয় না। কর্ম এরূপেই বন্ধনের কারণ না হয়ে অনুষ্ঠাতার মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা পূর্বেই বলেছি কর্ম অনাদি এবং কর্মের দ্বারাই শাস্ত্র জগতে বৈষম্যের ব্যাখ্যা করেছেন। কর্মের জন্যই এই বৈষম্য হয়েছে। যার যেরূপ কর্ম, সে সেরূপ অবস্থা পেয়েছে। কেউ কেউ এই বৈষম্যের অন্য কারণ নির্দেশ করে বলেন, জন্মসময়ে গ্রহাদির শুভ বা অশুভ যেরূপ সংস্থান থাকে, মানুষ সেরূপ অবস্থাপন্ন হয়। শুভগ্রহ থাকলে উত্তম জন্ম হয়, অশুভ গ্রহ থাকলে কুৎসিত জন্ম হয়। এর উত্তরে তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে—আমারই বা অশুভ গ্রহে জন্ম হল কেন এবং অপরেরই বা শুভ গ্রহে কেন জন্ম হল? এই শুভাশুভ গ্রহ আমার জন্মের গতিনির্দেশক হতে পারে, কিন্তু কারণ হতে পারে না। এর কারণ অবশ্য আর কিছু আছে, যার জন্য আমার অশুভ জন্ম হচ্ছে। শাস্ত্র জীবের পূর্বজন্মের কর্মকেই ঐ কারণ বলেন। কেউ কেউ আবার বলেন, পিতামাতার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সন্তানে সংক্রমিত হয়। পিতামাতার রোগাদি পর্যন্ত সন্তান প্রাপ্ত হয়। অতএব পিতামাতাই পূর্বোক্ত বৈষম্যের (hereditary transmission) কারণ। উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তা হলে সন্তানের জন্মে পিতামাতার মানসিক শক্তির ক্ষয় হওয়া উচিত, কিন্তু তা হতে তো দেখা যায় না। আবার সামান্য-শক্তিশালী পিতামাতা হতে কখনো কখনো অদ্ভুতগুণসম্পন্ন সন্তান জন্মাতে দেখা যায়। উহাই বা কিরূপে হয়? শুদ্ধোদনের ন্যায় অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন; কিন্তু তাদের কারও না হয়ে রাজা শুদ্ধোদনেরই কেন বুদ্ধদেবের ন্যায় উদারহৃদয়, বাল্যকাল হতেই সমাধিমগ্ন সন্তান উৎপন্ন হল? ভগবান বুদ্ধ, ঈশা প্রভৃতি অবতার-পুরুষসকলের কথা ছেড়ে দিলেও মানবসাধারণের ভেতর ঐরূপ ঘটনা নিত্য হতে দেখা যায়। কোথা হতে ঐরূপ হয়? কার্য কারণ হতে অধিক শক্তিসম্পন্ন কখনই তো হতে পারে না, তবে কেন ঐরূপ হয়? দেখা যায় কর্মবাদেই কেবলমাত্র ঐরূপ প্রশ্নসকলের মীমাংসা পাওয়া যায়। মানবের প্রকৃতিই এরূপ যে, অন্যের উপর দোষারোপ করতে পারলে নিজের স্কন্ধে কখনও দোষ নেয় না। সেজন্যই সংসারে তার দুঃখ-কষ্ট পাবার কারণ-স্বরূপে সে হয় ভগবান, নয় গ্রহনক্ষত্র, নয় পিতামাতা ইত্যাদিকে নির্দেশ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে। স্বয়ং যে সে তার ঐরূপ কষ্টের কারণ, তা বলা দূরে থাকুক, একবার মনেও আনে না! শাস্ত্রই তখন তার চক্ষে অঙ্গুলিপ্রদান করে বলে, তোমার কষ্টের কারণ তুমি নিজেই, অপর কেউ নয়। কিন্তু তাতে ভয়ের কারণ নেই। যে শক্তিদ্বারা তুমি এই কষ্ট পাচ্ছ, তা দ্বারাই আবার তুমি উন্নত হতে পারবে। দুষ্কর্ম করেছ, তাতে ভয় কি? আবার চেষ্টা কর, অনন্ত শক্তি তোমার রয়েছে, তোমার এ অবস্থার নিশ্চিত পরিবর্তন হবে। বেদ বলেন, 'দ্রঢিষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী' পুরুষেরই ধর্মলাভ হয়। সাহস চাই, তেজ চাই; নির্জীব মন ও শরীরের

দ্বারা ধর্মলাভ হয় না। নির্ভীক হৃদয়ে - আবার চেষ্টা কর, কর্ম কর, ধর্মপথে নিশ্চয় অগ্রসর হবে।

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

কর্ম-রহস্য

নিঃস্বার্থ হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা না করে যে কর্ম করা যায়, তাকে কর্মযোগ বলে। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করলে সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ভোগ করতেই হবে। একটি কর্ম আবার অন্য কর্ম উৎপাদন করবে। এরূপে কর্মফলভোগ নিয়ত চলতে থাকবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি কর্ম করলেই তার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে কি মুক্তির সম্ভাবনা নেই? শাস্ত্র বলেন, আছে। নিষ্কাম হয়ে, নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম কর। কর্মফলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কর্ম কর; তা হলে আর কর্মফলে লিপ্ত হতে হবে না। বলতে পার, বাসনাশূন্য হয়ে কর্ম কি করা যায়? কোনো-না-কোনো বাসনা হতেই তো কর্মের জন্ম। ভগবদ্দর্শন করব, এটাও তো একটা বাসনা। উত্তরে যা পরমহংসদেব বলতেন তাই বলি, "ভগবদ্দর্শনবাসনা বাসনার মধ্যে নয়। যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।" অর্থাৎ মিষ্টান্ন-ভক্ষণের যে অপকারিতা, তা মিছরিতে নেই বললেই হয়। তবে কি কর্ম করাই দোষ? কর্ম কি তবে বন্ধনের উপর বন্ধন এনে মানুষের শ্রেষ্ঠতম জীবনোদ্দেশ্যের পথে নিয়ত বিঘ্ন-বাধাই নিয়ে আসে? শাস্ত্র বলেন—না, কর্মে কোন দোষ নেই। তবে আমরা যে ভাবে কর্ম করি, সেই ভাবানুযায়ী উহা গুণ ও দোষ-বিশিষ্ট হয়। কর্মে স্বভাবতঃই যদি দোষ থাকত, তবে অত্যাচারীর হস্ত হতে দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য নরহত্যা করেও মানুষ বীরাগ্রণী বলে পরিচিত হত না। অবলার প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষার জন্য লম্পটকে হত্যা করেও মানুষ আমাদের পূজনীয় হত না, অথবা দারিদ্র্যদুঃখ-কাতর সহৃদয় পুরুষেরা নিজ আত্মীয়বর্গের সুখ উপেক্ষা করেও সমাজে যশোভাগী হতেন না। ভগবৎপ্রসাদ লাভ করে জীবনের চরম সার্থকতা শেখবার ও শেখাবার জন্য আত্মীয়, সমাজ প্রভৃতি সমস্ত উপেক্ষা করে সন্ন্যাসিবর্গও আমাদের স্বার্থের শীর্ষস্থানীয় হয়ে থাকতেন না। অতএব দেখা যাচ্ছে হিংসা, হত্যারূপ কর্মও যখন স্বার্থের জন্য কৃত না হয়ে কোন এক মহদুদ্দেশ্যের জন্য সাধিত হয়, তখন কর্তা দোষভাগী হয় না।

অতএব কর্মে কোন দোষ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্ম ভাল বা মন্দ হয়ে থাকে—কর্মের স্বরূপে কোন দোষ নেই। অগ্নিতে রন্ধন ও গৃহদাহাদি উভয় কার্যই হচ্ছে, তাতে অগ্নির কোন দোষ নেই। সূর্যের প্রতিবিম্ব সকল জলে পড়ছে, কিন্তু জলের নির্মলতা-অনুসারে প্রতিচ্ছায়ার তারতম্য হয়ে থাকে, এতে সূর্যের কোন দোষ নেই। তবে কিরূপে কর্ম করলে দোষভাগী হতে হবে না? শাস্ত্র বলেন, যদি স্বার্থ

না থাকে এবং কর্মফলে আসক্তি না থাকলে সুখ বা দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হলেও কর্তার মন বিচলিত হবে না। সুতরাং তা আর বন্ধনের কারণ হবে না।

দেখা গিয়েছে, বাসনা হতেই কর্মের জন্ম। নিজ নিজ মনের দিকে দৃষ্টি করলে মনে নানা বাসনা রয়েছে দেখা যায়। এমন কি, মনটিকে বাসনাময় বা নানা বাসনার সমষ্টি বলে বোধ হয়। সমুদয় বাসনা দূর হলে মনের অস্তিত্ব থাকবে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। আবার দেখা যায়, বাসনার সকলগুলিই সমান তীব্র নয়। কোনটি 'এখনই সম্পন্ন হউক'—মনে এইরূপ হয়; কোনটি হলে ভাল, না হলেও ভাল, অপর একটি না হয় তো ভাল হয়—এইরূপ মনে হয়। এই প্রকারে মন ভিন্ন ভিন্ন বাসনা-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত দেখা যায়। বাসনাটি মনে উঠলেই আবার কার্য হয় না। একদিন, দুদিন, দশদিন উঠতে উঠতে একদিন মনে বলে—এটি না হলেই নয় এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহকে উহা যাতে সফল হয়, তদ্বিষয়ে নিয়োগ করে। ঐরূপ নিয়োগকেই আমরা সচরাচর কর্ম বলে থাকি। অতএব ঘনীভূত বাসনাই কর্মরূপে পরিণত হয়ে পুরুষকে সুখদুঃখরূপ ফল এনে দেয় এবং সেই সুখদুঃখময় কর্ম আবার অপর একটি সংস্কারের জনক হয়। মনে সঞ্চিত সূক্ষ্ম বাসনাসকলের নামই সংস্কার। ঐ সংস্কার সকলের সমান নয়, কারও কোনটি বাল্যকাল হতে প্রবল, কারও কোনো কোনো সংস্কার আদৌ নেই। কেউ বা সুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে আজীবন সৎকার্যই করে গেল, আবার অন্য কেউ কুসংস্কারচালিত হয়ে কুকার্য করে লোকের নিন্দাভাজন হয়ে গেল। কেউ বা বুদ্ধিমান, ধার্মিক, যশস্বী; কেউ বা তার ঠিক বিপরীত হল।

কোথা হতে সংস্কার এত ভিন্ন ভিন্ন হল? বাল্যকাল হতেই যখন কাকেও সৎ, কাকেও অসৎ দেখছি তখন বাসনা ঘনীভূত হয়ে সৎ বা অসৎ সংস্কাররূপে পরিণত হবারই বা সময় কোথায়? অথবা কর্ম ও সংস্কার যদি বৃক্ষবীজসম্বন্ধেই গ্রথিত ও প্রবাহিত হয়ে থাকে, তবে সে কর্মই বা কোথায়—যা শৈশবেও সংস্কাররূপে দেখা দিতে পারে? শাস্ত্র বলেন, পূর্বজন্মকৃত কর্মই বাল্যসংস্কাররূপে দেখা দেয়। পূর্ব জন্মের সৎ বা অসৎ অভ্যাস ইহজন্মের ভালমন্দ সংস্কাররূপে প্রকাশিত হয়। এই বাল্যসংস্কার-সমূহকে আমরা 'স্বভাব' কথায় বিপরীত অর্থ কল্পনা করে কখনো ভগবানে, কখনো সৃষ্টিকার্যে দোষারোপ করে থাকি। কখনো স্বভাব শব্দ কারণহীন অর্থে প্রয়োগ করি এবং কখনো বা কোন এক অদৃষ্ট অননুভূত কারণ, যার হস্তে মানুষ যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে রয়েছে, এরূপ অর্থে প্রয়োগ করি। এরূপে মানব কুসংস্কারভারবাহী ঘোরতর অদৃষ্ট-বাদী হয়ে বা কার্যকারণ-প্রবাহের মূলোচ্ছেদ করে, নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করে যথার্থ সত্য হতে বহুদূরে অপনীত হয়।

কর্মবাদ সত্য হলে পুনর্জন্মবাদও তার সঙ্গে অবশ্য সত্যরূপে উপস্থিত হয়। মৃত্যু-কালে আত্মা একদেহ হতে দেহান্তরে আশ্রয়গ্রহণ করেন। স্থূল দেহ পড়ে থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর সেই জন্মের সমুদয় সংস্কার নিয়ে তদুপযোগী দেহ গঠন করে। সেই নবীন দেহে তার পূর্বজন্মের কর্মফল আবার পরিস্ফুট হয়। আমরা দেখেছি, পিতামাতার দোষগুণ সন্তানের দেহ ও মন আশ্রয় করে। তার কারণ—সন্তানের কার্যফল, যে

পিতামাতা তাকে সেরূপ দোষ বা গুণযুক্ত সংস্কারসমূহ পরিস্ফুট হবার উপযোগী দেহ দিতে পারেন, সেইরূপ পিতামাতার নিকটেই তাকে আকর্ষণ করে। শাস্ত্র বলছেন, জোঁক যেমন এক পাতা হতে অন্য পাতা আশ্রয় করে, আমরা সেরূপ এক কর্ম হতে কর্মান্তর আশ্রয় করে থাকি। অতএব কর্ম এরূপে করতে হবে, যাতে ক্রমে নিম্নতর হতে উচ্চতর কর্ম অবলম্বন করতে পারা যায়। আবার জোঁক যেমন অপর একটি অবলম্বন গ্রহণ না করে পূর্ব অবলম্বন ত্যাগ করে না, সেরূপ এক কর্ম আশ্রয় না করে অন্য কর্ম ত্যাগ করা যায় না।

নীচ হতে উচ্চ কর্ম কিরূপে অবলম্বন করা যেতে পারে? মহৎ হতে মহত্তর উদ্দেশ্য অবলম্বন কর, দেখবে তোমার কর্মও উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। একেবারে সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য আশ্রয় করে কর্ম করতে পারছ না বলে হতাশ হয়ো না। ধীর দৃঢ়পদে অসীম সাহসে বুক বেঁধে শনৈঃ শনৈঃ ভগবানের প্রসাদ ও সাক্ষাৎকার-লাভরূপ জীবনের মহান উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হতে হবে।

আমাদের অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে, সংসারে থাকলে ধর্ম হয় না, ভগবান লাভ হয় না। সংসার কাকে বলে? যে বস্তু আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে দেয় না, তাই সংসার-নামে অভিহিত হয়। পূর্বজন্মকৃত যে-সকল সংস্কার আমাকে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, সর্বদা সত্যোদ্দেশ্য হতে বিচলিত করছে, তাই আমার সংসার। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সংসার বর্তমান রয়েছে। কারও কাম, কারও ক্রোধ, কারও ধনচিন্তা ঈশ্বরপথের কণ্টক। এরূপ বিশেষ বিশেষ সংসার হতে মনের গতি ফেরাতে কোন উচ্চ উদ্দেশ্য অবলম্বন করতে হবে। ঐরূপ করলেই যে কর্মস্রোত এতকাল নীচের দিকে যাচ্ছিল, তার বেগ ফিরে অন্য দিকে চালিত হবে এবং যা পূর্বে ঈশ্বরপথের প্রতিবন্ধক ছিল, তাই আবার ঈশ্বরপথের সহায় হয়ে দাঁড়াবে। সংসারে থেকেই ঐরূপ করতে হবে। আমাদের সকলেরই ভেতর মহাশক্তি বর্তমান রয়েছে, অজ্ঞানে আবৃত আছি বলেই আমরা তা বুঝতে পারছি না। শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপব্যয় না করে উচ্চতর পথে চালিত করতে হবে; তা হলে আমরা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে পারব। দেখা গিয়েছে, কর্মে কোন দোষ নেই; দোষ আছে কেবল যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কর্ম করি তাতে; কর্তব্যজ্ঞানে কর্ম কর, কর্মকে ভালবেসে কর্ম কর, ফলের দিকে লক্ষ্য রেখো না। তা হলে কর্ম আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবেই যাবে। ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপ খেলার ভেতর বন্ধনমুক্ত হবার, তাঁকে পাবার এই প্রণালী বিদ্যমান রয়েছে। এরূপে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হবে।

এরূপে কর্ম করলে কালে যথার্থ নিঃস্বার্থতা এসে উপস্থিত হবে। প্রশ্ন হতে পারে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হলে আর কি সে কোন কর্ম করতে পারে বা করে থাকে? শাস্ত্র বলেন, সমুদ্রবৎ গম্ভীর, সুমেরুবৎ স্থির নিঃস্বার্থ পুরুষ কেবল জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম করেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সমস্তই সাক্ষাৎ ভগবান জেনে তিনি সেই বিরাট পুরুষের সেবা করেন।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি কর্মই আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ পিতামাতার দ্বারা দেহ-

ধারণ করায়, তা হলে অবতারাদি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রপ্রমাণ আছে—যে তাঁরা পূর্ব পূর্ব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব পূর্ব বারের সহধর্মিণীই পুনরায় তাঁদের সহিত জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে এই নিত্যসম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হয়? ইহা কি সৃষ্টিপ্রণালীর একটি বিশেষ নিয়ম? কার্যকারণময় কর্মপ্রবাহের বেগ জগতের সর্বত্র ধাবিত রয়েছে, এর মধ্যে বিশেষ নিয়ম কিরূপেই বা সম্ভবে? আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করে ভগবান যখন মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেই অবতীর্ণ হন, তখন নিজের সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম প্রবর্তন করলে তাঁর শিক্ষাপ্রদানেরই বা সার্থকতা থাকে কোথায়? স্বল্পশক্তি ভিন্ননিয়মাধীন মানবই বা সে শিক্ষা নিতে পারবে কিরূপে? পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তো আমাদিগের নিত্যসম্বন্ধ বর্তমান নেই। তবে অবতারাদিসম্বন্ধে এরূপ হবার কারণ কি? এর উত্তর—অবতারপুরুষের সাঙ্গোপাঙ্গগণ তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসেছিল, সেইজন্য তারা তাঁর সহিত নিত্যসম্বন্ধ। আমরা স্বার্থের জন্য ভালবাসি। পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সকলকেই আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবেসে থাকি। স্ত্রীর সুখের জন্য যদি তাকে ভালবাসতাম, তা হলে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য হত। কিন্তু আমরা কি তা করি? ভালবাসার স্বরূপ স্বাধীনতা—দাসত্ব নয়, নিঃস্বার্থতা—সুখলালসা নয়। যখনি কাকেও যথার্থ ভালবাসবে, তখনি তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। তার সুখ দেখতে হবে, নিজের সুখ দেখলে চলবে না। কিন্তু আমরা কি করে থাকি? যা'দিগকে ভালবাসি তা'দিগকে আপনার অধীন করতে চাই। আমার কথা শুনবে, আমি যা ভাল বুঝি, তাকে তাই ভাল বুঝতে হবে। এরূপে তা'দিগকে ঘোরতর বন্ধনে বদ্ধ করতে যাই। এই জন্যই আমাদের সম্বন্ধ-বন্ধন নিয়ত ছিন্ন হচ্ছে এবং আমরা পরস্পর বিপরীত কেন্দ্রে উপস্থিত হচ্ছি। বিদ্যুৎ-আদি জড়শক্তিকে আয়ত্ত করতে গেলেও যখন তার স্বভাব, কার্যপ্রণালী প্রভৃতি বিশেষরূপে জেনে সেই উপায়ে অগ্রসর হতে হয়, তখন অনন্তস্বাধীনস্বভাব মনুষ্যমনকে কি তার স্বভাববিরুদ্ধ প্রণালীতে বশীভূত করে রাখতে পারা যায়? কোনো-না-কোনো দিন তার সেই বন্ধন অসহ্য হয়ে উঠবে এবং স্বভাবনিহিত নিদ্রিত শক্তি জাগরিত হয়ে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে।

আমাদের দেশে এইরূপ ভালবাসা এখন অত্যন্ত প্রবল। দাসত্ববন্ধনই এর অপর নাম। সেজন্য দেশেরও এত দুরবস্থা। শাস্ত্র বলেন, সমগ্র জগৎ এক সূত্রে গ্রথিত রয়েছে। সেইজন্যই একের অপকারে অপরের অপকার হচ্ছে। একের দোষে অপরে কষ্ট পাচ্ছে। অন্যের অমঙ্গল হলে আমাকেও তার জন্য কষ্ট পেতে হয়। এরূপ নিয়ম বর্তমান থাকতে অপরকে অধীন করে নিজে উচ্চ হবার চেষ্টা কখনই সিদ্ধ হতে পারে না। এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম জড় হতে চেতন পর্যন্ত সমগ্র জগতে মহাবেগে প্রবর্তিত রয়েছে। এক পরমাণু অপর হতে বিযুক্ত হতে চেষ্টা করছে। পৃথিবী সূর্য হতে এবং সূর্য সূর্যান্তর হতে পলায়ন করতে চেষ্টা করছে। চোর এই স্বাধীনতার প্রেরণায় যথার্থ পথ না জানায় চুরি করেছে, আবার সাধু মহাপুরুষেরা ঈশ্বরকৃপায় স্বার্থহীন বিশুদ্ধ ভালবাসাই এই স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ জেনে দিন দিন জীবনের মহান লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর

হচ্ছেন। এই স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামই মনুষ্যকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাচ্ছে এবং অবশেষে পূর্ণ জ্ঞানভক্তিতে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত করে অনন্ত শক্তির অধিকারী করে দিচ্ছে। এ স্বাধীনতালোপ জগতে কে কারই বা করতে পারে? স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, বন্ধু, গুরু প্রভৃতির সহিত যদি নিত্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ হতে চাও তো নিজের স্বার্থকে বলি দিয়ে তাদের সুখে সুখী হও। ভগবানের মূর্তি জেনে তাদের সেবায় রত থাক। জগতের যাবতীয় স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ও পুরুষকে দেবতা-জ্ঞানে দর্শন করতে চেষ্টা পাও এবং তাদের প্রতি তদ্রূপ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন কর।

এখন বেদান্তের বিবর্তনবাদের বিষয় কিছু বলে আজকার বক্তব্য শেষ করব। আমরা এই সৃষ্টিকায দুই দিক দিয়ে অবলোকন করতে পারি। মনুষ্যের দিক দিয়ে দেখলে আমরা সৃষ্টি, তার ক্রম, নিয়ম, শক্তি প্রভৃতি এবং পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, হিতাহিত প্রভৃতিকে সত্য বলে দেখতে পাই। কিন্তু যদি কল্পনাসহায়ে ভগবানের দিক হতে এই সৃষ্টি দেখবার চেষ্টা করি, তা হলে কি দেখি? সৃষ্টি ও সৃষ্টির ভেতরের কিছুরই বিদ্যমানতা দেখতে পাই না। কারণ সৃষ্টি তো সেই ভগবানেই রয়েছে। তিনি ছাড়া তো সৃষ্টিতে কিছুই অপর নেই। অতএব যদি কেউ কোন উপায়ে জগৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বরের ন্যায় দৃষ্টিলাভ করতে পারে, তবে সে আর কখনই জগৎকে আমাদের মত দেখতে পারে না। জগৎ দেখতে হলে আপনাকে জগৎ হতে অন্ততঃ কিছু ভিন্ন না করে উহা কখনও দেখা সম্ভবে না। অতএব যিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার সহিত সর্বতোভাবে একত্ব অনুভব করছেন, তার নিকট জগতের অস্তিত্ব নেই। এই শেষোক্ত অবস্থাই বেদান্তের বিবর্তবাদ নামে কথিত হয় এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হতে হলে জগতের অস্তিত্ব, পাপপুণ্য প্রভৃতি সমুদয় সত্য বলে মেনে নিয়ে বহুকাল কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান-যোগাদি দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করতে হবে। তবেই আমাদের পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণ একত্ববোধ এসে উপস্থিত হবে। সেই বাক্যাতীত অবস্থার এক্ষণে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

উপসংহার *

পূর্বে যে-সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আজ তার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করব, কারণ তা হলে সে-সকল বিষয় মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হবে। প্রথমে আমরা দেখেছি, বেদ কাকে বলে। বেদ অর্থে জ্ঞান—ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, যা তাঁর সহিত অনন্তকাল অবস্থিত রয়েছে। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, বেদ অনাদি। যদিও আমরা উহা পুস্তকাকারে লিখিত দেখতে পাই, কিন্তু এই পুস্তকের যা বিষয় তা

* এই বক্তৃতার বক্তা রামকৃষ্ণ মিশন সভায় তাঁহার বক্তৃতাসমূহের (বেদকথা, সৃষ্টি রহস্য, সাধন-নিষ্ঠা, কর্মের দ্বিবিধ রূপ ও কর্ম-রহস্য) সংক্ষেপে আলোচনাপূর্বক উপসংহার করেছেন।

তিনকালেই বর্তমান, তার আদি নেই। এই অনাদি জ্ঞান কখনো কোনও ভাগ্যবানের নিকট আবির্ভূত হয়। যাঁরা এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করেন, তাঁ'দিগকে ঋষি বলে। ঋষি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা। এই জ্ঞান কেবল যে বিশেষ কোন এক জাতির অথবা পুরুষের নিকটেই আবির্ভূত হয় তা নয়। ম্লেচ্ছাদি নীচজাতিসম্ভূত কোন কোন পুরুষেও কখনো ঐ জ্ঞানের আবির্ভাব দেখা গিয়েছে। আবার বেদে অনেক স্ত্রীলোকও ঋষি বলে কথিত হয়েছেন। সত্যকামাদি জারজ ব্যক্তিও ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ঋষি বলে অভিহিত হয়েছেন। এই জ্ঞান জাতি ও বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই নিকট উপস্থিত হতে পারে। পূর্বে বৈদিক কালে ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত ছিল বলে বোধ হয় না, ইহা গুণগত ছিল। আবার বেদের স্থলে স্থলে এরূপ উক্তও দেখা যায় যে, পূর্বে সকল মনুষ্যই একবর্ণভুক্ত ছিল। উহার কোন কোন স্থানে এরূপ কথাও আছে যে, পূর্বে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিল, পরে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা সম্ভব বলেও বোধ হয়। বেদের প্রাচীন অংশ ঋগ্বেদে দেখতে পাওয়া যায় যে, আর্যগণ পঞ্চনদের গুণগান করছেন এবং আপনাদের পূর্ব বাসস্থান অত্যন্ত শীতল বলে বর্ণনা করছেন। এই সময়ে তাঁরা নূতন দেশে এসে আদিম নিবাসীদিগের সহিত কখনো যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত হতেন এবং স্বভাবতঃ ধর্ম বা গুণানুসারে সকলেই একজাতিনিবদ্ধ ছিলেন। পরে ধর্মকার্যে ব্যাপৃত ও অধিকজ্ঞানসম্পন্ন হওয়াতে তাঁদের মধ্যে কতক লোক ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত স্বভাবপ্রেরিত গুণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, যজ্ঞোপাসনাদি কর্মানুসারেই হওয়া সম্ভব। কারণ গুণকর্মানুসারে জাতিবিভাগ চিরকালই জগতে বর্তমান রয়েছে ও থাকবে। কিন্তু জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির সহিত ক্রমশঃ তিরোহিত হবে। এই ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদি গুণ আবার ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। কোন জাতি ব্রাহ্মণত্বগুণসম্পন্ন, যেমন প্রাচীন আর্যগণ ছিলেন। আধুনিক ইউরোপীয় জাতিরা ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন। ইংরেজ জাতিতে বৈশ্যগুণের অধিক সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র কোন এক গুণকে অধিক প্রবল হতে দেখা যায়। বর্তমান কাল বৈশ্যগুণপ্রধান। বৈশ্যগুণহীন লোকের একালে অধোগতিপ্রাপ্তি হচ্ছে। যাদের ঐ গুণ প্রবল, তারাই উন্নত হচ্ছে। মহাভারতেও আমরা পূর্বোক্ত কথা দেখতে পাই যে, পূর্বে এক জাতি ছিল, পরে গুণকর্ম-ভেদে জাতিভেদ হয়েছে। ভগবান গীতায় বলেছেন, গুণ ও কর্মের বিভাগ দ্বারা আমি চারবর্ণ সৃষ্টি করেছি। অতএব সদ্‌গুণসম্পন্ন হলেই বেদে অধিকার হত এবং এখনো হওয়া উচিত। আমরা দেখেছি, বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা স্বর্গাদিলাভ হওয়ার কথা আছে। স্বর্গ অর্থে পৃথিবী অপেক্ষা কোন উচ্চতর লোক, যেখানে অধিককালস্থায়ী সুখভোগ করতে পারা যায়। কিন্তু এই সুখভোগের পর আবার মর্ত্যলোকে আসতে হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত দেবতাসকল—ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি এক একটি পদমাত্র। শাস্ত্রে দেখা যায়, কর্মদ্বারা উচ্চগতিপ্রাপ্ত হয়ে কেউ কেউ ইন্দ্রাদি হয়েছেন এবং সেই পদে কিছুদিন অবস্থান করে আবার তাঁর পৃথিবীকে পতন হয়েছে।

অতএব মনুষ্যমাত্রেই কর্মদ্বারা দেবত্বপদ লাভ করতে পারেন। বেদের কর্মকাণ্ড স্বর্গাদি লোক-লাভের উপায় বলে দেয়। কিন্তু ঐ সকল সুখও নিত্য নয়। সেজন্য মনুষ্য তাতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। তার প্রাণ নিত্য-বস্তুলাভের জন্য লালায়িত। বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সেই নিত্য পদার্থের বিষয়ই বর্ণিত আছে। আমরা দেখেছি শাস্ত্রে সৃষ্টিকে অনাদি বলেছেন। অন্যান্য ধর্মে সৃষ্টির আদি আছে, এরূপ কথা বলে। বলে, এমন এক সময় ছিল যখন সৃষ্টি আদৌ ছিল না। ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন। কিন্তু বেদ তা বলেন না। সৃষ্টির আদি আছে বললে ভগবানে বৈষম্য ও নির্ঘৃণ্য-দোষ এসে পড়ে। জগতের এই বিষমতা দেখছি—কেউ পণ্ডিত, কেউ মূর্খ, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী ইত্যাদি, সৃষ্টির আদি থাকলে ঈশ্বর তার কারণ হন এইং তাঁকে পক্ষপাতিত্ব দোষের ভাগী হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁকে নিষ্ঠুরও বলতে হয়। সৃষ্টি অনাদি হলেও সৃষ্টির বিকাশাবস্থা চিরকাল থাকবে না। শাস্ত্র বলেন, কখনো প্রকাশিত এবং কখনো লুপ্তাবস্থায় থেকে বীজ হতে বৃক্ষ ও পুনরায় বৃক্ষ হতে বীজের ন্যায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ সৃষ্টির ঐ দুই ভাব অনাদিকাল হতে প্রবাহিত রয়েছে। যেমন ক্ষুদ্রতম বীজ হতে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আবার সেই বৃক্ষ কালে বীজে পরিণত হয়, সেরূপ সৃষ্টজগৎ কখনো বীজরূপে ও কখনো প্রকাশরূপে বর্তমান রয়েছে। ইহা ভগবান হতে নির্গত, ভগবানেরই অংশ, তাঁ হতে ভিন্ন নয়। গীতাদি শাস্ত্রেও দেখা যায়, ভগবান বলছেন—জগৎ আমার এক অংশমাত্র। যদি সৃষ্টি অনাদি হল, তবে এই বৈষম্যের কারণ কি ? শাস্ত্র বলেন, এই বৈষম্যের কারণ কর্ম। সুতরাং কর্মও অনাদি। আমাদের সকলকেই কর্ম করতে হচ্ছে। কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না। কর্মের সহিত তার ফল, নিত্যসংযুক্ত হয়ে রয়েছে। কর্ম করলে তার ফলভোগ করতেই হবে ; তবে মুক্তি কিরূপে সম্ভবে ? নিষ্কামভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করলে কর্মফলে লিপ্ত হতে হয় না এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা সমগ্র বন্ধন নাশ করে দেয়। একেই কর্মযোগ বলে। এক কথায় বলতে গেলে স্বার্থশূন্য হওয়াই ধর্ম। কি কর্মযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি জ্ঞানযোগী, সকলেই নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করছে। কেউ 'আমি আমি' করে, কেউ বা 'তুমি তুমি' করে পূর্ণ নিঃস্বার্থতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সকলেই ছোট স্বার্থপর 'আমি'-জ্ঞান ভূমা মহান্ 'আমি'তে ডুবাতে চেষ্টা করছে। কেউবা সর্বভূতে সেই এক আত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'রে সেই মহান্ 'আমি'কে সকলের ভেতর দেখতে চেষ্টা করছে। অপর কেউ ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানকেই সর্বত্র দেখতে চেষ্টা করছে। বুঝে দেখলে দুই পথের উদ্দেশ্য একই বলে প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখেছি, কর্মে কোন দোষ নেই। কর্মের ভাল-মন্দ গুণ আমাদের নিজের মনোগত ভাব বা উদ্দেশ্য নিয়ে হয়ে থাকে। আমরা যখন যে ভাবে কার্য করি, আমাদের ঐ কার্য তখন সেই ভাবানুসারে আমাদিগকে উন্নত বা অবনত করে ভাল বা মন্দ বলে প্রতীয়মান হয়। একটি কার্য আশ্রয় না করে আমরা অন্য একটি কার্য পরিত্যাগ করতে পারি না। নীচ কর্ম পরিত্যাগ করে উচ্চতর কর্ম গ্রহণ করতে আমাদিগকে সর্বদা উদ্‌যুক্ত থাকতে হবে। তা হলেই ক্রমে নিঃস্বার্থ হতে পারব। যে ঘোর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, সে বিবাহ করে এক স্ত্রীতে

মন নিবদ্ধ রাখলে তার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাই হবে, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবাহ তদ্বিপরীত স্বার্থপরতাবুদ্ধিরই পরিচায়ক হবে। অতএব একের পক্ষে যা নিঃস্বার্থ কর্ম, অপরের পক্ষে আবার স্বার্থপর কর্ম। যে যে অবস্থায় অবস্থিত তার সম্বন্ধে যা ঈশ্বরপথে অগ্রসর হবার প্রতিবন্ধকতা করে, তাই তার সম্বন্ধে সংসার। সেই সংসার তাকে ত্যাগ করতে হবে। কারও কাম, কারও ক্রোধ, কারও বা ধন ঈশ্বর-পথের কণ্টক, তাকে তাই পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পরিত্যাগ করতে হলে পূর্বে আর এক উচ্চতর বিষয় অবলম্বন করতে হবে। এরূপে ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতর অবস্থায় উঠতে হবে, নিঃস্বার্থ হবার জন্য চেষ্টা করতে হবে, এরূপে কালে সকলেই আমরা এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হব, যখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে কার্য করতে পারব। আমরা দেখেছি, পূর্ব পূর্ব জন্মের কার্যানুসারে মানব পর পর জন্মে উন্নতাবনত দেহাদি প্রাপ্ত হয়। পূর্বকৃত কর্মসমূহ দ্বারা মনুষ্য এরূপ পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, যাঁরা তাকে ঐরূপ দোষ বা গুণযুক্ত দেহাদি প্রদান করতে পারেন। সেজন্য আপাততঃ দেখলে সন্তানের দোষ-গুণ অনুক্রামিত হওয়ার কারণ পিতামাতাই বলে বোধ হয়, কিন্তু তা নয়; বাস্তবিক সন্তানের কর্মই স্বরূপ পিতামাতাকে অন্বেষণ করে নেয়। প্রশ্ন হতে পারে—কর্ম করবার শক্তি কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আমরা দেখেছি, এই দৃষ্ট স্থূল ব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট দেহ। আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র দেহ বিরাটেরই অংশমাত্র। সেইরূপ আমাদের মনসমূহও সেই বিরাট মনের অংশমাত্র। অতএব শরীর ও মনের পুষ্টি সেই বিরাট শরীর ও মন হতেই নিত্য হচ্ছে। আহার ও নিঃশ্বাসের দ্বারা আমরা শরীরে যা গ্রহণ করি, তা সেই অনন্ত বিরাটেরই অংশ। আমরা না জানলেও আমাদের মনের পুষ্টিও সেরূপ বিরাট মন হতেই হয়ে থাকে। নূতন জল যেমন আবর্তে আসছে ও যাচ্ছে কিন্তু আবর্ত একই রূপ দেখছি, সেইরূপ দেহ ও মন একই রূপ দেখতে থাকলেও বিরাট দেহ ও মন হতে তাদের উপাদান আমরা অবিরত গ্রহণ করছি। এজন্য শাস্ত্র বলেন, ভগবানের অনন্ত শক্তি সকলেরই অন্তরে নিহিত রয়েছে। তাঁ হতেই আমরা নিজ নিজ শক্তি গ্রহণ ও বিকাশ করছি। এ শক্তির অপব্যয় না করে উহাকে উচ্চ হতে উচ্চতর কার্যে নিযুক্ত করতে পারলেই জীবনের মহান্ লক্ষ্যে আমরা উপনীত হতে পারব।

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, ২৫শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৮৯৮)

আপ্তপুরুষ ও অবতারকুলের জীবনানুভব

বেদই হিন্দুর জাতীয় ধন, হিন্দুর আচার ব্যবহার বিশ্বাস আস্তিক্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের ভিত্তি। ইহকালে সে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে অন্য সকল দেশের, অন্য সকল জাতির, অন্য সকল ধর্মের আচারাদি অগ্রাহ্য করে থাকে এবং দেহাবসানে মৃত্যুর

মোহান্ধকার এসে যখন ইহ-জগতের চিরপরিচিত সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, যশ-অপযশ প্রভৃতি দ্বন্দসমূহের একপ্রকার সাময়িক সমতা এনে দেয়, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত কল্পনায় করালায়িত পরকালের ছবি দেখতে সে বেদোক্ত বিশ্বাস ও শিক্ষাসহায়েই আশায় নির্ভর করে 'তপ্তা বৈতরণী'তে ঝম্প প্রদান করে।

বলা যেতে পারে, একথা কিরূপে সত্য হতে পারে? কোথায় সে আহুতি-সমুত্থিত পর্জন্যপ্রসবকারী যজ্ঞীয় ধূম? কোথায় সে গোমেধ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহ? কোথায় সে সোমরসপানে অর্ধনিমীলিতনেত্রে যজমান-কল্যাণকারী মিত্র মরুৎ পূষণ ভগ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণ? কোথায় সে সত্যনিষ্ঠ অপ্রতিগ্রাহী ক্রিয়াপ্রাণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ? কাল-রাত্রির গভীরান্ধকারে এরূপ লুক্কায়িত যে, কোন কালে তাঁদের অস্তিত্ব ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দিহান হতে হয়।

উত্তরেও বলা যেতে পারে, যুগবিপর্যয়ে পরিবর্তনের খরস্রোত ঐ সমস্ত পুনঃ পুনঃ ভেঙ্গে অভিনব রূপ এবং ভাবে গড়লেও মধ্যে মধ্যে এমন নিদর্শনও রেখে গিয়েছে, যা দ্বারা বেশ বোধ হয়, হিন্দুর আচার-ব্যবহারাদি পূর্ব পূর্ব যুগানুষ্ঠিত আচারাদির উপর ভিত্তিস্থাপন করেই দণ্ডায়মান। একটির অপরটির সহিত সাদৃশ্য—বর্তমান বংশধরের অতিবৃদ্ধ পিতামহাদির সহিত জাতি, বংশ এবং গুণগত সাদৃশ্যের ন্যায়। বর্তমান ভাষার সহিত পূর্বকার ভাষারও ঠিক সেই সম্বন্ধ। প্রাচীন তত্ত্বসকল দিন দিন যতই আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততই একথা চিরসুদূর মরীচিকার রাজত্ব হতে, ইন্দ্রিয়োপলব্ধ প্রত্যক্ষ রাজ্যের নিকট হতে নিকটতর হচ্ছে।

অতএব হিন্দুর সর্বপ্রকার আশা-ভরসার স্থল যে বেদ, একথা স্বতঃই প্রমাণিত। আমরা উৎকৃষ্টই হই বা পৃথিবীর অপরাপর জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্টই হই, আমাদের জাতীয়ত্বের মূল ঐ বেদেই রয়েছে। ঐ বেদ নিয়ে আমরা পূর্বে উঠেছিলাম এবং যদি আবার উঠতে হয়, তা হলে ঐ মূলাবলম্বনেই উঠতে হবে।

বৃক্ষশরীর হতে নিত্যবিগলিত শুষ্ক পত্ররাশির ন্যায় ধর্মশরীর হতে নিয়ত পরিত্যক্ত আচাররাশির কথা এখন দূরে থাক। ধর্মশরীরে যে অংশগুলি যুগে যুগে একরূপ থাকে, তাই চিরকাল আমাদের জাতীয়ত্বের মূলে রয়েছে ও থাকবে এবং ঐ মূল কোনরূপে বিনষ্ট হলে আমাদের জাতীয় জীবনও চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হবে। মনে কর, হিন্দুর সমাধি-অবলম্বনে জ্ঞানের উচ্চ ভূমিতে আরোহণে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য-অবলম্বনে ভোগসুখ এবং বংশবিস্তারে ব্যয়িত শক্তির মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহে এবং ঐ উপায়ে ইহ জীবনেই মনুষ্যের দেবত্বপ্রাপ্তি-বিষয়ক ধারণা, আত্মসংযমেই জাতিগত এবং ব্যক্তিগত পুরুষার্থ, ত্যাগের অমৃতত্বলাভ, আত্মার পূর্ণত্ব, অব্যয়ত্ব ও অবিনাশিত্ব, কর্মফলের অবশ্যম্ভাবিত্ব প্রভৃতি বিশ্বাস-নিচয়, যা বৈদিক যুগ হতে এখনও পর্যন্ত সমভাবে বংশ হতে বংশানুগত হয়ে প্রবাহিত রয়েছে, সে সকলের লোপ হলে আমাদের জাতীয়ত্ব বা অপর জাতি হতে পার্থক্য আর কোথা থাকবে? এবং ঐরূপ হলে সমগ্র ধর্ম-শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের অস্তিত্বেরও লোপ হবে না?

প্রশ্ন হচ্ছে, এখন বেদের বেদত্ব কি নিয়ে? কোন্ শক্তিপ্রভাবে উহা সমগ্র হিন্দুমনে

আবহমানকাল ধরে এই অদ্ভুত প্রভুত্বস্থাপন করে বর্তমান ? যোগিজননিষেবিত মুক্তি-অলক্তক-রঞ্জিত কমনীয় শ্রুতিপদে কেনই বা সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত প্রভৃতি অশেষ সম্প্রদায়ের ভক্তিনম্রশিরসমূহ সর্বদা নত রয়েছে ? কেনই বা নিরীশ্বরবাদী কপিলাদি মহামুনিগণ স্বকীয় প্রতিভাপ্রভাবে সকল বিষয় অতিক্রম করে বেদের প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ হন নাই ? এর নিশ্চিত কোন গূঢ় কারণ আছে ; কোন অপূর্ব সর্বজন-মিলনভূমি সাধারণ সত্য আছে, যা প্রত্যক্ষ করেই সেশ্বর নিরীশ্বরাদি অতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ীরাও এককালে একবাক্যে এর প্রভুত্ব স্বীকার করেছেন। সেটি কি ?

হিন্দুর বিশ্বাস, বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্যরচিত নয়—পুরুষনিঃশ্বসিত অর্থাৎ জগৎকর্তা ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অতএব নিত্য অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাদি কাল-জয়েরও পূর্ব হতে ঈশ্বরের সহিত সদা বর্তমান, ঈশ্বরের স্বরূপবিশেষ। বেদরাশিলিপিবদ্ধ জ্ঞান ঐশ্বরিক জ্ঞানের মানববুদ্ধিগ্রহণযোগ্য আংশিক বিকাশমাত্র। অতএব ঐশ্বরিক জ্ঞানকে যেমন ঈশ্বরের স্বরূপ হতে কখনও ভিন্ন করা যায় না, সেরূপ বৈদিক জ্ঞানও তা হতে অভিন্ন—তাঁর স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বেদের অপরটির নাম আপ্তবাক্য অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অবাঙ্‌মনসোগোচর ঈশ্বরস্বরূপ, সমাধি-অবলম্বনে সর্বোচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করে যাঁরা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের বাক্য বা শিক্ষা।

ভারতের সকল দার্শনিকেরাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সমাধিই সত্যলাভের একমাত্র পথ। সমাধির সাধারণ অর্থ চিত্তের একাগ্রতা। এই চিত্তের একাগ্রতার আবার তারতম্য আছে। সেই তারতম্য-অনুসারে মহামুনি পতঞ্জলি সমাধির সবিকল্প ও নির্বিকল্প—এই দুই বিভাগ করেছেন। অপরাপর বিষয়ক চিন্তাপ্রবাহসমূহকে তৎকালের নিমিত্ত তিরোহিত বা স্থগিত করে এক বিষয়ক চিন্তাপ্রবাহে মন কেন্দ্রীভূত হলে তাকে সবিকল্প সমাধি বলা যায়। মনের এই অবস্থায় যে বিষয়ক চিন্তাতরঙ্গে মন কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সেই বিষয়ক সত্য উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কবিত্ব, শিল্প, ঔষধ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অদ্যাবধি যে সকল সত্য আবিষ্কৃত করা হয়েছে বা হচ্ছে, তা ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষাসহায়ে মানবমনের তত্তৎ বিষয়ে ঐরূপ কেন্দ্রীভূত হবার ফলে ধর্মবিষয়ক সত্য উপলব্ধি করতে যেমন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন, ঐ ঐ বিষয়েও তদ্রূপ। কেবল ধর্মবিষয়ে ধর্মসংক্রান্ত পদার্থনিচয়ের উপর এবং ঐ সকল বিভিন্ন বিষয়ে তত্তৎ বিভিন্ন বিভিন্ন পদার্থসমূহ নিয়ে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করতে হয়, এই মাত্র ভেদ। রাসায়নিক তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হয়ে নাম জপাদি করলে হবে না বা ধর্মবিষয়ক তত্ত্বের উপলব্ধি নিমিত্ত যন্ত্রসহায়ে পদার্থনিচয়ের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণাদিতে নিয়ত রত থাকলে চলবে না। ইত্যাদি।

সবিকল্প সমাধি নানাভাব নানাবিষয় নিয়ে নানাপ্রকারের হলেও নির্বিকল্প সমাধি একই প্রকার। উহাতে একবিষয়ক চিন্তাতরঙ্গপরম্পরা না থেকে কেবলমাত্র একটি চিন্তা বর্তমান থাকে এবং গাঢ়াবস্থায় তারও জ্ঞান থাকে না। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, যা মানবমনের প্রত্যেক উপলব্ধির দৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ, তাও একত্র মিলে যায় এবং

এক ব্যতীত অন্য পদার্থের জ্ঞানাভাবে একের জ্ঞানও তিরোহিত হয়ে যায়। একেই যোগীর নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ হয়ে সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করে অবস্থান বলে। তখন শরীর জড়বৎ ইন্দ্রিয়াদির স্ব স্ব ব্যাপারশূন্য, মনবুদ্ধি এককালে স্তব্ধ এবং জগতের কোলাহল সুদূরপরাহত হয়ে থাকে।

ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের দার্শনিকেরা উক্ত সমাধি-অবস্থায় শরীরেন্দ্রিয়াদির জড়বৎ অবস্থিতি এবং কোন কোন শারীরিক রোগবিশেষের সহিত বাহ্যিক সৌসাদৃশ্য দেখে উহাকে মানবসাধারণের চৈতন্যাবস্থা হতে নিম্নভূমির অবস্থা বলে স্থিরসিদ্ধান্ত করেছেন। চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডিতসমূহের যখন এরূপ ধারণা, তখন ভোগলোলুপ সকাম কর্মৈকপ্রাণ সাধারণ পাশ্চাত্ত্য মানব যে উক্তাবস্থালাভ ভীতির চক্ষে দেখবে বা কারও উক্তাবস্থার বিন্দুমাত্র লাভ হলে তাকে দয়ার পাত্র বিবেচনা করবে, এতে আর আশ্চর্য কি ?

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে ভ্রমণকালে বর্তমান লেখককে নিত্য এই প্রশ্নের বারবার উত্তর দিতে হত যে, প্রাচ্যদর্শননিবিদ্ধ সমাধি-অবস্থা জড়াবস্থা নহে বা গাছ-পাথরের মত হয়ে সুখ-দুঃখের হাত অতিক্রম করা নহে, এবং জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতার ভেতর দিয়ে যে জ্ঞান চৈতন্যের স্ফূর্তি হয়, তা ঐ তিনের একত্র মিলিতাবস্থায় অনুভূত জ্ঞান-চৈতন্যের অপেক্ষা সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট ; এবং এখনও পর্যন্ত ঐ অবস্থা কোন কোন ভাগ্যবান ভারতে লাভ করে থাকেন ; এবং জড় হওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের ভিতর দিয়ে পূর্বাপেক্ষা সর্বতোমুখী অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হয়ে জগতের যাবতীয় ধর্মের সত্যতা-সম্বন্ধে এবং জ্ঞানের চরম সীমায় অদ্বৈতবোধে উপনীত হওয়ার সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু চির সংস্কারের প্রবল প্রভাবে সে-কথা ধারণা হবে কেন ? আবার পরদিন সেই ব্যক্তিই পুনরায় সেই প্রশ্নের সমুত্থান করত। একদিন একজন দার্শনিক বন্ধু সমাধি এবং অদ্বৈতবোধ-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে এবং অনেক তর্কবিতর্ক করে পরিশেষে বলেছিলেন, "তুমি যা বলছ তাতে ভ্রম-প্রমাদ কিছুমাত্র নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে ঐরূপ সমাধিস্থ পুরুষ একজনও জন্মে না। সেজন্যই আমাদের ওকথা হৃদয়ঙ্গম হওয়া এত কঠিন।" শুনে মনে হল, সত্যই বটে। চিরপদদলিত ভারত এ বিষয়ে সকল দেশাপেক্ষা এখনও ধনী। জড়বাদ, সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদাদি চার্বাক-মতসকল চূর্ণ করে যথার্থ ধর্মালোক দিবার শক্তি ভারতের রয়েছে। ভারতই তা পূর্বে অপরাপর দেশবাসীকে দিয়েছে এবং এখনও মুক্তহস্তে ঐ ধন বিতরণ করে স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করবে। নিরাশায় আশার সঞ্চার হল। মনে হল, দরিদ্র এবং বিজিত হলেও আমাদের এ বিষয়ে কেউ পরাজিত করতে সমর্থ হয়নি। আমাদের ধর্মবীরগণেরই পদপ্রান্তে নত হয়ে এই অপূর্ব আলোক সকল দেশবাসীকে নিয়ে যেতে হবে।

অকুতোভয় হিন্দু দার্শনিক অপরিবর্তনীয় দেশকালাতীত সর্বকরণ-কারণ নিত্য সত্যের উপলব্ধি পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা অসম্ভব দেখে 'মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ' রূপ তীর্থবর্যা মণিকর্ণিকার অনুসন্ধানে নির্গত হলেন এবং তদাবিষ্কারে স্বয়ং ধন্য হয়ে অপর সাধারণকে কৃতার্থ করলেন। সমাধি-অবলম্বনে উপলব্ধি করলেন যে, মানবসাধারণের

সসীম জ্ঞান ও চৈতন্য, দেশকালাতীত এক অসীম জ্ঞান-চৈতন্যের আপেক্ষিক বিকাশমাত্র এবং আরও উপলব্ধি করলেন যে, সেই জ্ঞান-চৈতন্যের আরও নিম্নভূমির বিকাশ রয়েছে গোমহিষাদি পশুসমূহে, তরুগুল্ম-লতাদিতে এবং সব চাইতে জড় বলে যাদের সম্বন্ধে মানবের ধারণা, ধাতুলোষ্ট্রাদি পদার্থনিচয়ে। অনন্তভাবে বিভক্ত জগৎ তখন তাঁর চক্ষে এক নতুন আলোকে আলোকিত ও প্রতিভাসিত হল এবং 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' পদার্থের উপলব্ধি ক'রে তিনি শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হলেন। কামকাঞ্চনপ্রসূত গাঢ় অমানিশার অন্ধকারে সংযতেন্দ্রিয় সুসারথি তিনিই একমাত্র জাগ্রত রইলেন এবং মোহমুগ্ধ অপর জনসাধারণকে জাগ্রত করবার জন্য অভয় আশ্বাসবাণী প্রদান করলেন। ইন্দ্রিয়াদির অতীত পদার্থ দর্শন করেই তিনি ঋষি হলেন এবং দেশকালাতীত পূর্ণানন্দ পরম-ধামের সাক্ষাৎ সত্য সংবাদ দেওয়াতেই তাঁর বাক্য বেদ অথবা ঐশ্বরিক জ্ঞান বলে প্রসিদ্ধ হল।

প্রশ্ন হতে পারে, সমাধিসহায়ে উপলব্ধ বিষয় যে মস্তিষ্কের ভ্রমমাত্র অথবা রোগবিশেষ নহে, তার প্রমাণ কি? উত্তরে বলা যায়, সমাধিলাভের পূর্বে তোমার যেরূপ জ্ঞান, সংযম, ইচ্ছাশক্তি, সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ছিল, সমাধিলাভের পর যদি সেই সকলের বিন্দুমাত্র হ্রাস না হয়ে শতগুণে বৃদ্ধি দেখতে পাও, তা হলে ঐ অবস্থাকে কি বলতে চাও? তারপর শান্তি—যে শান্তির জন্য নানা প্রকার অভাবপূরণের দিবারাত্র ছুটাছুটি করেও পূর্ণমাত্রায় কখনও পাচ্ছে না, সেই শান্তি যদি তোমার সদা সর্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তা হলে সে রোগবিশেষ যে প্রার্থনীয়!

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, বেদ-পুরাণাদি জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ যেন কোন জিনিসের—যথা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্নাদির—তালিকাবিশেষ। যদি তুমি সেই পদার্থের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত থাক, তা হলে মিলিয়ে নিতে পার, সেই পদার্থের কোন্ কোন্ রূপের সহিত তোমার পরিচয় হয়েছে এবং কোন্ কোন্ রূপের সহিত বা হয়নি। তখন যে যে রূপের উপলব্ধি হয়নি, তাদের যাতে উপলব্ধি হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করতে পার। অতএব বেদ যে শুদ্ধ সমাধি-অবস্থার উপলব্ধিসমূহ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করে জগৎপূজ্য হয়েছেন তা নয়, কিন্তু ধর্মরাজ্যের নিম্নাৎ নিম্ন স্তর হতে সর্বোচ্চ স্তরের চরমসীমা নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত উঠবার কালে সাধক মানবের শরীর এবং মনে যেরূপ পরিবর্তন, অনুভব এবং তৎফলস্বরূপ ধর্মমত, আস্তিক্য ও বিশ্বাসাদি এসে উপস্থিত হয়, জগতের কল্যাণের জন্য তৎসমুদয়ও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে আমাদের লাভালাভ কি? মনুষ্যমাত্রকেই ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হতে গেলে ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, নানাপ্রকার মতে সত্য বলে বিশ্বাস, নানাপ্রকারের ধারণা, বহির্জগতের নানাপ্রকার পদার্থ সাহায্যের জন্য অবলম্বন প্রভৃতির ভেতর দিয়ে গমন করে নিত্য পদার্থ লাভ করতে হবে। ভেতরের ও বাইরের এই সকল পরিবর্তন বৃক্ষবিশেষের প্রতিপত্রে রূপের ন্যায় প্রতিমানবের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন হলেও সাধারণতঃ সর্বকালেই একরূপ থাকবে। কারণ, এই সৃষ্টির নিয়ম—বহুর মধ্যে একের বিকাশ, একের অনুস্যূততা—যা হতে মানবীয় সর্বপ্রকার জ্ঞান সম্ভবপর হয়েছে। অতএব

তোমার অনুভূত বিষয়সকলের সহিত পূর্ব পূর্ব ঋষিগণ-অনুভূত এবং বেদাদিধর্মগ্রন্থনিবদ্ধ অনুভবের যদি সমতা পেতে থাক, তা হলে নিঃসন্দিহান চিত্তে তুমি স্বীয় পথে অগ্রসর হয়ে উদ্দেশ্যলাভে কৃতকৃতার্থ হবে।

ধর্মপথে অগ্রসর হতে সাধকশরীরমনে যে কি আমূল পরিবর্তন এসে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয়, তা পূর্ব পূর্ব বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষিগণ, ঐতিহাসিক যুগের সিদ্ধ ও সাধকগণ এবং বর্তমান কালের ধর্মবীরগণের জীবনী-আলোচনায় বিশেষ উপলব্ধি হয়। নচিকেতার যমসদনে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ, সত্যকাম জাবালের অগ্নি-উপাসনার ফলে আচার্যত্বপ্রাপ্তি, মিথিলাধিপতি জনকরাজের রাজ্যশাসন করতে করতে বিদেহত্ববোধ ইত্যাদি, সিদ্ধপুরুষোপলব্ধ অনুভবের ভেতর অথবা পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্করের হৃদয়ে কিশোর কালেই অদ্বৈতবোধস্ফূর্তি এবং তৎপরে ধীরে সেই জ্ঞান অপরকে প্রদান করবার শক্তিবিকাশ, মহামতি ঈশার চল্লিশ দিন উপবাস, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গয়াধামে শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন হতে ধর্মশক্তি-প্রকাশ এবং বর্তমানকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-শরীরে দ্বাদশ-বৎসর কঠোর তপস্যাদির পর অদ্ভুত ধর্মসমন্বয়শক্তি-বিকাশাদির ভেতর তত্তৎ জগদ্গুরুর মহান্ হৃদয়ে কত দেবাসুরের সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়, কত উদ্যম, আশা ও নিরাশা, কত আনন্দ ও বিরহ, কত যুগান্ত-পরিবর্তনের পর চিত্তের সমতাবস্থালাভ এবং তৎসঙ্গে তত্তৎ দেবপ্রতিম শুদ্ধসত্ত্ব শরীরে কত অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছিল, তার ইতিহাসের কত-টুকু আমরা পেয়েছি বা রাখতে পেরেছি? যতটুকু রাখতে পেরেছি, তারজন্য জগৎ আজ কত ধনী, কত ধন্য হয়েছে; আবার সেই ইতিহাসের অধিকাংশই কি ভারতের ধর্মগ্রন্থে নেই? জগৎ জুড়ে একটা রব উঠেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস পাওয়া যায় না, ইতিহাস লিখতে ভারতের লোক জানত না! আরে মূর্খ! রাম শ্যামকে মেরে রাজা হল, তৎপরে রামের দশটি সন্তান হল, তিনি বিশ বৎসর রাজত্ব করলেন অর্থাৎ কতক-গুলি আইন চালালেন, কাকেও পুরস্কার এবং কাকেও বা দণ্ড দিলেন, খেলেন, শুলেন, বিবাদ করলেন, আনন্দ করলেন, কষ্ট সইলেন এবং মরলেন—এই কি তোমার ইতিহাস? এ ইতিহাস রইল বা না রইল, তাতে জগতের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? কিন্তু ইতিহাস-অর্থে যদি—যে-সকল মহাপুরুষের চিন্তাস্রোত সমগ্র দেশবাসীর মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাদের নূতন ভাবে গড়েছে, যে-সব মহান্ হৃদয়ের ভালবাসা আপামর সাধারণ মানবকে নিঃস্বার্থ হতে শিখিয়েছে, যে-সকল মহৎ চরিত্রের আদর্শ দেশবাসীর চক্ষের ভেতর দিয়ে হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করে প্রস্তরাঙ্কিত মূর্তিবৎ চিরজাজ্বল্যমান রয়েছে—সেই সকল মহাপুরুষের প্রাণের উপলব্ধির ইতিহাস হয়, তা হলে ভারতই যে তা বিশেষভাবে রেখেছে। তা হতেই কি বর্তমান যুগে জাগতিক ধর্মজ্ঞান বুঝবার বিশেষ সহায়তা হচ্ছে না?

উন্নতোদার চিন্তাতরঙ্গপরম্পরা হৃদয়ে ধারণ করতে করতে মানব-শরীরমনে যে বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাতে আশ্চর্য নেই। বর্তমান যুগের সকল পণ্ডিতই উহা একবাক্যে বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞানচর্চা যতই অধিক হচ্ছে, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হচ্ছে এবং তৎফলস্বরূপ জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশসমূহে অপূর্ব অভিনব

উপায়ে মনোবিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়েছে। ইহার নাম পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান বা experimental psychology. প্রত্যেক মানসিক পরিবর্তন বা ভাবের এক এক শারীরিক অনুরূপ এবং প্রত্যেক শারীরিক পরিবর্তনের সহিত চিরসম্বন্ধ এক এক মানসিক প্রতিকৃতি বের করাই এর উদ্দেশ্য। একজন বন্ধু বলেছিলেন—ঔষধ, রাজনীতি এবং ধর্ম, এদের মা-বাপ নেই ; বয়স হলে সকলেরই আপনা-আপনি হয়, যত্ন করে শিক্ষা করতে হয় না। কোনস্থানে ঐ তিন বিষয়-সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন যদি উপস্থিত হয়, তো সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই ঐ প্রশ্ন সিদ্ধান্ত করে দিতে অধীর হবে। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এতদিন ঠিক ঐরূপ ছিল—বিশেষতঃ অপরাপর দেশে। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের চর্চা যতই দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে, ততই কল্পনার আলোকান্ধকার মিশ্রিত ভ্রান্তছায়া মনোবিজ্ঞানের অধিকার হতে দূরাপসৃত হয়ে মানসিক গঠন এবং কার্যপ্রণালীর যথাযথ তত্ত্বসমূহ যথার্থ আলোকে আলোকিত হচ্ছে এবং মনোবিজ্ঞান যথার্থ বিজ্ঞানপদবাচ্যত্ব লাভ করে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অন্যান্য শাস্ত্রনিচয়ের সমকক্ষ হচ্ছে।

প্রত্যেক মানসিক ভাবের এক একটি শারীরিক প্রতিকৃতি আছে। আবার তদ্বিপরীত অর্থাৎ প্রত্যেক শারীরিক পরিবর্তন এক-একটি মানসিক পরিবর্তন উপস্থিত করে, ইহাও সত্য। বহিঃস্থ শক্তিবিশেষ চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়-পথে পাঁচ প্রকারে শারীরিক পরিবর্তন উপস্থিত করাতেই ঐ সকলের মানসিক প্রতিকৃতিস্বরূপ রূপরসাদি পাঁচ প্রকারের জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। আবার বিষয়বিশেষে গাঢ় মনোনিবেশ করলে ঘর্মনিঃশ্বাসমান্দ্যাদি হওয়াও সকলের প্রত্যক্ষ। নিষ্ঠুর চিন্তাপরম্পরা সর্বক্ষণ মনে জাগরূক থাকাতে চৌরঘাতকাদির বিকট মুখশ্রী এবং উদারভাবপ্রবাহ হৃদয়ে নিয়ত ধারণের ফলে সাধুর সৌম্যদর্শনাদিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমরা স্থূল স্থূল কতকগুলি পরিবর্তনের কথাই এখানে উল্লেখ করলাম। নতুবা বহিঃশক্তি ইন্দ্রিয়পথে আঘাত করে স্নায়ুমণ্ডলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্পন্দিত করলে সমুদ্রাভিমুখী নদীসকলের ন্যায় স্নায়ু-তরঙ্গসকল মস্তিষ্কাভিমুখে গমন করে এবং চন্দ্রমাতাড়িত-সমুদ্রস্ফীতির তরঙ্গাকারে নদীগর্ভপ্রবেশের ন্যায়, আত্মতাড়িত অন্তঃকরণতরঙ্গনিচয় প্রথমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে স্থূলতর রূপ ধারণ করে। তৎপরে স্নায়ুমণ্ডলে স্পন্দন উৎপন্ন করে, স্নায়বিক তরঙ্গাকারে শরীরেন্দ্রিয়ে সঞ্চরণ করে বিভিন্ন-পদার্থবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মায়, ইত্যাদি অনেক কথা বলা যেতে পারত। স্নায়ুমণ্ডল এবং মস্তিষ্কের ঐ সকল তরঙ্গরাজি শারীরবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। পাঠকের কৌতূহল হলে শরীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থে উহার অনুসন্ধান করতে পারেন। অন্তঃকরণতরঙ্গনিচয় আবিষ্কার করা এবং যথাযথ পাঠ করাই মনোবিজ্ঞানের বিষয়।

জ্ঞান-অজ্ঞান, সুখ-দুঃখ, স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য প্রভৃতি মানবের সকল অবস্থাই ঐরূপে মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তনের ফলে অনুভূত হয়। মানব আপন বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা উন্নত বা অবনত যে অবস্থাতেই উপনীত হউক না কেন, উহা তার শরীর-মনে পূর্বোক্ত পরিবর্তন-তরঙ্গ-পরম্পরার ফলেই এসে উপস্থিত হবে, এ কথা নিশ্চিত। ঐ সকল পরিবর্তনরাজির প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ হতে পারে। প্রথম—যেগুলি

আদর্শস্থানীয় আপ্তপুরুষদিগের শরীর-মনে অনুভূত হওয়াতে মানবমনের বিশেষ উন্নতির পরিচায়ক বলে স্থিরীকৃত হয়েছে ; দ্বিতীয়—যেগুলি জনসাধারণের নিয়ত প্রত্যক্ষ বা অল্পায়াসপ্রত্যক্ষ হওয়ার সাধারণ উন্নতির পরিচায়ক, এবং তৃতীয়—যেগুলি রোগী, দস্যু, লম্পটাদি নিম্নস্থানীয় মানবশরীরমনে নিয়তানুভূত হওয়াতে উহাদের নীচত্ব-পরিচায়ক। উহাদের মধ্যে তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত পরিবর্তনরাজি নির্ণয় করা শারীরবিজ্ঞানের বিষয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তগুলি আধুনিক ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানের অধিকারের ভেতর এবং প্রথম শ্রেণীভুক্তগুলি বেদাদি জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থনিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের একটু বিশেষত্ব আছে। উহা প্রথম শ্রেণীর পরিবর্তন-গুলিকে মনুষ্যোপলব্ধ নিত্য ঐশ্বরিক জ্ঞান বলে এবং ঐ প্রকার অবস্থালাভ করাই সমগ্র সৃষ্টি ও মানবজীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য বলে ধারণা করে দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কিয়দংশভুক্ত পরিবর্তনরাজি যথাযথ পাঠ করতে চেষ্টা করছে। ভারতের দার্শনিক সেজন্যই বেদনিবদ্ধ ঐ সমস্ত পরিবর্তনরাজি বা অনুভব-সমূহের ইতিহাসকে 'পুরুষনিঃশ্বসিত আপ্তবাক্যাদি' নামে অভিহিত করছেন। ভারতের দর্শন সেইজন্য সাধারণ-মানবের উপলব্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন না করে জ্বলন্তমহিম মহাপুরুষদিগের উপলব্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করে দণ্ডায়মান। ভারতের দর্শন সেজন্য কেবল কল্পনানুমান সহায়ে রচিত না হয়ে অন্যান্য দেশের দর্শনসমূহের ন্যায় প্রত্যক্ষীকৃত অনুভব-নিচয়ের উপরেই রচিত হয়েছে। ইউরোপীয় দার্শনিক ভারতের দশনসমূহ কল্পনানুমানপ্রসূত ইত্যাদি বলে যতই ঘৃণার চক্ষে দেখুক না কেন, উহা তাঁরই আপ্তপুরুষের অবস্থাবিষয়ক অজ্ঞান এবং আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধাহীনতার পরিচায়কমাত্র।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ধর্মগ্রন্থসমূহনিবদ্ধ জগতের যাবতীয় ধর্মবীরগণের অনুভব-সমূহ অশেষ প্রকারে বিভিন্ন ; ঐ সকলের ভেতর এমন কোন সর্বজনপ্রত্যক্ষ সাধারণ ভূমি আছে কি, যার উপর মনোবিজ্ঞান ভিত্তিস্থাপন করে দণ্ডায়মান হতে পারে? বিভিন্নতার ভেতর একথা যতক্ষণ আবিষ্কৃত না হবে, ততক্ষণ কোন বিষয় বিজ্ঞানরাজ্যের অন্তর্বর্তী কেমন করে হবে ? উত্তরে বলা যেতে পারে, নির্বিকল্প সমাধি-অনুভূত প্রত্যক্ষ এবং তাৎকালিক শরীরাবস্থান সর্বকালে সর্বপুরুষের একরূপই হয়েছে, ইহা ধর্মেতিহাস-প্রসিদ্ধ। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "যেমন সব শিয়ালের এক রা।" (এক প্রকার আওয়াজ), সেরূপ নির্বিকল্প-অবস্থায় অনুভূত বিষয়সম্বন্ধে যাবতীয় ঋষি এবং অবতারকুল এক কথাই বলে গেছেন। এখানে 'নানা মুনির নানা মত' নেই। সকলের এক মত। বৈদিক ঋষিগণ-সেবিত 'মহাবাক্যচতুষ্টয়' অমিতাভ বুদ্ধ-প্রচারিত 'মহানির্বাণাবস্থা', শিবাবতার শঙ্কর-ঘোষিত 'সোঽহংজ্ঞানাবস্থান', মধুর বৃন্দারণ্যে মাধবপদে উৎসর্গীকৃত-সর্বস্ব তন্ময়প্রাণা গোপীদের আপনাতে শ্রীকৃষ্ণবোধ, পিতৃভাবের জ্বলন্ত নিদর্শন মহাত্মা ঈশার জগৎ-পিতার সহিত একত্ববোধ ইত্যাদি সকলই উপাস্য ও উপাসকের মিলনসম্ভূত দ্বৈতবিবর্জিত এক অবস্থাবিশেষকেই যে লক্ষ্য করছে, ইহা স্পষ্ট। ঐ অবস্থাবিশেষ এক হলেও উহাতে উপনীত হবার পথ নানা। একথার আভাসও উদারচরিত বৈদিক ঋষিগণ এবং যাবতীয় অবতারগণও দিয়ে গেছেন। যাস্ককৃত নিরুক্তে আপ্তপুরুষ-সম্বন্ধীয়

আলোচনায় বলা হয়েছে যে, দ্বৈতবর্জিত অবস্থানুভব করে আপ্তত্বলাভ আর্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়জাতীয় পুরুষই নির্বিশেষে করতে পারে।

আপ্তবাক্যের যথার্থ অর্থ কি, তা আমরা এতক্ষণে বুঝলাম এবং ম্লেচ্ছজাতীয় পুরুষের বাক্যও যে বেদ বলে গণ্য হতে পারে, তাও ঋষিগণ বলেছেন, দেখলাম। আর একটি কথার সত্যতাও এখানে অনুমিত হয় যে, নির্বিকল্প অবস্থা ও উপলব্ধ বিষয় এক হলেও এতে উপনীত হবার পথের নানাত্ব ও ভিন্নত্ব সর্বদাই বর্তমান থাকবে। জগৎ কখনই একধর্মমতাবলম্বী হবে না, কিন্তু কালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রচারিত 'যত মত তত পথ'-বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করে পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব পরিত্যাগ করবে।

ভারতের দর্শন যেমন মহাপুরুষকুলের প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান, ধর্মও তদ্রূপ। সেজন্যই ভারতে দর্শন এবং ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ভূমি নির্দিষ্ট হয়নি। ভারতের ঋষি ধর্মকে সংসার হতে বিভিন্ন করে মানব ইচ্ছা করলেও পারে, না করলেও পারে—এ ভাবে দেখেননি। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম সমগ্র জগৎকে অধিকার করে রয়েছে। সমগ্র সৃষ্টির চরোমোদ্দেশ্যই ধর্ম বা মুক্তিলাভ করা। প্রতি মানব নিজ জীবনে প্রতি কার্যের অনুষ্ঠান করে যে যে অনুভূতিলাভ করছে, সে সকল তাকে ঋজু কুটিল পথ দিয়ে ঐ উদ্দেশ্যলাভের দিকেই অগ্রসর কচ্ছে। ধর্ম এক অবস্থাবিশেষ, মানবের সখের বিষয় নয়। ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কার্যের ভেতর দিয়ে, সুখ-দুঃখ উভয় প্রকার কার্যের ভেতর দিয়ে, সুখ-দুঃখ উভয় প্রকার অনুভবের ভেতর দিয়ে, আস্তিক্য-নাস্তিক্য প্রভৃতি নানাবিধ বিশ্বাস ও ধারণার ভেতর দিয়ে অবশেষে চরমোন্নতির ফলরূপ মানবজীবনে ধর্ম বা মুক্তি এসে উপস্থিত হয় এবং তখনই মানব নিজে ধন্য হয়ে জগৎ পবিত্র করে।

আপ্তপুরুষের জীবানুভব-আলোচনায় যে বিশেষ ফল আছে, তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। জ্ঞান যে বিষয়েরই হউক না কেন, মানবের পূর্বকৃত কর্মের কিয়দংশ দগ্ধ করে দেয়। কারণ সংস্কার বা পূর্বানুষ্ঠিত অভ্যাসই মানবকে কর্মে প্রবৃত্তি দেয় এবং সংস্কার-বিশেষের উৎপত্তি আবার বস্তুবিশেষের বিপরীত ধারণা জন্মে থাকে। সর্পের দংশন-স্বভাব না জেনেই অজ্ঞ বালক সম্মুখস্থ সর্পধারণে সযত্ন হয়। ইন্দ্রিয়পঞ্চক এবং মনের সসীম স্বভাব না জানাতেই মানব এদের সহায়ে নিত্য সত্য উপলব্ধি করবার প্রয়াস করে। অবিমিশ্র সুখলাভ অসম্ভব না জেনেই আমরা এর অন্বেষণে সতত ছুটাছুটি করি ইত্যাদি। অতএব সেই বিপরীত ধারণার স্থানে সেই বস্তুবিষয়ক যথাযথ জ্ঞানের যদি কোনরূপে উদয় হয়, তা হলে সে সংস্কার এবং তৎপ্রসূতপূর্ব চেষ্টাদিরও নাশ হবে এতে আর সন্দেহ কি? এবং পূর্ণ জ্ঞানানুভবে যে সর্বপ্রকার সংস্কার এবং তৎপ্রসূত নিখিল কর্মসমূহের একান্ত নাশ হবে, এও স্পষ্ট। এজন্যই শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন— "সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" অতএব "ন হি জ্ঞানেন বিদ্যতে"—মানবকে পবিত্র করতে জ্ঞানের সদৃশ দ্বিতীয় বস্তু আর নেই। বস্তুবিষয়ক যথাযথ জ্ঞানই আবার মানুষকে অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন করে তোলে, এও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মনে কর, চৌরলম্পটাদির নীচ প্রবৃত্তিনিচয় তত্তৎ শরীর মনে কেন উপস্থিত হয়, এবিষয়ের কারণানুসন্ধানে তুমি নিযুক্ত হলে। প্রথমতঃ দেখলে যে, যে বিষয় নিয়ে তাদের

ঐসকল জঘন্য প্রবৃত্তির উদয় হয়, সেই সেই বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হবামাত্র তাদের শরীরস্থ বহিরন্তরবার্তাবাহি-স্নায়ুসমূহ চিরঅভ্যাসবশতঃ হৃদয়াদি শারীর যন্ত্রের ন্যায় মানসিক ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগের অপেক্ষা না রেখে আপনা-আপনি স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তৎফলস্বরূপ তারা তত্তৎ জঘন্য কার্য করতে যাচ্ছে, ইহা বিশেষরূপে জানবার পূর্বেই ঐ সকল করে বসে। আরও দেখলে যে, তারা ঐ সকল কার্যই বিশেষ পুরুষত্ব-পরিচায়ক বলে অহংকার করে থাকে এবং তত্তৎ কার্যানুষ্ঠানে বিশেষ আনন্দলাভ হবে ধারণা করে আছে এবং পরিশেষে দেখলে যে, ঐ প্রকার ধারণা হতে তাদের তত্তৎ কার্য-অকরণের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ঐ সকল বিষয় বুঝামাত্রই তোমার বোধ হল যে, তাদের ঐ সকল কার্য ত্যাগ করাতে হলে তাদের বিপরীত অভ্যাসসমূহ করতে শরীরকে শেখাতে হবে। উহা করতে হলে প্রথমতঃ তা'দিগকে এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে প্রলোভনের বিষয়সকল সহজে তাদের সম্মুখে উপস্থিত না হয়। তৎপরে তোমার বোধ হল যে, তাদের পূর্বাভ্যাস তত্তৎ কার্যসমূহ পুরুষত্ব-পরিচায়ক ও বিশেষ আনন্দজনক এই ধারণা হতেই উপস্থিত হয়েছে। তুমি দেখলে যে, তত্তৎ বস্তুবিষয়ক ভুল ধারণা হতেই ঐপ্রকার কার্য করতে তারা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেছে এবং এখনও করছে। অতএব উহাদিগকে ঐ সকল ত্যাগ করতে হলে পূর্বোক্ত ঐসকল ভুল ধারণাস্থলে ঐ বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান যাতে আসে, তোমাকে তাই করতে হবে। মনে কর ঐসকল কার্যকরণে অবশ্যম্ভাবী দুঃখসকল দেখিয়ে তুমি কালে তাদের ধারণাসমূহ পরিবর্তন করতে পারলে। তা হলে তৎফলস্বরূপ তাদের ঐসকল কার্যও যে কালে ত্যাগ হবে, সে বিষয় কি আর বুঝতে হবে? বৃক্ষের প্রধান মূল ছিন্ন হলে উহার জীবন যেমন অসম্ভব, সেইরূপ ঐ মূলধারণাত্যাগে ঐসকল কার্যের অস্তিত্বও নষ্ট হল। অতএব ঐসকল নীচ মানবমনের কার্যকলাপ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই যে তোমায় ঐ সকল মনপরিবর্তনে শক্তিসম্পন্ন করল, ইহা স্পষ্ট।

আপ্তপুরুষের অনুভব, স্বভাব ও চেষ্টাদির আলোচনাও আমাদিগকে ঠিক ঐ প্রকার শক্তিসম্পন্ন করে এবং জগৎ মানবজীবন-সম্বন্ধিনী কি প্রকার ধারণা হতে তাঁদের ঐ প্রকার নিঃস্বার্থ চেষ্টাদি হয়ে থাকে, তা বুঝিয়ে দেয়। অশান্তিপূর্ণ মানবজীবনে তাঁদের অপূর্ব শান্তি এবং শোক, দুঃখ, আনন্দাদিতে অদ্ভুত অবিচলতা দেখে তদবস্থালাভে আমাদের অনুরাগী করে এবং তাঁদের জীবনের অদৃষ্টপূর্ব শক্তিপ্রকাশ তাঁদের অবস্থা যে সাধারণ মানুষের অবস্থা হতে অনেক উচ্চ ভূমির অবস্থা এ কথা বুঝিয়ে দিয়ে মানব-জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করে। তবে শ্রদ্ধার সহিত তাঁদের জীবন-আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ শ্রদ্ধাই কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। শ্রদ্ধাবিরহিত মন সকল বিষয় আলোচনা করবার কোন আবশ্যকতাই অনুভব করবে না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" —শ্রদ্ধা-বিরহিত সংশয়পূর্ণ মন অজ্ঞান মানব নষ্ট হয় অর্থাৎ সত্য-লাভে সমর্থ হয় না। কারণ শ্রদ্ধার অভাবেই নানাপ্রকার সন্দেহ এসে উপস্থিত হয় এবং মানবকে জ্ঞানলাভ করতে দেয় না।

এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি কোন বিষয়ে সন্দেহ করব না? যে যা বলে তাই চোখ কান বুজে বিশ্বাস করব? না, তা করতে হবে না। সত্যলাভ করব—এই দৃঢ় সঙ্কল্প করে শ্রদ্ধার সহিত সকল বিষয় অনুশীলন কর এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পার, সকল বিষয় পরীক্ষায় মিলিয়ে পাও, ততক্ষণ নানাপ্রকার প্রশ্ন ও চেষ্টাদি করো। উহাকে সংশয় বা সন্দেহ বলে না। পরীক্ষা না করেই কোন বিষয় মিথ্যা বলে ধারণা করা এবং অগ্রাহ্য করাই এস্থলে সংশয় শব্দের অর্থ। উহা না করলেই হল।

আর এক কথা, শাস্ত্র বলেন আপ্তাবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করলে মানব জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে অতীন্দ্রিয় পদার্থের দর্শনে সমর্থ হয়—অপরের জানবার বিষয় নয়। উহা সর্বতোভাবে স্বসংবেদ্য। যাঁর হয়েছে, তিনিই জানতে ও বুঝতে পারেন। একথা সত্য বটে, কিন্তু শাস্ত্র একথাও বলেন যে, আপ্তপুরুষের বাহ্যিক প্রকাশ দেখলে তাঁর উচ্চ প্রকৃতির বিষয় আমরা জানতে পারি এবং তাঁদের অনুভবাদির আলোচনাই যে অজ্ঞ মানবের তদাবস্থা-লাভের প্রধান সহায়, একথা পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিকুল একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন। তবে যতদিন না আমাদের তদবস্থা-লাভ হবে, ততদিন যে আমরা তাঁদের মানসিক গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারব না এ কথায় আর সন্দেহ কি?

শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধপ্রমুখ অবতারকুলের জীবনানুভব আবার আপ্ত-পুরুষাপেক্ষাও সমধিক বিচিত্র এবং উচ্চভূমিকারূঢ়। তজ্জন্য তাঁদের চেষ্টাদিকে ঋষিগণ 'লীলাবিলাসাদি' নামে এবং তচ্চেষ্টাদির অধিষ্ঠানভূমি—তাঁদের শরীরেন্দ্রিয়াদিও শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণনির্মিত বলে নির্দেশ করেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "যেমন খাদ না হলে গড়ন হয় না, অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতুনিচয়ে অলঙ্কারাদি গঠন করতে হলে তাতে তাম্রাদি নিকৃষ্ট ধাতুসকল মিশ্রিত করতে হয়, নতুবা গঠন টেকে না—সেইরূপ রজঃ ও তমোগুণের কিয়দংশ না থাকলে মনুষ্যশরীর হওয়া অসম্ভব।" অতএব অবতারশরীর-গঠনে রজঃ-তমোগুণ স্বল্প-মাত্রায় বর্তমান, ইহা সত্য। কিন্তু উহা এত অল্প যে, ঐ ভাগ লক্ষ্য না করে তাঁদের শরীর-মনের চেষ্টাদি শুদ্ধসত্ত্বগুণ-প্রসূত বলতে পারা যায়।

আবহমানকাল ধরে মানব বিশ্বাস করেছে, অবতারকুল জগৎকর্তা ঈশ্বরের অংশ হতে উৎপন্ন, অতএব ঐশীশক্তিসম্পন্ন। তাঁরা মানবশরীর ধারণ করে ধর্ম-জগতের চরম তত্ত্বে উপনীত হবার নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করে উহা উন্নতাবনত অবস্থাপন্ন সর্বপ্রকারে বিভিন্নপ্রকৃতি মানবের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে দেন। ঐ সকল নূতন পথাবিষ্কারে সবিশেষ শক্তির প্রয়োজন। তজ্জন্য তাঁদের শরীরেন্দ্রিয়াদির গঠনও তদুপযোগী হয়ে থাকে। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও অনুভবাদিও উহাতে ধৃত এবং যথাযথ গঠিত হয়ে থাকে। তাঁদের সাধনোদ্যমাদিও অমানুষী চেষ্টাসম্পন্ন এবং জগতের কল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত। কারণ সংযম, প্রেম, মুক্তি বা মনুষ্যোপলব্ধ এমন কোন সদ্‌গুণই নেই, যা তাঁদের 'অনবাপ্তমবাপ্তব্যম্'—লাভ হয়নি, অতএব লাভ করতে হবে। তথাপি তাঁরা ঐ প্রকার অদ্ভুত কর্মাদির অনুষ্ঠান করে থাকেন। সাধারণ মানবের তো কথাই নেই, তাঁরা মনুষ্যশরীরে দেবপ্রতিম আপ্তপুরুষকুলেরও আদর্শস্থানীয়। আপ্তপুরুষেরা তাঁদের পদানুসরণ করেই

আপ্তত্বাদির অবস্থা লাভ করে থাকেন। অথচ তাঁদের সমস্ত জীবনানুভব আপ্তপুরুষদিগেরও হয় না ; কেন না ধর্মজগতের নূতন তত্ত্ব ও পথাদি আবিষ্করণজন্য তাঁদের জন্ম গ্রহণ নয়। অতএব অবতারকুলের শরীর-মনের অনুভবাদি যে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র হবে, এতে আর আশ্চর্য কি ! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "সিদ্ধপুরুষ ও অবতারের প্রভেদ শক্তির বিকাশ লয়ে হয়ে থাকে ; নতুবা নির্বিকল্প-সমাধিলব্ধ জ্ঞান উভয়ের একরূপই হয়ে থাকে।" একজন মায়াপ্রসূত কাম-কাঞ্চনাদি হতে কোনরূপে আপনাকে বাঁচিয়ে মুক্তিলাভ করে প্রস্থান করেন ; অপর জন অপরকে সাহায্য করবার নিমিত্ত বন্ধনের উপর বন্ধনাদি স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করে তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরও বন্ধনমোচন করে দেন এবং আপনার বন্ধনও ইচ্ছামাত্র মোচন করে ফেলেন। ভারতের পুরাণসমূহ আর কিছু করুক না করুক, তাঁদের অনুভবাদির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করে মনুষ্যকে অমূল্য ধনে ধনী করেছে।

প্রত্যেক ঈশ্বরাবতার বা আপ্তপুরুষচরিত্র আমরা তিন ভাবে আলোচনা করতে পারি। অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার চোখে তাঁদের কার্যকলাপাদি দেখে বা শুনে উহা ভণ্ডধূর্তাদির মিথ্যা-কল্পনা-প্রসূত বা মানবের রোগবিশেষ বলে বিশেষ অনুধাবন না করেই, একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি। অথবা বিশেষ শ্রদ্ধা-প্রণোদিত হয়ে ঐ সকল পুরুষের মানবকুল হতে সম্পূর্ণ জাতিগত পার্থক্য অনুমান করে তাঁ'দিগকে এক অপূর্ব জীববিশেষ বলে ধারণা করতে পারি। অথবা তাঁদের অস্তিত্বে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে অসক্তবুদ্ধি সত্যানুসন্ধিৎসু দার্শনিকের চোখে তাঁদের কার্যকলাপাদির বিশেষ অনুধাবন ও পরীক্ষা করে তদ্বিষয়ক যথাযথ জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হতে পারি।

প্রথম দৃষ্টি অবলম্বন করলে মানবের যাবতীয় ধর্মেতিহাসই মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করতে হয় এবং মিথ্যা বিশ্বাসাদিও যেমন কখনো কখনো গৌণভাবে মানবের উপকারে এসেছে, যাবতীয় ধর্মবিশ্বাসাদিও পূর্ব যুগে সেই ভাবে মানবের উন্নতির সহায় হলেও এখন আর তাদের আবশ্যকতা নেই, ইহাই স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টিতে ঐ সকল মহাপুরুষ-উপলব্ধ অবস্থা ও অনুভবনিচয় তাঁদেরই একায়ত্ত সম্পত্তিবিশেষ বলে স্থির করতে হয় এবং উহা মানব সাধারণের জীবনে কখনই অনুভূত হবার নয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় এবং ভক্তিলাভের উপায়মাত্র ভিন্ন অন্য কোন কারণে তদালোচনার নিষ্ফলতা প্রমাণ করে অথবা তাঁ'দিগকে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ জীববিশেষ বলে ধারণা করে মানবকে কেবলই তাঁদের কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকতে শিক্ষা দেয়, কিংবা ক্রোধনস্বভাব দণ্ডদাতা উৎকোচগ্রাহী দেবতাবিশেষ বলে ধারণা করিয়ে সকাম মানবকে দুর্বলতার পথে দিন দিন অগ্রসর করে।

তৃতীয় দৃষ্টিতে তাঁ'দিগকে অসাধারণ হলেও মানব বলে সিদ্ধান্ত করে, তাঁদের অনুভবাদি প্রত্যেক মানবের মহামূল্য জীবনাধিকারসম্পত্তি বলে নির্ধারিত করে,
বশেষরূপে আপনার করে মানবকে আশা ভরসা এবং বিশেষশক্তিসম্পন্ন করে। তাঁদের উচ্চগতি দেখে মানব আপনার উচ্চগতিতে বিশ্বাসবান হয় এবং সেও সেই বংশপ্রসূত, অতএব সকল ধনের অধিকারী বলে আত্মনিহিত শক্তিতে নির্ভর

করে দাঁড়াতে শেখে। এই দৃষ্টি অবলম্বনে মহাপুরুষচরিত্রালোচনার ইচ্ছা বারান্তরে রইল। এখন ভাগীরথীনিষেবিত পঞ্চবটীতলে যাঁর অলৌকিক জীবন বেদাগম-পুরাণাদি জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ-নিবদ্ধ সমগ্র অবতারকুলেরও অনুভবাদি অতিক্রম করে উচ্চতর ভূমিকায় আরোহণ করেছিল, যাঁর অপূর্ব শক্তি-প্রকাশের আরম্ভমাত্র দেখে জগৎ স্তম্ভিত হয়েছে, যাঁর অপূর্ব জীবনালোকে কালরাত্রির ঘনান্ধক্রোড়ে লুক্কায়িতপ্রায় বেদাদির অর্থবোধে বাসনাপ্রাণ ভোগলোলুপ বর্তমান কালের মানবের একমাত্র সহায়, কামকাঞ্চনপূতিগন্ধপূর্ণ শোকদুঃখময় স্বার্থপর সংসারে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' যাঁর বার বার আগমন ও উদ্বোধন, এস, আমরা ধর্মতনু জগদ্‌গুরু সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শ্রীপাদুকা মস্তকে ধারণ করে তাঁরই জীবনানুভব সময়ে সময়ে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করি এবং ধন্য হই।

ভারতে শক্তিপূজা

প্রথম প্রস্তাব

শক্তিতত্ত্ব ও পূজাপদ্ধতি

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ জড়, চেতন, সকলের মধ্যে কোথাও গুপ্ত, কোথাও ব্যক্তভাবে অবস্থিতা শক্তি-রূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

হে পাঠক, নবযুগে নবোদ্যমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা ও নিরন্তর সপ্রেমাহ্বানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের গুরুগতপ্রাণতায় প্রসন্না হইয়া পরমকল্যাণে নিযুক্তা হইয়াছেন। অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃথিবীও যে ইঁহার পবিত্র স্পর্শে নবভাবে পূর্ণা হইয়া একদিন কৃতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ব্রহ্মসত্তাবে ব্রহ্মশক্তি—সর্বদা অমোঘ, অবিনাশী, সর্বান্তর্নিহিত থাকিয়া সর্বদা সকলের নিয়মনকরী।

শক্তির বিচিত্র প্রভাবেই সর্ষপতুল্য বীজে বিশাল বৃক্ষ, মাংসপিণ্ড মনুষ্যশরীরে জড়জগন্নিয়ামিকা চৈতন্যময়ী বুদ্ধি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল, ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাধারণ শক্তির প্রভাবই যখন এমন অদ্ভুত, তখন অন্তর্জগন্নিয়ামিকা আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমার কিরূপে ইয়ত্তা হইবে? কেনই বা না জগৎ আবহমান কাল ধরিয়া উঁহার পূজায় প্রাণপাতে অগ্রসর হইবে? আবার জগতে নবপ্রবোধিতা শক্তির পূজা প্রসারিতা হইবে। আবার ভারত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সনাতনী ব্রহ্মশক্তির পূজা করিয়া নিজে ধন্য হইবে এবং অপরকে ধন্য করিবে। অতএব, শক্তিতত্ত্ব এবং শক্তিপূজা-সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবার ইহাই উপযুক্ত কাল।

শুভ্রশির বেদ বলেন—প্রাচীনা হইলেও শক্তি নিত্যা নবীনা, গুপ্তভাব হইতে ব্যক্তা হইলেই নবীনা বলিয়া প্রতীয়মানা। নতুবা শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "চিকের আড়ালে দেবী সর্বদাই রহিয়াছেন।" শক্তির হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, লোপ তো দূরের কথা। ঘন বা সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়াই আমরা উঁহার কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি, আবার কখন বা একেবারে লোপ কল্পনা করিয়া থাকি মাত্র।

এক শক্তিই কতবার গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্তভাব প্রাপ্ত হইল, কে তাহা বলিতে পারে? যতবার ব্যক্ত, ততবার নূতন। যতবার গুপ্ত, ততবার লুপ্ত বলিয়া অনুভূত হইল। কালে কালে এই খেলা চলিয়াছে: দেশ, মহাদেশ, পৃথিবী,

অখিল জগৎ লইয়া—জাতি, সমাজ, প্রত্যেক পরিবার এবং ব্যক্তিকে লইয়া এই খেলা নিত্য চলিয়াছে। কত গ্রহ চূর্ণিত এবং কত গ্রহ পুনর্গঠিত হইল, কত দেশ পর্বতায়িত এবং কতই বা সমুদ্রকবলিত হইল, কে নির্ণয়ে সক্ষম? এক গ্রহ বা পৃথিবভ্যন্তরস্থ এক দেশের কতবারই বা এই দশা হইল, তাহাই বা কে বলে? তুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গে সমুদ্র গর্জনের এবং সমুদ্রগর্ভে দেশ-জনপদের অস্তিত্বের ইতিহাস বর্তমান। প্রসিদ্ধিই আছে, 'শতবর্ষে জনপদ, আবার শতবর্ষে অরণ্য।'

এইরূপে কত জাতি ও সমাজ উন্নত, অবনত এবং পুনরায় উত্থিত হইতেছে, তাহা কে বলিবে? আবার শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্যে ব্যক্তিগত শক্তির তারতম্য কেই বা না প্রত্যক্ষ করিয়াছে? পুনর্জন্মে সেই শক্তির পুনর্বিকাশ, ভারতের কোন্ যোগী ঋষিই না অনুভব করিয়াছেন? অতএব ভাবিয়া দেখিলে—প্রফুল্ল কমলোপরি অধিষ্ঠিতা, লঘুকায়া অপূর্ব সুন্দরীর পুনঃ পুনঃ গজগ্রাস এবং গজ-উদ্গার করিবার কথা আর কবি-কল্পনা বলিয়াই মনে হয় না। অথবা দেবর্ষি নারদদৃষ্ট ভাগবতী মায়ার সূচীছিদ্রে বারংবার হস্তী প্রবিষ্ট এবং নির্গত করাইবার কথাতেও আর সন্দিহান হওয়া যায় না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন জগজ্জননী, মহামায়ার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইতে অভি-লাষী হইয়া দেখিয়াছিলেন—অনুপমা সুন্দরী নারী সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রসবে এবং লালনপালনে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া, আবার তাহাকে কিছুকাল পরে সহর্ষে গ্রাস করিলেন! শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে, শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়রূপ বিপরীত গুণধারিণী, এ কথাই পরম সত্য বলিয়া অনুভূত হয়। আধুনিক দার্শনিকও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শক্তির বিনাশ বা পরিমাণের হ্রাস নাই। গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাব হয় মাত্র।

ভাবরাজ্যেও তাহাই। ভাবরাজ্যে বা সূক্ষ্ম মনোরাজ্যেও শক্তির এই খেলা বর্তমান। এক জাতি, সমাজ বা ব্যক্তি-উপলব্ধ-ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভাব কালে অঙ্কুরিত, বর্ধিত, পরিণত এবং লুপ্ত হইয়া আবার সেই ভাব-তরঙ্গ অপর জাতি বা সমাজ বা ব্যক্তির ভিতর প্রবিষ্ট ও প্রকাশিত হইয়া নূতন বলিয়া উপলব্ধ হয়। মহাশক্তির বিচিত্র লীলায় ঐ দ্বিতীয় জাতি উহার পুরাতনত্ব আদৌ অনুভব না করিয়া ভাবে, এ ভাব জগতে আর কখনও উদিত হয় নাই এবং মদগর্বে স্ফীত হইয়া জটিল জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব সরল সমাধান তৎকর্তৃক আবিষ্কৃত, এই কথা প্রচার করে।

আধুনিক ইওরোপ ও আমেরিকাই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। প্রাচীন ভারত, মিসর, গ্রীস ও অন্যান্য দেশের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং অপরাপর ভাবতরঙ্গ এখন ঐ সকল দেশে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত এবং পুষ্ট হইয়া সমুত্থিত হওয়ায়, ঐ সমস্ত দেশবাসীর মদগর্ব প্রত্যক্ষ। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক, তুমি ক্রমবিকাশ, স্ত্রী-নির্বাচন, সন্তানানুগত পিতৃগুণবাদ ইত্যাদি লইয়া 'জীবন-শঙ্কার সরল সমাধান আবিষ্কৃত' বলিয়া সমগ্র জগৎকে আহ্বান করিতেছ, কিন্তু বৃথা গর্ব। ভাবতরঙ্গ আবার স্থানান্তরিত হইবে—আলোকের পর অন্ধকার এবং জীবনের পর মৃত্যু আবার আসিয়া উপস্থিত হইবে। জীবন-শঙ্কার একটা জাতিগত সমাধান দূরপরাহতই থাকিবে। তবে ব্যক্তিগত সমাধান? আবহমান-

কাল ধরিয়া যাহা হইয়াছে—'ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটাই কাটিয়াছে' ও কাটিবে।

ইওরোপ, তুমি ক্ষাত্রশক্তি এবং বৈশ্যশক্তির উপাসনায় হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিয়াছ। সেই কঠোর তপস্যাই তোমায় উন্নতিশির করিয়াছে। আমেরিকা, তুমি ঐ দুই শক্তির সহিত আবার শূদ্রশক্তির আরাধনে তৎপর, তজ্জন্যই তোমার এত শীঘ্র জাতীয় উন্নতি। কিন্তু আবার তোমরা মহাশক্তির আরাধনায় অবহেলা করিবে এবং কালে ভুলিয়া যাইবে। আবার সেই 'সহস্রপরমা শতমূলা শতাঙ্কুরা' দুর্গাদেবী অন্যের আরাধনায় প্রসন্না হইয়া অন্যত্র উদিতা হইবেন। ইহাই নিয়ম।

গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্ত—শক্তির এই দুই ভাবের খেলা জগতে নিরন্তর সর্বত্র বিরাজিত। যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিতে শক্তির প্রথমোক্তভাবের খেলা হইতেছে, তাহাকেই আমরা জীবন্ত, উন্নতিশীল এবং ভাগ্যবান বলিয়া বোধ করিতেছি এবং যাহাতে শেষোক্ত ভাবের খেলা, তাহাতেই বার্ধক্য, শ্রীহীনতা, অবনতি এবং মৃত্যুর ছায়া উপলব্ধি করিতেছি।

আবার, বহুকাল গুপ্তভাবে অবস্থিত শক্তির বিকাশ যে শরীর-মন আশ্রয়ে হয়, বা ব্যক্ত শক্তির কার্যক্রম যাঁহার দ্বারা যথাযথ গঠিত হয়, শ্রদ্ধাভক্তিপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে আমরা কতই না উচ্চাসন প্রদান করিতে বাধ্য হই! জড়রাজ্যে তিনি—আবিষ্কারক, মনোরাজ্যে—দার্শনিক এবং ধর্মরাজ্যে—মুক্তস্বভাব ঋষি অথবা শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহধারী অবতার।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছি, মনের দ্বারা যাহা কিছু চিন্তা ব কল্পনা দ্বারা যাহা কিছু অনুমান ও গঠন করিতেছি, সকলই শক্তিসহায়ে, সকলই শক্তি-রাজ্যের অধিকারভুক্ত। বেদমুখে দেবী বলিতেছেন—

"ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি যঃ ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥

* * * *

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥"

ঋক্—দেবীসূক্ত

অর্থাৎ, আমার দ্বারাই লোকে জীবিত রহিয়াছে, অন্নগ্রহণ এবং শ্রবণাদি করিতেছে। আমাকে যে অবহেলা করে, সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান, এইজন্য তোমাকে এসকল বলিতেছি। ব্রহ্মশক্তির হিংসক অসুরদিগের বধের নিমিত্ত ধনুর্ধারী রুদ্রের বাহুতে

আমিই শক্তিরূপে অবস্থিতা ছিলাম। আমিই লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধকার্যে নিযুক্তা হই। আমিই আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া রহিয়াছি।

শক্তিরাজ্যের পূর্বোক্ত অদ্ভুত বিস্তৃতি একবার যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে, শক্তিপূজাতেই জগৎ চিরকাল ব্যাপৃত। শক্তি-আরাধনা ভিন্ন সংসারে অন্য কোনরূপ উপাসনাই কখন হয় নাই বা হইবে না। জড়, চেতন সকলেই যুগযুগান্তর ধরিয়া আজীবন শক্তি-আরাধনায় ব্যস্ত থাকিয়াও পূজা সাঙ্গ করিতে পারিতেছে না। পারিবে কি কোন কালে? যদি পারে, সেও শক্তি সহায়ে—

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

প্রসিদ্ধি আছে, শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ কলিতে, অন্য দেবতা সব নিদ্রিত; শক্তিপূজা-সম্বন্ধীয় তন্ত্রসমূহ ভিন্ন অন্য শাস্ত্রসমূহের নির্বিষ ভুজগের ন্যায় বৃথাস্ফালন। কথাটা সম্পূর্ণ না হউক, কতক সত্য বটে। কারণ, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি মানুষ জড় বা মনোরাজ্যে যাহা কিছু অধিকারলাভ করিয়াছে, সব শক্তি-আরাধনার ফলে। জড়শক্তি বলিয়া যাহা সাধারণ মানবের প্রত্যক্ষগোচর, তদারাধনার ফলেই তাহার শারীর-বিজ্ঞান, ভূত-বিজ্ঞান, রোগ-শান্তি, মহামারীর প্রতিবিধান, আহার-সংস্থান, ধনাগমের বিবিধ উপায়, যুদ্ধবিগ্রহের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি করতলগত। তেমনি, মানসিক শক্তি বলিয়া যাহা পরিচিত, তদুপাসনায় মানবের মনোবিজ্ঞান, কবিত্ব, সংযম, বিবাহ-বিধান, সভ্যতা, নীতি, সমাজগঠন, রাজনীতি প্রভৃতি; এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধনে ব্রহ্মচর্য, সত্য, সন্তোষ, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি এবং পরিশেষে সর্ববাধাবিনির্মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থও তাহার আয়ত্তীভূত। অবশ্য ঐ সকল বহুলোকের বহুকাল ধরিয়া বহুভাবে শক্তি-উপাসনার ফলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ সর্বকালে যতটুকু শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যে-কোনও শক্তির যে-পরিমাণে উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে। একালের উপাসকদেরও এ কথা প্রত্যক্ষানুভূত।

তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা-বিরহিত হইলে পূজার সম্পূর্ণ ফললাভ অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে। যে পূজায় যে যে উপকরণ আবশ্যক, তাহা আয়াসসাধ্য হইলেও একত্র করিতে হইবে; যে কারণসমূহের সংযোগে যে বিশেষ ফলের উৎপত্তি, সে সমূহের একত্র সংযোগ চাই। এ কথাটি যেমন বড়ই সোজা, তেমনি বার বার মানুষ ভুলিয়া যায়। এদেশে আমরা একথাটি আজকাল কতই না ভুলিয়াছি! ফলও তদ্রূপ পাইতেছি। সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নির্বীর্য, ধর্মহীন, বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন। দোষ—পূজাবিধির ব্যতিক্রম। রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবে বলিয়া যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন এবং নির্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকে, তাহার ফল-প্রত্যাশা কোথায়? তাহার ইষ্টশক্তি-উপাসনা অঙ্গহীন। মহামারীর প্রতিবিধান-উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহ্যশৌচের বিধানসকল সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া, খাদ্য-পানীয়ের বিচার না রাখিয়া

কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টা উচ্চরোলে হরি-সঙ্কীর্তন করে, তবে তাহার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে ? তাহার ইষ্টপূজার উপকরণসমূহের অত্যন্তাভাব। দুর্ভিক্ষের করাল বদন হইতে দেশোদ্ধার করিবে বলিয়া যদি কেহ কেবলমাত্র রক্ষাকালীয় পূজা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, নূতন উপায়ে অর্থাগম, অন্নবৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপোযোগী উপায়-সকলের প্রতি লক্ষ্য ও চিন্তা না রাখে, তাহার আরাধনাও অঙ্গহীন বই আর কি বলা যাইবে ? স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য যিনি অহরহঃ বক্তৃতা দানেই ব্যস্ত, কিন্তু একবিন্দু স্বার্থত্যাগে সর্বদাই পশ্চাৎপদ, তাঁহার উপাসনাই বা কি ফল প্রদান করিবে ? কথায় বলে, 'যে বিবাহের যে মন্ত্র' তাহার উচ্চারণ চাই। এইরূপ শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পুজা করিয়া বলিব, 'পুজার ফল তো পাইলাম না।' হায় মানব, তোমার সহজ বুদ্ধির কি একান্ত অভাবই হইয়াছে ! শাস্ত্র তো তোমায় বার বার বলিতেছেন, কোন কার্য সুসিদ্ধ হইতে পাঁচটি কারণের প্রয়োজন—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥"—গীতা

যথা—উপযুক্ত দেশ, উদ্যমশীল কর্তা, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাম, বার বার উদ্যম এবং দৈব। সহজ জ্ঞানেও তে বার বার উপলব্ধি করিতেছে যে, এক হস্তে দৈব এবং অপর হস্তে পুরুষকারকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলে তবেই গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়। নতুবা পুরুষকারসহায়ে চেষ্টা ও নির্ভরশীলত, এতদুভয় তোমায় ভগবান কেন দিয়াছেন ? একবার সোজাসুজি ভাবিয়া দেখ দেখি, ভারতের পূর্ব পূর্ব ঋষিগণ যে মনোবিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতিতে পারদর্শিতালাভ করিয়াছেন, তাহা কি কেবল মন্ত্রজপ-প্রভাবে বা চেষ্টারহিত হইয়া কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া ? ভারতের তান্ত্রিক অবধূতেরা যে সকল ধাতুঘটিত ঔষধ এবং বিবিধ বিষ-প্রয়োগে বিবিধ রোগশান্তি উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে কতই না নির্ভীক উদ্যম এবং পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় ! কত সাধকের অনুরাগ-ভক্তিপূত হৃদয়ের শক্তিপূজার ফলেই না ঐ সকলের এক একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ! এখন বিষয়বিশেষের প্রতি অনুরাগ ভক্তিতে কেহ হৃদয়ের শোণিত-বিন্দু শুষ্ক করিতেছে দেখিলে তুমি চক্ষু নিমীলন কর, বলিদানের বা স্বার্থত্যাগের নাম শুনিলে একেবারে হতজ্ঞান হও। কিন্তু ঐ শুন, ভারতের ঋষি কার্যে দেখাইয়া চিরকাল ঘোষণা করিতেছেন—শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ধীরভাবে যথাযথ উপায় অবলম্বন কর, সকল কষ্ট সহ্য করিয়া বিন্দু বিন্দু হৃদয়ের শোণিতপাত পর্যন্ত স্বীকার করিয়া শক্তির উদ্বোধন এবং তর্পণ কর, আপনার প্রিয় যাহা কিছু এবং অতি প্রিয় দেহ মন পর্যন্ত ইষ্ট-লাভোদ্দেশ্যে দেবীর সম্মুখে বলিদান দাও, দেখিবে নবজীবনের সহিত যে উদ্দেশ্যে তুমি পুজা করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে এবং তোমার একাঙ্গী ভক্তিপূত সাধনায় তোমার কুল, জাতি ও দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে ; আপনি ধন্য হইয়া তুমি অপর সাধারণকেও ধন্য করিবে।

বলিদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ। ছাগ-মহিষ

বলি তো অনুকল্পমাত্র। হৃদয়ের শোণিতদান, যে উদ্দেশ্যে পূজা সে উদ্দেশ্যে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার শক্তি-পূজাতেই ফলসিদ্ধি অসম্ভব। বেদ বলেন, "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—ত্যাগই আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া অমর হইবার একমাত্র উপায়। কেবল আত্মজ্ঞান কেন, স্বার্থসুখ ত্যাগ না করিলে জগতে কোন মহৎ বিষয়ই লাভ হয় না এবং ঐ ত্যাগই শক্তিপূজাপদ্ধতির বলি এবং হোমের একমাত্র লক্ষ্য। সর্বত্যাগে অমরত্ব-লাভ, বিদ্যার জন্য ত্যাগে বিদ্যালাভ, ধন জন্য ত্যাগে ধনলাভ, প্রভুত্বের জন্য ত্যাগে প্রভুত্বলাভ, এইরূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ বা বলি-মাহাত্ম্য নিত্য-প্রত্যক্ষ। ঐ সকল বিষয় উপার্জন করিবার উপায়—ত্যাগ এবং রক্ষা করিবার উপায়ও—ত্যাগ, ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষ।

যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে, সর্বশক্তির আকর অন্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহা হইতে শক্তি-অবতরণের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং পরে সম্যক্ শ্রদ্ধার সহিত আবাহন, পূজা এবং আত্মবলিদান করিয়া মহাশক্তির প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে। তবেই দেবী বরদা হইয়া সাধকের প্রাণমনে অভিনব অপূর্ব বলের সঞ্চার করিয়া ঈপ্সিত অর্থে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবেন এবং উহাতেই ফলসিদ্ধি করতলগত হইবে। করিবার যাহা কিছু তিনিই করিবেন, সাধকের মনপ্রাণ কেবল নিমিত্তমাত্র হইবে।

অতএব বিঘ্নোৎসারণ, ভূতবলি, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি পূজার পূর্বে করণীয় বিষয়গুলির উদ্দেশ্যই সাধকের বৃথা শক্তিক্ষয়-নিবারণ। যে উপায়েই হউক বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারিত হইলেই তুমি উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে, অন্তর্নিহিত পরমাত্মার ধ্যানে উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য যে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল; পূজা ও স্বার্থত্যাগে সেই সঞ্চিত, ঘনীভূত ও মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল; এবং পরিশেষে সেই নবশক্তির নিয়োগে অভীষ্ট ফল করতলগত হইল। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বফলসিদ্ধির সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রবর্তিত। শক্তিক্ষয়-নিবারণ আত্মনিহিত মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান। শঙ্খ ঘণ্টা, ধূপ, দীপাদির আড়ম্বর থাকুক আর নাই থাকুক, সর্বপ্রকার শক্তি সাধকের অন্তরেই নিহিত রহিয়াছে—এ কথা জানুক আর নাই জানুক এবং শক্তিবিশেষের আপনাতে প্রকাশিত করিবার পূর্বোক্ত ক্রমোপায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত থাকুক, তথাপি অভীষ্ট বিষয়ের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও ধ্যানই যে একমাত্র সর্বকালে সর্বসাধককে পূর্বোক্ত ক্রমের ভিতর দিয়া ফলসিদ্ধি প্রদান করিয়াছে, একথা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতেই পারা যায়।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের অনেকেই শক্তিকে জড় বলিয়া থাকেন। জড়-পরমাণুপুঞ্জে জড়শক্তির খেলা ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাদের চক্ষুগোচর হয় না। বিচিত্র বহির্জগৎ এবং এবং তদপেক্ষা সমধিক বিস্ময়কর মানবের অন্তর্জগৎও পূর্বোক্ত জড় পিতা-মাতার জড়লীলাপ্রসূত জড়সন্তান, এ কথাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন। মন বল, বুদ্ধি বল, আত্মা বল, সকলই ঐরূপে উৎপন্ন। আর একশ্রেণী বলেন, জড় এবং চৈতন্যভেদে শক্তি

দুই প্রকার। এই দ্বিবিধ শক্তি-খেলাতেই উভয় জগৎ প্রসূত। সূক্ষ্মা চৈতন্যশক্তি স্থূলা জড় ভগিনীকে সর্বদাই আত্মবশে রাখিয়া নিয়মন করিতেছেন।

পাশ্চাত্ত্যের বিরল দুই-চারি ব্যক্তির শক্তিসম্বন্ধীয় জ্ঞানই ভারতের ঋষিদের জ্ঞানের সমীপবর্তী হইয়াছে। তাহাও অনুমান-সহায়ে; ঋষিদের ন্যায় অনুভূতির ফলে নহে। নতুবা ইওরোপ ও আমেরিকা অল্প দিন মাত্র চার্বাক-মত হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহে, ধন গম কৌশলে, বহু ব্যক্তির একত্র সংস্থানে ও একোদ্দেশ্যে নিয়মনে, ভৌতিক শক্তির উপর আধিপত্য-বিস্তারে, বৈশ্য এবং এতকাল ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত শূদ্রের অন্তর্নিহিত শক্তির অপূর্ব বিকাশে, শিক্ষার স্থূল হইলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চাঙ্গের শক্তিবিকাশে উক্ত উভয় দেশের আধিপত্য এখনও প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেখানে ভারতের ঋষির "যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী"—বিষয়াসক্ত ব্যক্তির যেখানে অন্ধকার, সংযমীর সেখানেই আলোক-বোধ—সেই পুরাতন কথা এখনও সত্য। ভারতের ঋষিদেরই সেখানে এখনও পূর্বাধিপত্য অক্ষুণ্ণ। তাই ভারতের বেদ-বেদান্তের গম্ভীর ধ্বনিতে এখনও পাশ্চাত্ত্য জগৎ মোহিত, স্তব্ধ।

শক্তি জড়স্বরূপা, এ কথা নূতন নহে। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতের কপিলাদি ঋষিগণ একথা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের জড়বাদে এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের জড়বাদে অনেক প্রভেদ বিদ্যমান। যে শক্তি কার্যাকার্যবিচারক্ষম মানববুদ্ধি প্রসব করিয়াছেন, তিনি যে তদপেক্ষা অধম, এ কথা ঋষিদের স্বপ্নেরও অগোচর। কার্য কি কারণাপেক্ষা কখনও গুরু হইতে পারে? যাহা কারণে বর্তমান, তাহাই কার্যে বর্তমান থাকে ও প্রকাশ পায়—এ কথা ঋষিগণ কেন, সর্ববাদিসম্মত।

ভারতের ঋষি শক্তির স্বাধীন কার্যকারিতার অভাব স্বীকার করিলেও চৈতন্যময় পুরুষের সহিত নিত্যসংযোগে তাঁহাকে নিত্য চৈতন্যময়ী দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কল্পনা সহায়ে পৃথক করা ভিন্ন শক্তি ও শক্তিমানকে বাস্তব পৃথক্-করা কি কখন সম্ভবে? অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তিকে কেহ কখনও পৃথক করিয়াছে বা দেখিয়াছে কি? বহুর ভিতর একের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের ঋষি দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত পরমধামে উপনীত হইয়াছিলেন। বাহ্য ও আন্তরজগৎ একই শক্তিপ্রসূত বলিয়া অনুভব করিয়া পরিশেষে সেই শক্তিকেও শক্তিমানের সহিত নিত্যযুক্ত দেখিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্"—চণ্ডী

"মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে"—দেবীসূক্ত

অর্থাৎ, দেবী নিত্যস্বরূপা, জগৎই তাঁহার মূর্তি, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। যাহা হইতে জীব, জগৎ প্রভৃতি সমস্ত নির্গত হইতেছে, সকলের উৎপত্তির কারণস্বরূপিণী আমিই তাহা—পরব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমান। সেইজন্যই দেবগণ শক্তির

স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ, যিনি সর্বভূতে চেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পদে বার বার প্রণাম।

চৈতন্যের সহিত শক্তির নিত্য মিলন সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াই বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থে এবং সমগ্র জগতে ভারতের ঋষিগণ শব-শিবার আরাধনা করিয়াছিলেন। অভ্রভেদী পর্বতমালা, সাগরবাহিনী নদনদী, উষার রক্তিম ছটা, সন্ধ্যার তিমিরাবগুণ্ঠন—সকলই তাঁহাদের নিকট সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী দেবীর প্রতীকস্বরূপ হইয়া তাঁহার সৌম্যাৎসৌম্যতরা মূর্তি প্রকাশ করিত। অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার, মৃত্যুর নিষ্ঠুর ছবি, শ্মশানের কঠোর উদাসীনতা, কালের সংহার-ছায়া—সকলই আবার সেই করালবদনার ভিতর কোমল-কঠোর ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশ নয়নগোচর করাইয়া তাঁহাদিগকে মোহিত করিত। দেবাসুরের নিত্যসংগ্রামস্থল মনুষ্যমনে আবার দেবীর বিশেষ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা বিশেষ আরাধন বিধান করিয়াছিলেন। পথপ্রদর্শক গুরুর ভিতর, জগদ্বিমোহিনী স্ত্রীমূর্তির ভিতর বিদ্যা, ক্ষমা, শান্তি, মোহনিদ্রা, ভ্রান্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক এবং তামসিক গুণের ভিতর সংসারে বিশেষ-গুণশালী প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির ভিতর সেই অদ্বিতীয়া বরাভয়কর মুণ্ডমালিনী দেবীর আবির্ভাব-দর্শনে এবং শ্রদ্ধার সহিত আরাধনে তাঁহারা আপনার কৃতার্থ হইয়া মানবকে সেই পথে চলিয়া ধন্য হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কোন্ কোন্ স্থানে শক্তির কি কি বিশেষ প্রকাশ এবং কাহারই বা কিভাবে পূজা বিধান, সে সমস্ত অনেক কথা, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব এখন উপসংহারে কেবল ইহাই বলি যে—ভারতের কুলদেবী 'দুঃস্বপ্ননাশিনী' শিবানী উপাসনায় পূর্ণভাবে আত্মবলিদানের জ্বলন্ত মহিমা যদি দেখিতে, অনুভব করিতে ইচ্ছা থাকে তবে এস, হে পাঠক, একবার নিমীলিতনেত্রে ধ্যানসহায়ে সেই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে সেই কুটীরনিবাসী শক্তিসেবায় আত্মহারা দেবমানব প্রেমিকের পদপ্রান্তে —যাঁহার নিকটে জ্বলন্ত দীক্ষালাভেই শ্রীবিবেকানন্দ আজ সুদূর ইওরোপে ও মার্কিনে চিরপদদলিত হিন্দুর ধর্মধ্বজা সগৌরবে উড্ডীন করিয়াছেন—তীর্থাস্পদ তাঁহারই পদপ্রান্তে এস ক্ষণেকের জন্য দণ্ডায়মান হই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

অবতারতত্ত্ব ও গুরুপ্রতীক

উপরে—অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডগতিসমাচ্ছন্ন শ্যামল আকাশ; নীচে—শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরাবক্ষে শ্যামল অচলমালার কৃষ্ণনীরদাবৃত শৃঙ্গাবলী ও তৎপদপ্রান্তে চিরচঞ্চল শ্যামল জলধির বীচিবিক্ষোভময় প্রলয়তাণ্ডব! হে শ্যামা, বিরাট স্থূল শরীরে তোমার এ স্থূলভাবের খেলা!

বাহিরে—ক্ষুদ্রায়তন, ক্ষণভঙ্গুর, রোগাদির নিত্য আশ্রয়, নিশ্চিতমৃত্যু কিন্তু অনিশ্চিত তৎকাল, নগণ্য মনুষ্যশরীর; ভিতরে—দেশকালব্যবধান-উল্লঙ্ঘন-প্রয়াসী, সর্ববিধরহস্য-ভেদন-তৎপর, হঠকারিতায় জগৎকর্তারও স্বভাব-নিরূপণে অগ্রসর, কার্য-মাত্রানুমেয়, ইন্দ্রিয়াতীত মনুষ্যমন। হে দেবি, সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্মভাবে তোমার এ অধিকতর বিচিত্র লীলা!

সম্মুখে—রূপরসাদির অনন্তহাবভাবযুক্ত অগণ্যমোহনশ্রী এবং নানা-চিন্তাকার্য-সমাকুল, আত্মবিস্মৃত, রহিতাবসর-হিতাহিতভ্রষ্ট, উন্মাদ মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামের তদালিঙ্গনে উন্মাদচেষ্টা; পশ্চাতে—ইচ্ছামাত্র-সহায়, কেন্দ্রীভূতশক্তি, অচল, অটল, সাক্ষিবৎ সমাসীন অপরোক্ষ আত্মা। হে মায়ের কারণরূপিণি, তোমার এ সর্বোৎকৃষ্ট অপূর্ব লীলাবিলাস!

আবার, মন-বুদ্ধির অতীত 'স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীন' 'বিগতভেদাভেদ-শমিতসর্বনামরূপ' তোমার যে অবস্থা, যাহার মহিমা ভারতের ঋষিকুল একপ্রাণে একবাক্যে বর্ণনায় এবং মানব-সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া চিরশান্তিদানের চেষ্টায় নিরন্তর ব্যস্ত। হে অম্বে, শক্তিরূপিণি, উহাই কি তোমার নিত্যামূর্তি? সাধারণ মানব কি বলিতে পারে? স্তব্ধীভূত বাসনাজাল, মনবুদ্ধির পাড়ে অবস্থিত, তোমার বরপুত্র, জগদ্গুরু, মহাপুরুষ ঈশ্বরাবতারেরাই সেই কথা বলিতে পারেন।

এতকাল ধরিয়া ভারত তোমার জগদ্গুরু-মূর্তির পূজা করিল—কবে এ পূজার প্রথমারম্ভ। তোমার ঐ অতীন্দ্রিয় মূর্তির দর্শনলাভে মানব ঋষিত্ব, দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র মানবকুল ধন্য করে, এ কথা দেশের জনসাধারণ কবে হৃদয়ঙ্গম করিল? কে শিখাইল?

সহস্রারপদ্ম তোমার কৃপায় ভারতেই প্রথম সগৌরবে বিকশিত হইল—তৃষিত মধুপবৃন্দও তৎসকাশে আপনি আসিয়া জুটিল এবং মোহিত হইয়া নিজ নিজ মন প্রাণ উৎসর্গ করিল—শ্রীগুরুমূর্তিতে তোমার পূজা জনসাধারণে এই ভাবেই প্রথম করিতে শিখিল!

মানবে শক্তিপূজা—মানবে মনুষ্যত্বের সহিত তোমার অভূতপূর্ব মিলন দেখিয়া

হৃদয়ের সরল কোমল পবিত্র ভাবসমূহ তৎপদে ঢালিয়া দেওয়া, তোমার সহিত তাঁহাকে চিরমিলিত দেখিয়া, তোমার সহিত তাঁহার একত্ব অনুভব করিয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরব্রহ্মাদি নামে অভিহিত করা—একটা ঢং করিয়া, দশজনে পরামর্শ করিয়া করা নহে—হৃদয়ের পূর্ণতায়, প্রাণের উল্লাসে, 'মন মুখ এক' করিয়া সত্য সত্যই সর্বকাল করা !—এই রূপেই কি গুরুবাদ ধীরে ধীরে ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইল ?

মন-বুদ্ধির পারগত মানবে মন-বুদ্ধি-কল্পনাতীত শক্তির প্রকাশ। ভাবনাতীত-ভাবে তুমি তথায় প্রকাশিতা। কামকাঞ্চনের খরস্রোতে বিষয়-সমুদ্রাভিমুখে দ্রুত ভাসমান জগতে ঐরূপ মানবই কেবল নিত্য হিমাচল-নিবদ্ধদৃষ্টি, বিপরীতগমনসামর্থ্য-বান ! কেনই বা মানবসাধারণ তাঁহার পূজা না করিবে ?

নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তামগ্ন অব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত প্রাণিসমূহের মধ্যে তিনিই কেবল লব্ধকাম হইয়া পরহিতানুধ্যানমগ্ন। তাহাও আবার কোনরূপ প্রত্যাশায় নহে। জগৎ তো কতবার নিজ কল্যাণ না বুঝিয়া তাঁহাদের উপর কত অনাচার অত্যাচার বিসদৃশ ব্যবহার করিয়াছে—ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহারাও প্রসন্নবদনে অক্ষুব্ধমনে আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে বিন্দু বিন্দু রুধিরপাত সহ্য করিয়াছেন—মরিয়াছেন—অস্থিতে অমোঘ বজ্রের সৃজন হইয়া জগতের জনসাধারণেরই রক্ষণ ও কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। হে অহেতুকদয়াসিন্ধো গুরো ! তুমি মরিয়াও অমর, সচল, জীবন্ত, ঘনীভূত শক্তি-প্রতিমা, জগৎ কেনই বা তোমার পদে স্বেচ্ছায় লুণ্ঠিত না হইবে ! কেনই বা তোমায় 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ' ইত্যাদি বাক্যে স্তব না করিবে !

ভারত বুঝিয়াছে, গুরু মনুষ্য নহেন, মনুষ্যমূর্তিতে বিদ্যারূপিণী তুমি। মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া আকার ও মূর্তিবিশেষ আশ্রয় করিয়া মানবের শিক্ষার্থে, হিতার্থে, মহত্ত্বাবিকাশার্থে করুণায় প্রকাশিত। আর মানুষী মূর্তিতে তোমার ঐরূপে কেন্দ্রীভূত হওয়া ? উহাও তোমার নানা লীলাবিলাসের মধ্যগত এক অপূর্ব লীলা-ভঙ্গ।

কোথায়, কি নিয়মে ঐ মহাশক্তিকেন্দ্রসমূহ সমুদ্ভূত হয়, উহাদের আবির্ভাবসময়ে দেশের পূর্বাপর অবস্থাই বা কিরূপ হইয়া থাকে ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

> "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"
>
> —গীতা

নিদাঘে পুঞ্জীভূত আতপতাপ বায়ুস্তরের উত্তেজনা সম্পাদন করিয়া এবং সহসা প্রসার আনয়ন করিয়া যেমন হঠাৎ প্রবল বাত্যার সৃজন করিয়া থাকে, অজ্ঞান-প্রসূত পুঞ্জীভূত অনাচার, অধর্ম, মানবের অন্তর্জগতে ঐরূপ আমূল পরিবর্তন আনিয়া মহাশক্তির কেন্দ্রী-ভূত প্রকাশের উদয় করিয়া দেয়। তখন মানবের মনে ভাবের স্রোত পরিবর্তিত

হইয়া তাণ্ডবতরঙ্গে বিপরীত গতিতে ধাবিত হইয়া থাকে। মানবমনের সঙ্কীর্ণ বাঁধ-সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়; কোথাও বা ভাবস্রোতে চিরনিমজ্জিত হইয়া জলধিতলগত আটলান্টা দ্বীপের ন্যায় অন্ধতমসাবৃত হয়। সেইজন্যই কি মনুষ্যমনের কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ ভাবরাশির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা ইহসংসারে গুরু সাজিয়া দোকানপাট খুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন, যথার্থ গুরুরূপী কেন্দ্রীভূত শক্তিবিকাশের সময় যুগে যুগে তাঁহাদের মহদ্ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়? জগতের 'দশকর্মান্বিত' ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, শিষ্যব্যবসায়ী গুরুকুল! সাবধান—আবার বর্তমান যুগে কেন্দ্রীভূত গুরুশক্তি প্রকাশিত হইয়া মানবমনের সঙ্কীর্ণতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতেছে। নূতন তরঙ্গে দেশ কোথায় কতদূরে ভাসিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে? ধর্মভানী দুনিয়াদার, তোমাদের দুর্দশা কতদূর গড়াইবে, তাহাই বা কে বলিবে?

মনের ভাবই কার্যপরিণামে স্থূল আকার ধারণ করে। উহা ব্যক্তিতে যেমন, জাতিতেও ঠিক তেমনি। আবার ব্যক্তির সমষ্টি সমাজসকলের আবাসস্থল দেশ, পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তদ্রূপ।

যথার্থ গুরুশক্তির উদয়ে নূতন ভাব-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজে কতই না পরিবর্তন সমুপস্থিত হয়। তখন পরিবর্তনমুখে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া ভয়ঙ্করী ভীমা সর্বত্র পর্যটন করেন এবং বহুকাল পর্যন্ত সাদরে পোষিত মানবমনের সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি মথিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দেন। তখন বিপরীত ভাবস্রোতে পড়িয়া কর্তব্য লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় একমত হয় না—স্বামী স্ত্রী বিপরীত-মতাবলম্বী—পিতা-পুত্র পরস্পরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়।*

অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম। যুগে যুগে আবহমানকাল ধরিয়া ব্যক্তির ভিতর, জাতির ভিতর, সমাজের ভিতর, দেশের ভিতর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর, কতভাবে কতরূপে কতই না হইল ও হইতেছে! ইহাই কি শাস্ত্র-কথিত দেবাসুরের দ্বন্দ্ব? কোনও কালে কি ইহার বিরাম হইবে? কোনও কালে কি জগৎ সত্য, ন্যায় এবং জ্ঞানকে সম্মুখ রাখিয়া প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য ও কার্য করিবে? যাঁহার জগৎ তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু হে ভীরু, এ সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইও না। হইয়াই বা করিবে কি? ভিতরে বাহিরে যেখানে চাহ, দেখ ঐ সংগ্রাম। আত্মহিত চাও, উহা করিতে হইবে; পরহিত চাও, উহাই; নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চাও, উহা না করিলে যথার্থ বিশ্রামলাভ হইবে না। তবে ওঠ, জাগ, কোমর বাঁধ, শক্তিরূপিণী তোমার সহায় হইবেন।

অন্য দেশে মা শতহস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে! তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তানসকলের প্রফুল্ল মুখ-কমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ; আচ্ছাদনবিরহিত, রোগে জর্জরিত তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্যের পদাঘাত-পীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে

*Matthew. X. 34-36

শতবার ধিক্কার দিতে থাক। কিন্তু দোষ কাহার ? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞানসম্ভূত সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে, আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত আছ। উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজায় অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, দেশের কল্যাণের জন্য আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে, আর তুমি অবিদ্যাসেবায় যথাসর্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসুখ লইয়া বসিয়া আছ। জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন ? শাস্ত্র যে তোমায় বার বার বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া, রুধিরপ্রিয়া। দেবীর ঐ ভাব যে তাঁহার ধ্যানমন্ত্রেই রহিয়াছে। ঐ শুন, ভারতের তন্ত্রকার তোমায় কিভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন—

"শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্॥
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥"

প্রতি কার্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থসুখত্যাগে আত্মবলিদানে তাঁহার তর্পণ কর, তাঁহাকে প্রসন্ন কর, দেখিবে শক্তিরূপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি পুনরায় ফিরিয়া চাহিবেন। তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অদম্য উৎসাহরূপে প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে জগন্মাতার নিত্য সহচরী দল—বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি, মেধা প্রভৃতি আবার তোমার উপর প্রসন্না হইয়া প্রতি কার্যে তোমার সহায়তা করিবেন।

এক-একটি নূতন ভাব গ্রহণ করিতে আমাদের কতই না দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যবহারিক জগতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব লইয়া ফ্রান্সের বিপ্লবের কথা এবং অধুনাতন জাপান-যুদ্ধের কথাই দৃষ্টান্তরূপে ভাবিয়া দেখ না। ব্যবহারিক, রাজনৈতিক জগতে যদ্রূপ, আধ্যাত্মিক জগতেও ঐ বিষয়ে ঠিক তদ্রূপ। সেইজন্যই কি গুরুরূপী মহাশক্তি-প্রকাশে ধর্মবিপ্লবের কথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ? কিন্তু প্রবল ঝটিকার পরেই প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করে, কার্যের পরই বিরামের স্বভাবতঃ উদয় হয় এবং ঐ প্রকার বিপ্লবের পরেই শান্তি ও জ্ঞান মনুষ্যসমাজে দৃঢ়তর অধিকার স্থাপন করিয়া বসে।

গুরুরূপী শক্তির উদয়ে যে আধ্যাত্মিক জগতে ভাববিপ্লব সংঘটিত হইবে ইহা নিশ্চয়। তবে ঐ ভাববিপ্লব যে ধীরপদসঞ্চারে দেশময়, সমাজময় কখনও অধিকার স্থাপন করিতে পারে না, তাহাও নহে। ঝঞ্ঝাতাড়িত বজ্র-বিলোড়িত বিচ্ছিন্নবক্ষ জলধি-জলে স্ফীতি ও তরঙ্গের প্রসার—উহা এক ভাব। আর চন্দ্রোদয়ে স্নিগ্ধ কিরণবিপ্লাবিত সমুদ্রবক্ষের উল্লাস ও স্ফীতি—উহা আর এক ভাব। অমিতাভ বুদ্ধ, জ্ঞানগুরু শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির উদয়কালের কথা তুলনায় স্মরণ কর—তাহা হইলেই ঐ কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অবতার জগদ্গুরু—মনুষ্যরূপে ঈশ্বর। মনুষ্যত্বে ঈশ্বরত্বের অপূর্ব মিলন—মানুষে

অমানুষী দৈবী শক্তির বিকাশ—শক্তিপ্রসূত সংসার-মহীরুহের ফুল্লবিকশিত পারিজাত। ঈশ্বর সংসারে সমগ্র শক্তির ব্যবহার, চালন ও যথার্থভাবে নিয়মন করেন, কিন্তু কখনও তাহার বশীভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত, স্তব্ধ বা মূঢ় হইয়া তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিত্ব প্রাপ্ত হয়েন না। হে জগদ্‌গুরো, মানবমূর্তি পরিগ্রহ করলেও তোমার জগৎকারণজ্ঞান এবং তৎসহিত নিজের একত্বজ্ঞানের কখনও লোপ হয় না। মায়ার ভিতর থাকিলেও তোমার তৃতীয় চক্ষু সর্বদা অনাবৃত থাকিয়া মায়ার পারের বস্তু নিরীক্ষণ করিতে থাকে আর মনুষ্যসাধারণকে মোহিত করিয়া দাসভাবে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে যত প্রকার শব্দস্পর্শাদি, তাহারাও তাহাদের প্রভাব সহস্র চেষ্টাতেও তোমার উপর কখনও বিস্তার করিতে পারে না। কেনই বা তোমায় নররূপে ঈশ্বর না বলিব ?

অবতার—জগদ্‌গুরু নররূপে ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বাবস্থায় সর্বভাবে পূর্ণ—নিজের কোন অভাব না থাকায় তৎপরিপূরণের জন্য কোন চেষ্টারও তাঁহার প্রয়োজন নাই, অথচ জগতের যাবতীয় চেষ্টার মূলই তিনি। হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম গুরো, তোমারও স্বরূপজ্ঞান সর্বদা প্রকাশিত। অথচ নিজের কোন অভাব না থাকিলেও তুমি মনুষ্য-সমাজের কল্যাণার্থ দিবারাত্র চেষ্টা করিয়া থাক। তোমার আহার, বিহার, নিদ্রা, জাগরণ, চেষ্টা, বিরাম, সংসার, সন্ন্যাস প্রভৃতি সকলই অপরের জন্য। কেনই বা তোমাকে মনুষ্যরূপে ভগবান না বলিব ?

অবতার—জগদ্‌গুরু মানুষী তনুতে ঐশী শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমার যেমন 'ইতি' নাই, তোমারও তদ্রূপ। তোমা ভিন্ন আর কে পূর্ব-সংস্কার দৃঢ় পাষাণসদৃশ মনুষ্যমনকে ইচ্ছামাত্রে গলাইয়া, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া, নূতন সত্যধারণোপযোগী গঠন দিতে পারে ? কেই বা শরীরস্পর্শ-মাত্রেই অহংগ্রন্থি শিথিল করিয়া মানুষকে কামকাঞ্চনাতীত ভাব ও সমাধি-রাজ্যে বিচরণ করাইতে পারে ? কেই বা "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"-রূপ পরমধামে উপনীত হইবার নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট অধিকারীর নিকট তল্লাভ সুগম করিয়া দিতে পারে ? কেই বা সকল ভাবের সমান মর্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাদের চরম লক্ষ্য যে একই, একথা নিজ জীবনে প্রমাণিত করিতে পারে ? কেই বা বিপরীত ভাব ও বিপরীত মতসমূহের মধ্যে "সূত্রে মণিগণা ইব" সমন্বয়সূত্র প্রত্যক্ষ করাইয়া মনুষ্যজ্ঞানের উদারতা সম্পাদন করিয়া দিতে পারে ? কেই বা বহুজনহিতায় যুগে যুগে স্বেচ্ছায় মনুষ্যভাবাপন্ন হইয়া অসীম উৎসাহে আদর্শের পর আদর্শসমূহ নিজ জীবনে পরিণত করিয়া মনুষ্যমনে তদনুরূপ অনুষ্ঠানের সাহস ও বলের উদ্দীপন করিয়া দিতে পারে ?

হে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তভাব, অপারমহিম, কেন্দ্রীভূতবিদ্যারূপ আত্মারাম গুরো, তোমার কৃপায় ভারত সর্বকাল পুণ্যক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র, জ্ঞানবীর্যের আকরভূমি। তোমাকে ভুলিয়াই ভারতের এ দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞান। সে ভুলিলেও তুমি তাহাকে ভুলিয়া থাকিও না। গুপ্তভাবে * উদিত হইয়া ভারতের এবং তদ্দ্বারা সমগ্র জগতের কল্যাণের

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ আপন অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আপন অবতারত্বের কথায় বলতেন— 'রাজা যেমন প্রজাদের অবস্থা জানবার জন্য ছদ্মবেশে শহর দেখতে বেরোয়, এবার সেই রকম জানবি।"

জন্য যে অমোঘ জ্ঞান ও ভক্তিবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছে, যাহার কিছুমাত্র পাশ্চাত্ত্যে পড়িয়া তথায় ধর্ম্ম-ভাব-বিপ্লব সম্পাদন করিতেছে, হে দেব, হে দয়ানিধে, উহা যাহাতে ভারতে ফলেফুলে সমাচ্ছন্ন মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে বল, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়াদিরূপ ছায়া বিতরণ করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্দশা ও সংসারতাপের অবসান করে, তাহাই কর—তাহাই কর।

আর তুমি হে শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতা, তুমিও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও বীরেশ্বর † শ্রীবিবেকানন্দ-প্রচারিত মহাসত্যসকল যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই অপার-মহিম অপ্রতিহতপ্রভাব গুরুশক্তির কথা ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারে দৃঢ়বদ্ধপরিকর হইয়া "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"-রূপ অভয়বাণী-উচ্চারণে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার কর। নবযুগে তোমাতে নবশক্তি সঞ্চারিত হউক—প্রকাশিত হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব

শক্তিপ্রতীক—অবতার, গুরু, শিষ্যপূজা, মন্ত্রদাতা, উপগুরু ও শিক্ষক

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "গাছ পাথর নিয়ে ভগবানের বিশেষ লীলার প্রকাশ নয়, কিন্তু মানুষের মনই তাঁর বিশেষ লীলার স্থান।" আবার বলিতেন, "যদি মানুষ না থাকত, ভক্ত না থাকত তো ভগবানকে পুঁছত কে, জানত কে, তাঁর অপার শক্তি, মহিমার কথা বেদবেদান্ত লিখে প্রচার করত কে? ভক্ত আছে, তাই ভগবান আছেন।" আবার বলিতেন, "ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনে এক, একে তিন।"

বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থনিচয় বা শক্তি-প্রতীকসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমেই মানবে শক্তিপূজার অবতারণা করিয়াছি। ইহাতে কেহ যেন না অনুমান করেন যে মানবের ভিতরেই বুঝি মানব প্রথম বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়া তদুপাসনায় নিযুক্ত হয়—গুরুপূজাই বুঝি সে সর্বাগ্রে করিতে শিখিয়াছিল। মানব-প্রকৃতির ইতিহাস বলে—আমরা অত সহজে সরল পথে চলি না; অতি সন্নিকট পদার্থই আমাদের অতিদূরে বর্ত্তমান; নিজের ঘর না সামলাইয়া আগেই পরের ঘর সামলাইতে অগ্রসর হওয়া আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় স্বভাব। নতুবা যথার্থ জ্ঞান ও সভ্যতা এতদিন জগতে অনেক দূর অগ্রসর হইত।

মানবে প্রকাশ্যভাবে শক্তিপূজা অল্পকালই করিতে শিখিয়াছে। ভারতেই ঐ পূজার প্রথম অভ্যুদয় এবং ভারত হইতেই জগতে ঐ পূজার প্রথম প্রচার। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "ভারত হইতেই প্রবল ধর্ম্মতরঙ্গ কালে কালে উত্থিত হইয়া জগতের সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে এবং পরেও চিরকাল হইতে থাকিবে।" বৈদিক যুগ

† স্বামী বিবেকানন্দের পিতামাতা-প্রদত্ত অন্যতম নাম।

হইতেই উহার আভাস পাওয়া যায়; বৌদ্ধযুগের কথা তো নিঃসন্দেহে প্রমাণিত এবং বর্তমান যুগের বেদান্তপ্রচার আবার আমাদের চক্ষুসমক্ষেই অতীত। ইতিহাস যেখানেই কালের অন্ধকার-ভেদে সমর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে, সেখানেই স্বামীজীর ঐ কথা প্রমাণিত হইতেছে।

ভারতেই গুরুরূপী ঐশী শক্তির মানবে প্রথম বিকাশ। ব্রহ্মজ্ঞ বৈদিক ঋষিকুলই তাহার প্রমাণ। অবতাররূপী মহাশক্তিকেন্দ্র ভারতেই প্রথম উদিত হইয়া জগতে মহাবিপ্লব আনয়ন এবং সভ্যতা ও জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছিল— ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার পরবর্তী প্রচারকগণের কার্যেই উহা প্রমাণিত। নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রচারকগণের তাতার, চীন ও জাপানাধিকার, মহারাজ ধর্মাশোকের ইজিপ্ট, আসিয়া-মাইনর, পারস্য প্রভৃতি দেশে প্রচারক-প্রেরণ এবং এখনও বিদ্যমান শাসনস্তম্ভরাজির কথা স্মরণ কর। বহুকালাভ্যস্ত শ্রীগুরুর পূজা এখনও ভারতের মজ্জাগত প্রাণ।

অবতার, আধ্যাত্মিক রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, সর্বদেশের সর্বকালের লোকগুরু কালে কালে অনেক হইলেও একই ব্যক্তি, কখনও গুপ্ত কখনও ব্যক্তভাবে উদিত হইয়া চিরকাল জনকল্যাণে রত।

ঐশী সম্পূর্ণতা এবং মানুষী দুর্বলতার অপরূপ মিলনভূমি তাঁহার শরীর ও মন। স্থূলবুদ্ধি মানবমনের বিপরীত ধর্মভাবের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া পুরাণকার হরিহর, অর্ধনারীশ্বরাদি অপূর্ব দেবমূর্তিসকলের কল্পনা করিয়াছেন—বিপরীতধর্মশীল অপূর্ব অবতারবিগ্রহই কি তাঁহার সে কল্পনার মূলে?

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"—গীতা

অবতাররূপী গুরুকে সম্যক্ জানিতে ও চিনিতে কে সমর্থ? তিনি সর্বকালেই পরমাত্মার ন্যায় 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—যাহার নিকটে ইচ্ছা কৃপায় স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ তাঁহারই শ্রীমুখাৎ শুনিয়া শ্রুতি স্মৃত্যাদি ধর্মশাস্ত্র যতটুকু লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপ মর্ম আমরা নিম্নে প্রদান করিয়া জগদ্গুরু অবতারপুরুষে শক্তিপূজার কথা সমাপন করিব।

প্রথম। কে তিনি, পূর্বে কি ছিলেন, এ জন্মে মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার আগমনকারণই বা কি?—ইত্যাদি জ্ঞানের স্ফূর্তি অবতারপুরুষে আশৈশব অল্পাধিক বর্তমান থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ঐ জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা সমধিক বিকাশ ছিল—একথা ভারতের ধর্মেতিহাস-প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয়। অভাববোধই আমাদের যাবতীয় চেষ্টার মূলে এবং তদভাবপূরণ না হইলেই দুঃখ! নিজের অভাববোধ না থাকায়, অপরের অভাববোধ হইতে অথবা অপরের অভাববিশেষ দূর করিতেই অবতারপুরুষে সমস্ত চেষ্টার আবির্ভাব হয়। সে একাঙ্গী চেষ্টার অমিত বেগ পুরুষসাধারণের অভাববোধপ্রসূত চেষ্টাতেও কদাপি লক্ষিত হয় না। আজীবন নিঃস্বার্থ চেষ্টা করিতে একমাত্র তাঁহারাই সমর্থ।

তৃতীয়। মনোরাজ্যে তাঁহাদের একাধিপত্য। আপন মনের উপর যদ্রূপ, অপরের মনের উপরও তদ্রূপ। অপরের মনের কর্মসঞ্চিত পূর্বসংস্কারসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া স্বল্পকালেই নূতনভাবে নূতনাদর্শে গড়িতে তাঁহারাই সমর্থ। শরীরস্পর্শমাত্রেই অপরের মনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিয়া সমাধিস্থ করা বা ভাববিশেষ উপলব্ধি করানর কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে সর্বজাতির ধর্মেতিহাসেই বিদ্যমান।

চতুর্থ। পরমাত্মার প্রত্যক্ষীকরণের নূতন পথবিশেষ আবিষ্কার করা, অথবা জনসমাজে পূর্ববিদিত পথ বা ধর্মসমূহের ভিতর নূতন সম্বন্ধসূত্রাবিষ্কার করা এবং ঐ ভাবের নূতনাদর্শ নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়া জনসমাজে প্রবর্তিত করা তাঁহারাই সনাতনকাল হইতে করিয়া আসিতেছেন।

পঞ্চম। ধর্মাদর্শ ভিন্ন অবতারপুরুষের জীবনে তৎকালিক সমাজের নৈতিকাদর্শও স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট থাকে। নৈতিকাদর্শ ধর্মাদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে ভিন্নাকার ধারণ করে—একথাটি হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই আমরা অনেক সময়ে সকল অবতারপুরুষের জীবনই একরূপ নৈতিকাদর্শে গঠিত দেখিবার প্রত্যাশা করিয়া থাকি এবং তাঁহাদের অলোকসামান্য চরিত্র ঐরূপে তুলনায় পাঠ করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হই।

ষষ্ঠ। অবতার মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে বলিয়া যান, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—"Come unto Me, all ye that labour and are heavy-laden, and I will give you rest" * "হে ত্রিতাপাবসন্ন জীবগণ, আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমাদের শান্তি দিব" এবং তিনি যে লোকগুরু, ঈশ্বরাবতার—এ কথা প্রাণে প্রাণে স্বয়ং অনুভব করেন ও অপরকেও নিজ শক্তিবলে তদ্রূপ করাইয়া থাকেন।

অবতারপুরুষের সময়ে সময়ে গুপ্তভাবে আবির্ভাবের কথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে বলিতেন, "যেমন রাজা সেজে-গুজে লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যভাবে ঢেঁড়া পিটে নগর দেখতে বেরোন, আবার কখনও ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা ও কার্যকলাপ দেখবার জন্য বেরোন এবং যেই প্রজারা টের পেয়ে কানাকানি করতে থাকে—'ইনিই রাজা—ছদ্মবেশে আমাদের ভিতর এসেছেন,' অমনি সেখান হতে পালান, সেইরূপ অবতারের ব্যক্ত এবং গুপ্ত আবির্ভাব জানবি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একটি কথা অবতার সম্বন্ধে বলিতেন—যথা, "অবতারপুরুষের কোন কালে মুক্তি নেই।" "যেমন সরকারী লোক জমিদারির যেখানে গোলযোগ উপস্থিত হবে, সেখানেই তাকে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতে হবে এবং গোল থামাতে হবে, সেইরূপ ব্রহ্মময়ীর জমিদারির (জগতের) যেখানেই গোল উপস্থিত হবে, সেখানেই অবতারপুরুষকে আবির্ভূত হয়ে লোকের দুঃখ-মোচন করতে হবে।" এ কথায় কেহ যেন না অনুমান করেন যে, তবে বুঝি অবতারপুরুষকে চিরকালই মায়াধীন থাকিতে

* Mathew, XI—28

হন। তিনি স্বভাবতঃই মায়াধীশ, আত্মারাম—কোন কালেই বদ্ধ হন না; অতএব তাঁহার মুক্তি কখন, কিরূপেই বা হইবে!

অবতারই আধ্যাত্মিক জগতে একমাত্র পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের পূজা জগৎ আবহমানকাল হইতে অবনতমস্তকে করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই করিবে। তাঁহাদের মনুষ্য-শরীর পরিগ্রহে সমগ্র মানবকুল ধন্য হইয়াছে। হে ভারত, যুগে যুগে তুমিই তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়া ধর্মজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছ। তাঁহার সম্মান ও পূজা করিতে কখনও ভুলিও না।

ঈশ্বরাবতারের পূজা ভিন্ন আধ্যাত্মিক জগতে ভারত সিদ্ধপুরুষ, মন্ত্রদাতা, কুলগুরু এবং উপগুরু প্রভৃতিরও চিরকাল সম্মান এবং পূজা করিয়া আসিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধে এখানে দুই চারিটি কথা বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধপুরুষ ঈশ্বরাবতার নির্দিষ্ট পথাবিশেষে অগ্রসর হইয়া পূর্ণকাম ও জীবন্মুক্ত হন। ঐকালে তাঁহাতেও আর স্বার্থচেষ্টা অসম্ভব হইয়া উঠে, কারণ যথার্থ ধর্মানন্দলাভে তাঁহার—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"—গীতা

—ঐ প্রকার অবস্থালাভ হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় সুখদুঃখাদি অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া যায়। অবতারপুরুষের ন্যায় শক্তির প্রকাশ না হইলেও তাঁহাতে গুরুশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া নিয়ত লোককল্যাণে নিযুক্ত থাকেন। ধর্মজগতে নূতন পথাবিষ্কারে সমর্থ না হইলেও তাঁহার দর্শনে কামকাঞ্চনৈকদৃষ্টি স্থূলদর্শী মানব ছায়াপ্রায় ধর্মাদর্শকে সচল, জীবন্ত বস্তু বলিয়া অনুভব করিতে থাকে। ঈশ্বরাবতারের ন্যায় স্পর্শ বা ইচ্ছামাত্রেই ধর্মজীবনদানে সমর্থ না হইলেও, তাঁহাদের অপরের ধর্মজীবন উদ্দীপিত করিবার ইচ্ছা নিষ্ফল হয় না; এবং জাতিবিশেষের জীবনে এবং তন্মধ্য দিয়া অন্যান্য জাতির জীবনে উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল ধর্মবন্যা খরস্রোতে প্রবাহিত করিয়া অবতার-পুরুষের ন্যায় অপূর্ব পরিবর্তন সংসাধিত করিতে না পারিলেও, তাঁহারা আপন চতুষ্পার্শ্বস্থ জনসাধারণের মনে ধর্মস্রোত প্রবাহিত করিয়া ধন্য করিয়া থাকেন। সিদ্ধাত্মা মন্ত্রাদি অবলম্বনে অপরে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। অবতারের কথা ছাড়িয়া দিলে, ইঁহাদের ন্যায় অপর কোন মানবেই ধর্মশক্তি সমধিক বিকশিত দেখা যায় না। অবতার ধর্মপ্রবর্তক; সিদ্ধাত্মা তৎপ্রবর্তিত ধর্মে জীবন গঠন করিয়া সেই ধর্মকে পুষ্ট রাখেন। ইঁহাদের পূজা করিলে, ইঁহাদের আদর্শে জীবন গঠন করিলে যে মানব ধন্য কৃতার্থ হইবে, এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

স্থূল চক্ষুর গোচর না হইলেও ধর্ম জীবন্ত শক্তি। অনুষ্ঠানে উহার ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে এবং অপরকে অনুভব করাইতে পারা যায়। বিশেষশক্তিসম্পন্ন পুরুষ আপন শরীর মন হইতে ঐ শক্তি অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন এবং ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক-সম্বন্ধীয় যে সকল অনুভব জীবনে প্রত্যক্ষ করা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল,

সে সকলও অপরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন। বহুকাল হইতে এসকল কথা প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

আবার বহুকালব্যাপী চেষ্টা, ধ্যান ও একাগ্রতার দ্বারা ভাববিশেষ উপলব্ধি করিয়া তাহাকে শব্দবিশেষের সহিত এমন সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা যাইতে পারে যে, উহার উচ্চারণমাত্রেই ঐ ভাববিশেষ উজ্জ্বল বর্ণে অপরের মনে উদিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব অনুভব প্রত্যক্ষ করাইবে এবং প্রত্যেক অনুভব যেমন কল্যাণ আনন্দ বা দুঃখ প্রসব করিয়া মানব-জীবন পরিবর্তিত করে, ঐ চিত্রানুভবেও তদ্রূপ তাহার মন বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া বিশেষ আনন্দ বা দুঃখের অধিকারী হইবে। উহারই নাম মন্ত্রশক্তি। ঐ মন্ত্রশক্তির প্রভাবও ভারত বহুকাল হইতে অবগত হইয়া তদারাধনায় নিত্য নিরত আছে। শঠ-ধূর্তের হস্তে সময়ে সময়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, উপযুক্ত গুরুসহায়ে ভারতে ঐ সকল বিষয় পূর্বকালে এবং অদ্য বহুবার পরীক্ষিত এবং সত্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মন্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাসই মন্ত্রদাতা গুরূপাসনার মূলে বর্তমান।

অবতারপুরুষোচ্চারিত বাক্যসকলই যথার্থ মন্ত্র ও আশুফলপ্রদ; কারণ উহাতে তাঁহাদের বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে। সহস্র বৎসর বা তদধিক কাল পরেও সে শক্তির স্বল্পাধিক পরিচয় পাওয়া যাইতে থাকে। সিদ্ধপুরুষোচ্চারিত মন্ত্রও দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই ফল প্রত্যক্ষ করায়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। সাধুসাধকোচ্চারিত মন্ত্রের ফল উপলব্ধি করিতে তদপেক্ষাও অধিক কাল লাগে।

মন্ত্রফল উপলব্ধি করিতে কেবল যে উপযুক্ত গুরু আবশ্যক তাহা নহে। "আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ" ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন উপযুক্ত শিষ্যেই গুরুশক্তি সঞ্চারিত হইলে আশু ফল প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকে। সুফল লাভ করিতে এথানে উর্বর জমি, উত্তম কর্ষণ, উত্তম বীজ এবং তদুপরি ঐ বীজের যত্নের সহিত সংরক্ষা এবং জলসেচাদির প্রয়োজন। বীজ উত্তম হইলেও যে অনেক সময় মন্ত্রফল প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার কারণ ঐ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বলিতেন, "নোঙ্গর ফেলিয়া দাঁড় টানিলে যেমন নৌকা কথন অগ্রসর হয় না, সেইরূপ ঐ সকলের অভাব হইলে ভাবভক্তি-উপলব্ধির প্রত্যাশাও বিফল হয়।"

মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস বিষয়াসক্ত মনের অনেক সময় অপকারেরও কারণ হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির মন অপর ব্যক্তির মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে জানিয়া কামক্রোধান্ধ পুরুষ অনেক সময়ে নিজ স্বার্থতৃপ্তির আশায় ঐ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা দুর্বল নীচচেতা পশুবৃত্তি মানব আপন পাশব-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য পবিত্র গুরু নামের অযোগ্য অপর নীচতর পুরুষের সহায়ে ঐ শক্তি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ঐরূপ চেষ্টা কদাচিৎ সফল হইলেও ঐ দুর্বৃত্তেরাই পরিণামে নানাবিধ দুঃখ, অশান্তি এবং মানসিক অবনতিরূপ দণ্ডভোগ করিয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক স্থলে পবিত্র ঐশী শক্তির আরাধনার বিশেষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মারণ, উচাটন, বশীকরণাদির বিশেষ ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, পাশবপ্রকৃতি মানব উহা

পরে বিশুদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া ধর্মের নামে প্রবৃত্তির পৈশাচিক অভিনয় দেখাইয়া কল ক্ষত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনকালে ভারতে যে ঐ প্রকার দুর্বৃত্তের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল তাহাৎ ইতিহাস-প্রমাণিত। ঐ ধর্মগ্লানি দূর করিবার জন্যই জ্ঞানগুরু শিবাবতার শঙ্করাচার্যের এবং ভক্তিপ্রাণ শ্রীচৈতন্যের ভারতে উদয়। তাঁহারাই পুনর্বার শাক্ত-উপাসনার পবিত্রাদর্শ জনসাধারণে দেখাইয়া শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্রের যথার্থ মর্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য-লিখিত শিবদুর্গাদি-বিষয়িণী স্তবরাজি ও বিষ্ণু-সহস্রনামের ভাষ্য এবং শ্রীচৈতন্যের অন্নপূর্ণাদেবীকে আপন ইষ্টরূপে উপাসনাতেই উহা অবগত হওয়া যায়। অন্নপূর্ণা শ্রীশঙ্করেরও যে ইষ্টদেবী ছিলেন ইহারাও প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "প্রত্যেক অবতারই সযত্নে শক্তির উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। শক্তির বিশেষ অনুগ্রহলাভ না করিয়া কখনই লোকগুরুত্ব লাভ করিতে পারা যায় না, অথবা ধর্মভাগীরথীর প্রবল তরঙ্গে দেশ আপ্লাবিত করিয়া জনসাধারণে যথার্থ ধর্মপ্রচার করিতে পারা যায় না।" শ্রীচৈতন্যের বেদান্তভাব বা শক্তি উপাসনার কথা শুনা যায় না বলিয়া আপাততঃ উত্থাপিত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের বলিয়াছিলেন, "যেমন হাতীর দুই প্রকার দাঁত থাকে—এক প্রকার বাহিরে, শত্রু আক্রমণ করিবার জন্য এবং অপর প্রকার ভিতরে খাইবার জন্য—শ্রীচৈতন্যেও সেইরূপ দুই প্রকার ভাব ছিল। ভক্তি তাঁহার বাহিরের ভাব—সাধারণের নিকট প্রচারের জন্য এবং বেদান্ত ও শাক্ত-উপাসনা তাঁহার ভিতরের ভাব—উহা নিজের জন্য; কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ এবং অন্নপূর্ণাদেবীর উপাসনাতেই উহা বুঝা যায়।"

যে শক্তিরই উপাসনা কর, অতি পবিত্রভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। স্বার্থান্বেষণের নামগন্ধ পর্যন্ত মন হইতে দূরে রাখিতে হইবে। নতুবা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবং অনেক সময় বিপরীত ফলের উদয় হইয়া উপাসককে অবসন্ন করে। এ কথাটি মনে সর্বদা জাগরূক রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অযথা শক্তিপ্রয়োগে বা নিজের স্বার্থসুখের জন্য শক্তিপ্রয়োগে পরিণামে শক্তিহানি এবং দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইবে নিশ্চয়। অগ্নি লইয়া খেলা করিতে যাইয়া অনেকে অনেক সময় নিজের গাত্র ও গৃহাদি দগ্ধ করিয়া বসে। স্থূল শক্তিতে উহা যেমন, সূক্ষ্ম শক্তির সহিত খেলাতেও ঠিক তদ্রূপ, বরং অধিক কুফল প্রসব করে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সর্বপ্রকার শক্তির প্রয়োগই জানিয়া শুনিয়া শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সাবধানে করিতে হইবে। শারীরিক শক্তির অপব্যয়ে কত লোকেই না অকালবৃদ্ধ হইয়া আক্ষেপভারপীড়িত জীবন বহন করিয়া আপনাকে ও সমাজকে দুর্বল করিয়াছেন। মানসিক শক্তির অপব্যয়ে কত লোকেই না আবার মেধাশূন্য, অস্থিরমনা ও উন্মাদপ্রায় হইয়া আপনাকে এবং অপরকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যয়ে বর্তমানে যে ভারত ও ভারতেতর দেশসমূহ পশু, বর্বরতুল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। হে উপাসক, এসকল দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত সাবধানে শক্তিপূজায় অগ্রসর হইও।

মন্ত্রদাতা-গুরূপাসনার কথাপ্রসঙ্গে বঙ্গের লৌকিকাচার—কুলগুরু ও গুরুবংশের উপাসনার কথা মনে উদিত হয়। আমরা উহাকে বঙ্গেরই আচার-বিশেষ বলিলাম; কারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঐরূপ আচার আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। সেখানে সংসারত্যাগী সাধু বা নিষ্ঠাবান ধার্মিক গৃহস্থ—যাঁহার উপরেই কোন ব্যক্তির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাঁহারই নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণের রীতি প্রচলিত। সংসারত্যাগী গুরু হইলে তিনি যে কোন্ প্রদেশের কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ঠিকানাই অনেক সময় পাওয়া যায় না। কাজেই গুরুকুলের উপাসনা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং ধার্মিক গৃহস্থ গুরু হইলে, তাঁহার জীবৎকাল পর্যন্ত বা তাঁহার শরীরত্যাগের কিছু পর পর্যন্ত শিষ্যের ভক্তি ঐ বংশের উপর প্রবাহিত থাকে, এই পর্যন্ত। কিন্তু গুরুর পুত্র উপযুক্ত হউন বা না হউন এবং শিষ্যপুত্রের তাঁহার উপর শ্রদ্ধার উদয় হউক বা না হউক, তাঁহার নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরলাভের সহায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে—এ প্রথার প্রচলন নাই।

বঙ্গে সংসারত্যাগী সাধুর সংখ্যা অল্প হওয়াতে এবং পিতার গুণ সন্তানে উপগত হয়—এই বিশ্বাস থাকাতে, ঐরূপ প্রথা প্রচলিত বলিয়া বোধ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পুণ্যাবির্ভাবের পূর্বে ভদ্রবংশীয়দের সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম-গ্রহণের কথা প্রায় শ্রবণগোচরই হইত না। বিরল কেহ কেহ উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাগত কোন কোন সাধুসন্ন্যাসীর ভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐ পথ অবলম্বন করিলেও প্রায় জন্মের মতো দেশত্যাগ করিয়া যাইত। কাজেই তাহাদের দ্বারা বঙ্গে আর ঐ সম্প্রদায় বৃদ্ধি পাইত না। আবার বঙ্গে তন্ত্রের সর্ববিধ প্রচলন থাকাতে এবং ঐ মতে সকাম ধর্মোপাসনায় আশু ফললাভ হয় প্রচার থাকাতে, নিষ্ঠাবান উদারমনা গৃহস্থকে গুরুরূপে বরণ করার প্রথাই প্রচলিত হয়।

বঙ্গের ঐ আচার এখন অনেকাংশে দূষণীয় হইলেও যতদিন না গুরুবংশের শিষ্যব্যবসায়বৃত্তি বা তদ্দ্বারাই জীবিকানির্বাহকরণরূপ কুপ্রথার প্রচলন হয়, ততদিন পর্যন্ত এ প্রদেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে। উহা গুরুবংশের সন্তানগণের ভিতর গুরুনামের উপযুক্ত হইবার বাসনা প্রবল রাখিয়া বিদ্যা ও সদাচার পুষ্ট রাখিয়াছিল। আবার সমাজের এক শ্রেণী অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে কেবল ধর্মচর্চাতে নিযুক্ত থাকায় ধর্মাদর্শও তাঁহাদের ভিতর উজ্জ্বল থাকিয়া লোককল্যাণ সাধন করিত। ঔপনিষদিক সময়ের ঋষিকুল গৃহস্থ হইলেও ঐরূপ অবসরলাভে ধর্মচর্চায় নিযুক্ত থাকিয়া সমগ্র দেশ এবং জাতির যে কত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন তাহা সর্বজনবিদিত।

পূর্বে বঙ্গে অন্নও সুপ্রচুর ছিল। মুসলমানরাজ্যাধিকারীতে সময়ে সময়ে টাকায় আট মণ চাউলের কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এখন অন্ন পর্যাপ্ত জন্মিলেও বাষ্পীয় শকটের কৃপায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বাষ্পীয় পোতারোহণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানির প্রবল স্রোতে বঙ্গের অন্ন অন্যত্র নীত হয়। তদুপরি বিলাতী সভ্যতার মহার্ঘতা, বিদ্যাশিক্ষার বিপরীত ব্যয় প্রভৃতি নানা কারণে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই

ব্যতিব্যস্ত। উভয়কেই নানা উপায়ে কথঞ্চিৎ জীবিকানির্বাহ করিতে হইতেছে। পরিশ্রম না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া জীবিকানির্বাহ গুরুকুলের বহুকালাভ্যস্ত। সেজন্য তাঁহারাই সমধিক বিপদে পতিত হইয়াছেন এবং মিথ্যাভাষণ, চাটুকারিতা প্রভৃতি নীচ উপায়-সমূহ অবলম্বন করিয়া শিষ্যবর্গের মনোরঞ্জন দ্বারা অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া, তাঁহাদের অনেকেই এককালে ধর্মতেজোবিহীন হইয়া হতশ্রী ও ইতর হইয়া পড়িয়াছেন। উপযুক্ত গুরুর অভাবে শিষ্যের ভক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। এখন এ প্রথার উচ্ছেদ অনিবার্য এবং উচ্ছেদ হইলেও দেশের অকল্যাণ হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আবার দেখা যায়, অবতার অথবা বিশেষশক্তিসম্পন্ন ধর্মাত্মা মহাপুরুষ যে বংশ পবিত্র করেন, তাহার প্রায়শঃ লোপ হইয়া থাকে ; অথবা সে বংশে আর সেরূপ শক্তি-মান পুরুষের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "Genius বা বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষ কোনও বংশে জন্মিবার কালে ঐ বংশের পূর্বাপর যাবতীয় শক্তি নিঃশেষে আকর্ষিত হইয়া তাঁহাতে সমাবিষ্ট এবং প্রকাশিত হয় ; সে জন্যই তাঁহার জন্মের পর ঐ বংশে বাতুল, শ্রীহীন বা অতি সাধারণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমে ঐ বংশের অনেক স্থলে লোপও হইয়া যায়।" সেইজন্য অবতার বা সিদ্ধপুরুষ যে বংশ পবিত্র করিয়া থাকেন, তাহার উপর স্বতঃই লোকের শ্রদ্ধাভক্তি প্রবাহিত হইলেও উহাতে ধর্মশক্তির প্রকাশ সর্বকাল স্থির থাকে না। উহাও বোধ হয় শিষ্যকুলের গুরুকুলের উপর ক্রমশঃ ভক্তিহীনতার অন্যতম কারণ।

মন্ত্রদাতা গুরু একজন হইলেও শিষ্য তাঁহার নিকট যাহা শিক্ষিতব্য, তাহা শিক্ষা ও নিজ জীবনে সাধন করিয়া, ধর্মবিষয়িণী অপর শিক্ষাসমূহ অপর গুরুর নিকটে যে সম্পূর্ণ করিতে পারে, ইহা বেদাদি সর্বশাস্ত্রের বিধান। যাঁহারা ঐরূপ শিক্ষার সহায়তা করেন, তাঁহারাই উপগুরু নামে প্রসিদ্ধ।

আধ্যাত্মিক জগতে গুরূপাসনা ভিন্ন ভারতে ব্যবহারিক অপরা বিদ্যা—যথা, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যাদি বা অর্থকরী বিদ্যার শিক্ষয়িতারও বিশেষ সম্মান এবং পূজা বিধান আছে। বর্তমান কালে উহার বিশেষ অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। উহাতে গুরু এবং শিষ্য অথবা শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই দোষ বর্তমান বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষক ছাত্রদিগকে নিজ তনয়ের ন্যায় ভালবাসা ও স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন না, ছাত্রেরাও শিক্ষককে পিতার ন্যায় ভক্তি ভালবাসা প্রদর্শন করে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধাহীনতাই আমাদের শিক্ষাজগতে সর্বনাশ সাধন করিতেছে এবং শ্রদ্ধার অভাবেই আমাদের বালকদিগের যথার্থ শিক্ষালাভ হইতেছে না।" ছাত্র ও শিক্ষকের ভিতর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্বন্ধ থাকাতে এবং বিদ্যা যে কেবল অর্থো-পার্জনের জন্য নহে—জ্ঞানলাভের জন্য, এই ভাব বর্তমান থাকাতেই ইওরোপে অধুনা বিদ্যার এত উন্নতি হইয়াছে। শিক্ষাকালে গুরুর সহিত একত্র বাসের এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি যাহাতে ভক্তির উদয় হয়, সে সকল বন্দোবস্তের অভাবই ঐ প্রকার শ্রদ্ধাহীনতার কারণ বলিয়া বোধ হয়। পুরাকালে ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ

গুরুকুলে বাস করিয়া যে কতদূর যথার্থ শিক্ষালাভ করিত, তাহা পুরাণেতিহাস-পাঠে জানিতে পারা যায়।

মানবে গুরুরূপিণী ঐশীশক্তি আবির্ভূতা হইয়া মানবজাতির পরমকল্যাণসাধনে যে প্রবৃত্তা হন, অথবা বর্বর, বন্য মানবকে সমাজ, নীতি, বিদ্যা, ধর্মাদি আলোক-দানে দেবতা করিয়া তুলেন—একথার পরিচয় ভারত যেদিন হইতে পাইয়াছে, সেই দিন হইতেই বুঝিয়াছে গুরু মনুষ্য নহেন—গুরু নর-শরীরে ঐশী বিকাশ। সেদিন হইতেই "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" প্রভৃতি মন্ত্রের প্রচার। সেই সময় হইতে প্রচার—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—শ্বেতাশ্বতর।

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। হে ভারত, শ্রীগুরুর মূর্তিতে শক্তিপূজা করিতে যতদিন তুমি না ভুলিবে ততদিন পৃথিবীতে এমন কে আছে যে তোমার জাতীয় জীবন বা শক্তির লোপ করিতে পারে? গুরুবলে বলীয়ান, গুরুরূপী-ধ্রুবতারা-নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হও।

আর তুমি, হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম গুরো, তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু সম্যক্ প্রস্ফুটিত কর। তোমাকে বার বার প্রণাম করি। তোমার কৃপায় প্রত্যেক ভারত-ভারতী নবীন আধ্যাত্মিক জীবনের দিব্যভাবের অমিততেজে সম্যক্ উদ্বুদ্ধ হউক এবং শ্রদ্ধাসহকারে তোমার পূজা করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থবলিদানে সমর্থ হউক। হে শ্যামা, গুরুরূপিণি! সদা শ্রত ভারতে নবযুগে নবশক্তি সঞ্চারিত কর, যাহাতে তোমার শ্রীমূর্তির জীবন্ত পূজাপ্রচারে সে চিরকৃতার্থ হইতে পারে, অপরকেও তদ্রূপ করিতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

শক্তি-প্রতীক—দেব, মানব এবং অন্যান্য

সর্বকালে যে-কোন বস্তু বা ব্যক্তি সাধককে গন্তব্যের নিকটবর্তী করিয়াছে বা ধর্মলাভের—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব মানবাত্মা ও শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞানলাভের সহায়ক হইয়া তদ্বিষয়ক উচ্চভাবসমূহ তাহার ভিতর উদ্দীপিত করিয়াছে, ভারত তাহাকেই প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্য সোপানে আরোহণ করিয়াছে। সর্বদেশে সর্বজাতির ভিতরেই সত্যলাভের উহাই ক্রম। তবে পৃথিবীর অন্য সকল জাতি নিম্ন সত্য হইতে উচ্চতর সত্যান্তরে উপনীত হইয়া প্রথমটিকে মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে আর তাহার সহিত সম্পর্কমাত্র রাখে নাই; শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভারত তাহা না করিয়া অন্যরূপ করিয়াছে—কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ঐ নিম্ন সত্যকে যথাযথ স্থানে রাখিয়া—উচ্চাদর্শ গ্রহণে এবং তদ্দ্বারা নিজ জীবন নিয়মিত করিতে এখনও অসমর্থ পুরুষ সকলের কল্যাণের নিমিত্ত—চিরকাল উহার পোষণ ও পূজা করিয়াছে। ভারত উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শসমূহলাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াই ভাবিয়াছে, 'এই মই, বাঁশ, দড়ি বা সিঁড়ি-অবলম্বনে আজ আমি সত্যসৌধের এই উচ্চ ছাদে আরোহণ করিলাম, কাল অন্য কেহও তো এই ছাদে উঠিবার সঙ্কল্প করিয়া আগমন করিতে পারে, তাহারাও তো এই মই, বাঁশ, দড়ি বা সিঁড়ি-অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই; অতএব তাহার বা তাহাদের সহায়তার জন্য উহা নষ্ট না করিয়া রাখিয়া দেওয়াই ভাল।' ভারতের এই ভাবটিই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতময় গীতে এইরূপে চিরনিবদ্ধ করিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাংকর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

—গীতা

জ্ঞানী সাধনফলে স্বয়ং ধর্ম বা ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়ক উচ্চতম সত্যে আরোহণ করিয়াছেন বলিয়া দেশকাল পাত্রভেদে বিচার না করিয়া উহা জনসাধারণে প্রচার করিবেন না। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাসসহকারে শ্রীভগবানের উপাসনার নিমিত্ত যে যে কর্মের অনুষ্ঠানে রত, তৎসকলের অনুমোদন ও যথাসম্ভব আচরণ করিয়া তাহার শ্রদ্ধা যহাতে ঐ বিষয়ে আরও দৃঢ়ীভূত হয়, তাহাই করিবেন। কারণ ধর্মগত উচ্চতম সত্যের ধারণা ব্যক্তিগত সাধনের পরিপক্কাবস্থায় আপনা আপনি উদিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র কাহারও কথায় তল্লাভ কাহারও কখন হইবে না।

ঐ ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার বর্তমান যুগে আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন—"কাহারও ভাব নষ্ট করতে নাই; ভাব নষ্ট করা মহা দোষ। যেমন ভাব,

তেমন লাভ। ভাব আশ্রয় করিয়াই মানুষ সত্যবস্তু লাভ করে; কারণ শ্রীভগবান স্বয়ং ভাবময়। সোলার আতা বা হাতী দেখিলে যেমন সত্যের আতা বা হাতী মনে পড়ে, সেইরূপ মৃন্ময়ী, পাষানময়ী মূর্তি দেখিলে চিন্ময়ী মূর্তির উদ্দীপনা হয়।" ইত্যাদি।

শক্তিপূজার অবতারণায় আমরা প্রথমেই গুরূপাসনার উল্লেখ করিয়াছি। কেন না, গুরুপ্রতীকই সর্বপ্রতীকশ্রেষ্ঠ বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়া বর্তমান যুগে সর্বাগ্রে পূজিত হইয়া থাকে। হইবারই কথা—কারণ শ্রীগুরুই ইষ্টমন্দিরের দ্বারস্বরূপ। দ্বাররুদ্ধ থাকিলে যেমন মন্দিরে প্রবেশ লাভ হয় না, শ্রীভগবানের গুরুশক্তি প্রসন্ন না হইলে সেইরূপ মানবের ইষ্টদর্শনাশা বৃথা। মায়ানিরুদ্ধদৃষ্টি ভ্রান্ত মানবের চক্ষুরুন্মীলন করিবার জন্যই কৃপা-পরবশ শ্রীভগবানের গুরুরূপে উদয়। সর্বদেশে সর্বকালে মানব যাহা কিছু সত্য বা জ্ঞানলাভ করিয়াছে বা করিবে, তাহা ঐ গুরুশক্তি প্রভাবে। বাহ্যান্তরভেদে নানা প্রতীক-অবলম্বনে গুরুশক্তিই প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ধীরনিশ্চিত গতিতে দেশকালাবচ্ছিন্ন জগতে নিম্ন সত্য হইতে উচ্চতর এবং উচ্চতম সত্যে আরূঢ় করাইতেছে। আবার ঐ গুরুশক্তিই পূর্ণস্বরূপে, সাত্ত্বিকবিগ্রহে মানবশরীর ও মানবীয় ভাবাবলম্বনে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া নিত্য নূতন নূতন ধর্মাদর্শ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া মানবকে সেই ছাঁচে জীবন গঠিত করিতে শিক্ষা দিয়া দেশকালাতীত, কেবলানন্দরূপে সমাধিতে তুরীয় সত্যানুভবের উপায় সহজ ও সুখবোধ্য করিয়া দিতেছে। সেইজন্যই উপনিষদে আপ্তকাম ঋষি গাহিয়াছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

—শ্বেতাশ্বতর উপনীষৎ

"ইষ্টদেবের ন্যায় গুরুতে যাহার পরম ভক্তিশ্রদ্ধা, তাহারই নিকট পরম সত্য আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।" সেইজন্যই কথিত আছে—

"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"

—গুরুগীতা

অর্থাৎ, দেবদেব উপেক্ষিত হইলে গুরুভক্তি সহায়ে মানব তাঁহার প্রসন্নত' পুনরায় লাভ করিতে পারে, কিন্তু দয়াঘনমূর্তি শ্রীগুরুশক্তি কোনও কারণে অপ্রসন্না হইলে, মানবের জ্ঞানলাভের দ্বার বহুকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গাঢ় অন্ধতম আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে—সে তমোগুণের হস্ত হইতে নিস্তারলাভ এক জীবনে কখনই সম্ভবপর হয় না। সেই জন্যই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ইংরেজীভাবাপন্ন শ্রদ্ধানভিজ্ঞ বালশিষ্য-মণ্ডলীকে নিজ শরীর দেখাইয়া বলিতেন—"ন্যাখ, এটা কেবল খোলমাত্র; এই খোলটাকে আশ্রয় করে শুদ্ধবোধানন্দময়ী মা লোকশিক্ষা দিচ্ছেন, সেজন্য এর কাছে এলে, একে স্পর্শ করলে, এর সেবা করলে লোকের ধর্মভাবের উদ্দীপনা হয়ে ঈশ্বরলাভ হয়; কিন্তু খুব সাবধানে শ্রদ্ধার সহিত এটার সেবা করবি। শ্রদ্ধার অভাবে আমি রাগ করব না; কিন্তু এর ভিতর যে আছে, সে যদি অবজ্ঞাত হয়ে একবার ছুবলে দেয়,

তা হলে জ্বালায় অস্থির হতে হবে।" এক সময়ে কোন দুরন্ত শিষ্য নিজ ঘৃণিত জীবনালোচনায় ক্ষুব্ধ হইয়া দুঃখে অভিমানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নানা অযথাভাষণ করে। অপার দয়ানিধি শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে তাহার জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়াছিলেন, "ওরে, ও আমাকে যা বলে, বলুক গে; (নিজ শরীর দেখাইয়া) এর ভিতরে যে আছে, তাকে তো কিছু বলে নি? আমার চিরানন্দময়ী মাকে তো কিছু বলে নি?"

হে ভারত, সাবধান! গুরুশক্তিবলে বলীয়ান্! বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া আজ বিদেশী অনুকরণে শ্রীগুরুর পূজায় অবহেলা করিও না; আজ আটশত বৎসরের অধিক-কাল হইল নানারূপে নানাভাবে বিদেশী আসিয়া, কখন স্তুতিবাদ করিয়া, আবার কখন বা ভয় দেখাইয়া তোমাকে ঐ শক্তিপূজায় বিরত হইতে পরামর্শ দিতেছে—পাশব বলপ্রয়োগে বিধ্বস্ত করিয়া, দুঃখদারিদ্র্যনিপীড়িত তোমার পরিম্লান চক্ষের সমক্ষে নানা প্রলোভন আনিয়া একে একে ধরিতেছে। কিন্তু শ্রীগুরুশক্তিরই পরিণামে জয় ভাবিয়া তুমিও একদিন তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছ। সেজন্য বাবিল, মিসর, রোম, গ্রীস ও তুর্কাদি জাতিসমূহ দুর্জয় কালস্রোতে তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথাও ভাসিয়া যাইলেও কৌপীনমাত্রাচ্ছাদিতকটি, তিতিক্ষাসম্বল, অনিত্যের ভিতর সর্বদা নিত্য-দর্শনাভিলাষী, গুরুপাদনিবদ্ধদৃষ্টি ও তদনন্যশরণ তোমার সন্তানকুল সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজও বর্তমান। তোমারই পুণ্যক্ষেত্রে আজও সর্বদেবদেবীস্বরূপ দিব্য গুরুশক্তি মানুষী তনু পরিগ্রহ করিয়া নিজ মহিমা প্রকাশ করিয়া "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" আবির্ভূতা হইতেছেন। তোমারই সন্তানকুলের সমষ্টিভূতমূর্তি-স্বরূপ নরাবতার অর্জুন কুরুক্ষেত্র সমরের প্রথমাঙ্কে শ্রীগুরুপাদুকোদ্দেশে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া কাতরকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন—

> "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
> পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
> যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
> শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"
>
> —গীতা

"হে প্রভু, ভয় মমতা প্রভৃতি নানা দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হইয়া আমি কি যে করা কর্তব্য তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার অহঙ্কার অভিমান দূর হইয়াছে—আমি এখন দয়ার পাত্র। এ সময় যাহা করা কর্তব্য, যাহা করিলে আমার ও অন্যের মঙ্গল হয় এবং অধর্মাচরণ করা না হয় তাহাই আমায় বলিয়া দাও। আমি তোমার শরণা-গত শিষ্য, আমাকে আশ্রয় দাও, পথ দেখাও।"—তাহা তোমার প্রত্যেক এবং সকল সন্তানের জন্যই উচ্চারিত হইয়াছিল। সে হৃদয়ের প্রার্থনা শ্রীগুরু-চরণপ্রান্তে সকলের জন্য সর্বকালের নিমিত্ত পৌছিয়াছে। সে অভয়বাণী—"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষ-য়িষ্যামি মা শুচঃ"—তোমার সন্তানের প্রত্যেককে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দৈববলে বলীয়ান করিয়া রাখিয়াছে। ধৈর্য ধর, পবিত্রভাবে নির্ভীকহৃদয়ে তাঁহারই অনন্যশরণ

হইয়া থাক—তোমাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরুর এখনও অনেক লীলা প্রকটিত হইবে
দেখিতেছ না কি অন্তর্জগতে, ধর্মজগতে তোমার সন্তান এখনও রাজা? ইতিহাস
সহায়ে দেখ—সর্বকালে বৈদেশিক নির্যাতন তোমার সন্তানের মাংসপিণ্ডময় ক্ষণভঙ্গু
শরীরটাকেই কয়েক দিনের জন্য মাত্র নানাপ্রকারে ক্লিষ্ট করিতে পারিয়াছে—তাহা
অমরাত্মাকে কে বাঁধিবে? কে কখন তাহার অপ্রতিহত গতি রোধ করিয়াছে
সত্যকে ধরিয়া, ন্যায়কে ধরিয়া ধর্মে সদা প্রতিষ্ঠিত থাক, জানিও ভাব-জগৎই স্থু
জগৎটাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, পরিবর্তিত ও নিয়মিত করিতেছে
জানিও কোন শর্বরীই চিরস্থায়ী নয়, সকল অবস্থারই পরিবর্তন ধ্রুব। অহেতুক
দয়াসিন্ধু শ্রীগুরুর পূজা প্রচলিত হইবার পূর্বেই কিন্তু ভারতে নানা প্রতীকের অভ্যু
হইয়াছিল। তত্তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া আমরা পুনরায় শক্তিপূজা
সহায়ক অন্যান্য প্রতীকের কথা পাঠকের সম্মুখে আনয়ন করিব না।

শ্রদ্ধাবাতাহতা, প্রেমবিকম্পভঙ্গিতা, বিজ্ঞানগুহাশায়িনী, প্রণবনাদিনী, চিরপাব
করী, ভাবময়ী ধর্মগঙ্গার উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতকুলে
অনেকে মানবের অন্তঃস্থিত ভীতি-শৈলের শিখর-দেশ নির্দেশ করিয়াছেন। আব
কেহ বা বলিয়াছেন—সৃষ্টিকল্পের প্রারম্ভে আদিম মানব বিচিত্র শক্তিশালী নানা পদার্থে
সমষ্টিভূত—বিশ্ববিরাট্ দর্শনে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শক্তিপ্রকাশের অবলম্ব
সমূহের পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর কল্পনা করিয়া হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়াছিল
ঐ বিস্ময়-ভূধরের পাদমূলেই সনাতনী ধর্মভাগীরথীর আদিম বিকাশ। উহাই প্রতীকে
পাসনার বাস্তব মূল। ভারতের বেদগান ঐরূপে প্রথমে সমুত্থিত হইয়া জলদগম্ভী
সামধ্বনি ও পূতগন্ধী বিশ্বদেববলিধূমে সান্ধ্য গগন পূর্ণ করিয়াছিল।

আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। চিজ্জড়সম্মিলনী, বিপরীতগুণধারিণী, বাহ্যান্ত
প্রতিঘাতিনী, উভয়মুখী মানবপ্রকৃতি সর্বকালেই এক বিষম জটিল রহস্য। সহ
সহস্র বৎসরের নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং ভূয়ো-দর্শন-সহায়েই তাহাতে নিত্য জী
শ্বরসম্বন্ধ, পরলোকাস্তিত্ব, আত্মার চিন্ময়ত্ব ও অমরত্ব, সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব এ
দেববিগ্রহাদির বর্তমানত্বাদিমূলক বিশ্বাসনিচয় একত্রীভূত হইয়া বর্তমান ধর্মবিশ্বাসরূ
প্রকাশিত হইয়াছে। জটিল মানবপ্রকৃতির জটিল ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি জটিলভাবে
সাধিত হইয়াছিল। তুঙ্গশৃঙ্গ গিরিরাজি, সর্বগ্রাসকর জলধি, বিকটোল্লাস অশ
নিশি-দিবাকর সূর্য, রাগরঞ্জিত উষা প্রভৃতি বাহিরের ভীষণ ও সুন্দর পদার্থনিচ
যেমন জাগ্রদবস্থায় আদিম মানবের মনে ভীতিবিস্ময়াদি ভাবসমূহের উদয় করিয়া ব
প্রতীকাবলম্বনে নানা দেবদেবীর পূজা করিতে তাহাকে শিখাইয়াছিল, সেইরূপ মো
ময়ী নিদ্রারাজ্যে নিত্য প্রবিষ্ট হইয়া সে অঘটনঘটনপটীয়ান স্বপ্নের কুহকে যে সম
অদৃষ্টপূর্ব দেশ, কাল, পাত্রাদির অনুভব করিত, ঐ সকলকে জাগ্রদনুভূত পদার্থসকলে
ন্যায় বাস্তব বলিয়া বিবেচনা করিয়া সে ইহলোকভিন্ন অপর এক লোকের অস্তি
বিশ্বাস করিতে শিখিল। বাহ্যান্তরভেদে এইরূপে দুই প্রকার অনুভবের সহায়ে তাহ
দুই প্রকার শিক্ষা যুগপৎ চলিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

কালে সর্বরহস্যের উচ্চতম রহস্য মৃত্যুর সহিতও তাহার পরিচয় হইতে লাগিল ং ক্রমে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল—মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু সকলকে একদিন গ্রাস করিবে। ীর হৃদয়ে সে ভাবিতে লাগিল—এ কি! এ আবার কোন্ দেবতা! এইরূপে চকেতারূপী মানব মৃত্যুমুখেই ক্রমশঃ শিথিল—ইহকালেই তাহার অস্তিত্ব পর্যবসিত হ, পরকাল আছে এবং পরকালেও তাহার অস্তিত্ব সুনিশ্চয়। প্রেতাত্মাসকলের প্ন ও কখন কখন জাগরণে সন্দর্শনে তাহার ঐ পরকাল-বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। াতের সকল জাতির প্রাচীন পুরাণ-সংগ্রহে উক্ত প্রেতাত্মাকুলের দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ ছে এবং এখনও ঐরূপে প্রেতাত্মাকুলের দর্শন যে সম্ভবপর, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার লোক কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্ত্য সকল ভূখণ্ডেই বিদ্যমান। ঐরূপ দর্শন হইতেই যে চীন যুগে পিতৃপুরুষের পূজা প্রচলিত হয়, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। প্রাচীন মিসরে ঐ ল প্রেতাত্মা 'কা' নামে নির্দিষ্ট হইত। ঐ 'কা'-সকল তাহাদের জীবিত সন্তানাদির কট আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব দুঃখকষ্টের কথা জানাইত। "আমাদের অন্ন দে, বস্ত্র দে, য সব ভোগ্য পদার্থ দে" ইত্যাদি বলিত, "না দিলে তোদের ধ্বংস করিব" বলিয়া দেখাইত—এ সকল কথা তাহাদের ভিতর লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের পিতৃশ্রাদ্ধাদি, ন ও জাপানের সিন্টো-উপাসনা, ইওরোপ এবং আমেরিকার পূর্বের কথা ছাড়িয়া লেও বর্তমান যুগের ভূতুড়ে চক্রানুষ্ঠান (Spiritualism an l Seance) প্রভৃতি বিষয়ের যথেষ্ট সাক্ষ্য।

এইরূপে যতদিন না আদিম মানবের মনে পরকালবিশ্বাস সমুদ্গত হইয়া ছিল, তদিন যে সে ধর্মবিশ্বাসে ধনী হইয়াছিল, একথা বলা যায় না। আবার পরকাল-শ্বাস এবং বিভিন্ন শক্তির আধার নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস যে তাহার মনে যুগপৎ দত হইয়াছিল—একথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমে ঐ সকল দেবদেবীর বাস হিমালয়, সিনাই প্রভৃতি অত্যুচ্চ ভূধরশৃঙ্গে নির্ধারিত হয়। পরে মানব যখন হসাবলম্বনে ঐ সকল গিরিচূড়ার মস্তকে উঠিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও সকল দেবদেবীর পরিচায়ক চিহ্নমাত্রেরও দর্শন পাইল না, তখন স্থির হইল তাঁহারা ান কখন ঐ সকল ভূস্বর্গে আগমন করেন মাত্র—নতুবা তাঁহাদের চিরবাসস্থল নানা ক্ষত্রবিরাজিত ঐ সুনীল গগনের উপর 'দ্যৌঃপিতরে'র অবস্থান-ভূমিতে, কৈলাসে, ালোকে, কিন্নর-কিন্নরী-শোভিত স্বর্গে ইত্যাদি। আবার উচ্চাবচ পুণ্যপাপময় র্মর কথা আলোচনায় উক্ত পরলোক-বিশ্বাসও ক্রমে পিতৃলোক, দেবলোক, অন্ধতমো-শিষ্ট লোক, নরক এবং তির্যগ্যোনি প্রভৃতিতে মৃতব্যক্তিসকলের স্থান নির্ধারিত রিল।

এইবার পৃথিবীর বহুকাল বাস ও বহুদর্শনের ফলে মানবজাতির মধ্যে ভূতবিজ্ঞান ও নাবিজ্ঞানের অঙ্কুরসমূহ ধীরে ধীরে উদ্গত হইতে লাগিল এবং ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বদেবীর শক্তি এক মহাশক্তিমানের লীলা বলিয়া অনুমিত হইয়া তাহাকে কালে এক দ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী করিয়া তুলিল। স্তম্ভিতহৃদয়ে মানব ভাবিল—যিনি সকলের

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

—কঠোপনিষৎ

অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই খাদ্যরূপে পরিগণিত, স্বয়ং মৃত্যু যাঁহার খাদ্যের উপযোগী ব্যঞ্জনসদৃশ সেই কালান্তক বিশ্বদেবকে কে জানিতে সক্ষম?

কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। এইবার ঔপনিষদিক যুগের প্রারম্ভ হইল মানব ধ্যানাদিসহায়ে জানিতে ছুটিল—সেই ঈশ্বর সৃষ্টির বাহিরে বা অন্তরে। প্রথমে স্থির হইল—তিনি সৃষ্টির বাহিরে—সৃষ্ট বিশ্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট; জীব সেবক, তিনি সেব্য; জীব তাঁহাকে কখনও ধরিতে ছুঁইতে পারিবে না।

পরে স্থির হইল—তিনি সৃষ্টির অন্তরে ও বাহিরে, বিশ্ব তাঁহার একাংশে বর্তমান—"একাংশেন স্থিতো জগৎ"; জীব অংশ, তিনি পূর্ণ; দেহের সহিত ভিন্ন ভিন্ন অবয়বাদি সম্বন্ধের ন্যায় উভয়ে অবস্থিত। শেষে স্থির হইল—সসীম মন বুদ্ধির ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিলেই তিনি বিশ্বরূপে আপাতপ্রতীত হন মাত্র। কোনক্রমে মনবুদ্ধির গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারিলে তবে শুদ্ধ সত্যানুভব সাধ্য; সেখানে "একমেবা-দ্বিতীয়ম্"—দুই তো নাই-ই, এক যে আছে, একথাও বলা যায় না, তিনি পূর্ণ নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। আর জীব? জীব বলিয়া কোন পদার্থ এখানে থাকিলেও সেখানে নাই। সাধকাগ্রণী শ্রীরামপ্রসাদ যেমন বলিয়াছেন—

বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য
মান্য করে সব খোয়ালে॥
প্রসাদ বলে, যা ছিলি ভাই,
তাই হবি তুই নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

তবে পাপপুণ্য ধর্মাধর্ম, কর্মাকর্মের কারণ কি? যতক্ষণ শরীর, মন, বুদ্ধির গণ্ডির ভিতর ততক্ষণ ওসকল সত্য, যেমন যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত।

তবে এ সংসার-স্বপ্ন মৃত্যু হইলেই কি ভাঙ্গিয়া যায়? না—কোটি জন্মেও বিজ্ঞানে উদয় না হইলে ভাঙ্গে না। আবার তীব্র ইচ্ছাসহায়ে এক জন্মেই উহা ভাঙ্গিয়া দেও যাইতে পারে।

এইরূপে সম্পূর্ণ ধর্মচক্র ভারতে প্রবর্তিত হইল। বাকি রহিল মাত্র—তর্কযুক্তি সহায়ে উহাকে মানব-মনের যথাসম্ভব বোধগম্য করা এবং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ যাহাতে ঐ সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সেইভাবে সমাজগঠন। ভারতের কপিলাদি দার্শনিকগণ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, শঙ্করাদি অবতারনামা য

মহাপুরুষ অদ্যাবধি ভারতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে অনেক কথা—কিন্তু ইহা তাহার স্থান নহে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতকুলের ধর্মসম্বন্ধীয় গবেষণা পাঠ করিলে উহাতে বিশেষ অঙ্গহানি লক্ষ্য হইয়া থাকে। হইবারই কথা। কারণ পাশ্চাত্ত্য প্রদেশ এতকালেও কর্মী ভিন্ন একজনও বিশিষ্ট ধর্মবিজ্ঞানীর জন্মদানে সক্ষম হইল না। প্রাচ্যভূমি আশিয়া, বিশেষতঃ ভারত হইতেই ধর্মালোক যে পাশ্চাত্ত্যে বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর নিত্য-পূজ্য বেদ হইতেই ধর্মালোক পৃথিবীর প্রাচীনেতিহাস যতই আলোচিত হইবে ততই প্রমাণিত হইবে—ততই মানব বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর নিত্য-পূজ্য বেদ হইতেই ধর্মালোক পৃথিবীর সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে। খ্রীষ্ট জন্মিবার সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে যখন গ্রীকজাতি বিশেষ বলদৃপ্ত হইয়া অন্যান্য সকল জাতিকে পাশব বলে আপন অধীনে আনিতে ব্যস্ত, তখন হইতে বর্তমান ইওরোপীয় সভ্যতার আদিগুরু গ্রীসের সহিত ভারতের সম্বন্ধাবকাশের কথা ইতিহাস স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে। তাহার পূর্বে যে সম্বন্ধ ছিল না একথাও স্পষ্ট বলা যায় না। ভারতের ধর্মপ্রচারক এবং কোন কোন স্থলে ভারতের বণিককুলও যে ঐ কাল হইতে গ্রীস এবং তৎসন্তান রোমসাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এ বিষয়েও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পালিস্থানের আন্টিয়ক শহরে ভারত সম্রাট ধর্মাশোকের ধর্মশাসনক্ষোদিত প্রস্তরস্তম্ভ ঐ বিষয়ের জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপে এখনও দণ্ডায়মান। ইওরোপের উল্লেখযোগ্য প্রথম দার্শনিক পিতাগোরসের —নাম এবং সংখ্যা হইতে জগদুৎপত্তিরূপ দার্শনিক মতে ভারতের পূতগন্ধের বিশেষ অনুভূত হয়। কে না জানে—ভারতের সাধু ও আচার্যকুল অদ্যাবধি পিতা, গুরু শব্দাদিতে জনসাধারণ কর্তৃক অভিহিত হন? কে না জানে—শ্রীভগবদবতার মহামুনি কপিল চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে জগদুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া আপন মীমাংসা 'সাংখ্য' নামে জনসাধারণে প্রচারিত করেন? সংখ্যা হইতে যে উক্ত সমাধান 'সাংখ্য' শব্দে অভিহিত—একথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপে গ্রীস ও রোমের ভিতর দিয়া যে ভারতের ধর্মমতসমূহই পূর্ব পূর্ব কালে প্রচারিত হইয়াছিল—এ বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

প্রাচীন ইওরোপে ধর্মালোক-বিস্তারের আর এক কেন্দ্র ছিল মিসর। ঐ মিসরও যে ভারতের ধর্মালোকে দীপ্ত হইয়াছিল—এ বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন মিসরী মিসরের দক্ষিণ সমুদ্র দিয়া নৌকারোহণে ঐ দেশে প্রথম আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে, এ কথা মিসরীদের প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিসরের দক্ষিণে ভারত ভিন্ন অন্য প্রদেশ নাই। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজাদি প্রদেশের দ্রাবিড়ীর সহিত প্রাচীন মিসরীর রং, ঢং, চেহারা, আচার, ব্যবহার এবং পূজ্য দেবদেবীর বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান—সেই শিবশক্তি-পূজা, ষাঁড়ের সম্মান, বাবরিকাটা চুল, ধুতিপরা, কাছাহীন, মিস্‌কালো রঙ। কাজেই কে না বলিবে —ঐ দ্রাবিড়ীই মিসরে যাইয়া বহুপূর্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল? পরে স্থলপথেও যে ভারতের সহিত মিসরের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল—এ বিষয়ের প্রমাণও

প্রাচীনেতিহাস এবং আশিয়ার অনেক স্থলে এখনও বর্তমান বণিককুলের যাতায়াতের পথসমূহ (overland trade-routes) হইতে নির্ণীত হইয়াছে। খ্রীষ্টান-ধর্মপ্রবর্তক ঈশার ঐ মিসরে বহুকাল বাসের কথা বাইবেলের নবভাগে নিবদ্ধ। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহার ভারতেও ধর্মশিক্ষার জন্য আগমন হইয়াছিল। যাহাই হউক, তৎপ্রচারিত মতের অধিকাংশই যে বৌদ্ধধর্ম এবং ইরাণী ধর্মপুস্তক 'জেন্দাবেস্তা' হইতে সংগৃহীত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; সেই ভাল-মন্দ দুই শক্তির দ্বন্দ্বে উত্তমের জয়, সেই উত্তমের অনুজ্ঞায় মন্দের মানবকে প্রলোভিত করিয়া পরীক্ষা, সেই উত্তমের কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং নর-শরীরাবলম্বনে মানব কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-করণ। আবার ঈশাশিষ্য ম্যাথুলিখিত প্রচারবিবরণীতে গ্যালিলি প্রদেশস্থ শৈলপাদমূলে ঈশার ধর্মোপদেশসম্বন্ধী যে সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে, অবিকল সেই সমস্ত কথাই বৌদ্ধগ্রন্থে লিপিবদ্ধ শ্রীভগবদবতার বুদ্ধের শৈলপ্রচারে বিবৃত রহিয়াছে। অতএব বৌদ্ধমতের কতক কতকও যে ঈশার মতমধ্যে প্রবিষ্ট আছে, তাহাও প্রমাণিত। ঈশাশিষ্য যোহন-লিখিত প্রচারবিবরণীর পূর্বভাগে অতি অপরিস্ফুটভাবে লিপিবদ্ধ ভারতের চিরন্তন সম্পত্তি— নাদব্রহ্মবাদের কথাও এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্ত্যভূমি এইরূপে ভারতের ধর্মালোকে পূর্ব পূর্ব যুগে উদ্ভাসিত হইতেছিল, এমন সময়ে জড়বিজ্ঞানের চর্চা ও উন্নতি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উহারই ফলে ঐ ভূমিতে ধর্মালোক পরিক্ষীণ হইয়া জড়বাদের অধিকার বিস্তৃত হইল। জড়বাদী জড়শক্তির বিস্তৃত তত্ত্বলাভে তৎপ্রয়োগবিজ্ঞানমাত্রকুশলী। অতএব পাশববলোন্মত্ত পাশ্চাত্ত্যের ধর্মমীমাংসা এখন যে গীতানিবদ্ধ নিম্নোদ্ধৃত বচনের অনুরূপ হইবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।

—গীতা

ঈশ্বরই নাই, তা ঈশ্বর আবার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন! কামই স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ করিয়া জগৎ সৃষ্টির কারণ! কামোপভোগই জগতে পরম পদার্থ—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অল্পবুদ্ধি আসুরপ্রকৃতি ব্যক্তি অহঙ্কার অভিমানে মত্ত হইয়া ঐ ভোগ কি প্রকারে পাইবে, এই চিন্তাতেই অহরহঃ কালযাপন করে এবং নানা অসদুপায় অবলম্বনেও পরাঙ্মুখ হয় না।

অতএব ভারতের ঋষি এবং অবতারকুলের ঐ সম্বন্ধে মীমাংসার অনুসরণ না করিয়া

পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণে যে আমাদের সমূহ ক্ষতি এবং কালে ধ্বংসের বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা আর বলিতে হইবে না। অতএব পূর্ব হইতেই ঐ বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে। সর্বকালে সমাধিগত প্রত্যক্ষই ধর্মের মূল। ঐ প্রত্যক্ষভূমির আভাস আবার জনসাধারণ কেবলমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ও অনুভবিতা আপ্তপুরুষকুলের 'পাবনং পাবনানাং' জীবনচরিতে ও তদ্ভাবে গঠিত সিদ্ধকাম সাধকের জীবনে পাইয়াই উহাতে বিশ্বাসী হইয়া থাকে। ঐরূপ পুরুষের দর্শন, স্পর্শন ব্যতীত রূপস্থায়ী রূপরসাদিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, মায়াগ্রস্ত জীবকুলের মায়াতীত নিত্যানন্দের আভাসলাভ সুদূরপরাহত। আবার, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—জড় ভাবিতে ভাবিতে লোকে জড় হইয়া যায় এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তায় মানব তৎস্বরূপই প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্ত্যভূমির বহুকাল ঐরূপ আপ্তপুরুষের পবিত্রসন্দর্শনলাভ হয় নাই, তদুপরি জড়ের চিন্তাতেও বহুকাল অতীত হইয়াছে। কাজেই ঐ দুর্দশা। তবে ভারতের ধর্মালোক আবার বর্তমান যুগে শ্রীভগবানের অপার কৃপায় অদ্বৈতমতাবলম্বী পাশ্চাত্ত্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেজন্য আশা হয়, আবার পাশ্চাত্ত্য ভারতকে ধর্মগুরুত্বে বরণ করিয়া ধ্বংসের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে এবং জগতের যথার্থ কল্যাণে ক্রমশঃ নিজশক্তি প্রয়োগ করিতে শিখিবে।

দেববলে বলীয়ান ভারত চিরকাল ধর্মসাক্ষাৎকার করিতেই নিজশক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। ঐ চেষ্টা বা সাধনফলেই পূর্বোক্ত ধর্মবিশ্বাসসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে সে সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়াছে। ভারত দেখিয়াছে—সত্যই প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বাসসহায়ে এই বহুকালাগত সংসার-স্বপ্ন একদিন ভাঙিয়া যায়, সত্যই সহস্র সহস্র বৎসরের অন্ধকারময় গৃহ ঈশ্বরকৃপায় এক মুহূর্তে আলোকপূর্ণ হয়! ভারত দেখিয়াছে—সত্যই শ্রীভগবান পূর্ণচিদানন্দস্বরূপে সকলের হৃদ্দেশে অনন্তভাবে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে ফিরাইতেছেন, ঘুরাইতেছেন, উদ্দেশ্যবিশেষে চালিত করিতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

—গীতা

সত্যই, কেবল তাঁহার শরণাগত হইলে পূর্ণ শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হইব। নতুবা আর অন্য উপায় নাই।

যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকাবলম্বনে শ্রীভগবচ্ছক্তি মানবমনে প্রকাশিতা হইয়াছেন। বৈদিক যুগের তেত্রিশটি দেবপ্রতীক এইরূপে পৌরাণিক যুগে তিন শত তেত্রিশ কোটি দেবপ্রতীকে পরিণত! তাই বলিয়া কেহ যেন অনুমান করেন, ঐ তিন শত তেত্রিশ কোটি দেবকুলের প্রত্যেকেই এক সময়ে সমভাবে মানবমনে আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধর্মেতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেবপ্রতীকোপাসনা প্রবর্তিত হইয়া ভারতে পূজালাভ করিয়া মানবের ধর্মলাভের সহায়ক হইয়াছিল। মন্ত্র-শাস্ত্রাদি পাঠে ঐরূপ কত দেবতার নামমাত্র কেবল

প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের ধ্যান এবং পূজাপদ্ধতিসকল বর্তমানে লোপ পাইয়াছে। তিব্বত, চীন, জাপানাদি প্রদেশে ঐ সকল দেবতার পূজাপ্রচার এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের ধর্মপ্রচারক যে বহু প্রাচীন যুগে ঐ সকল দেবপূজা ভারত হইতে উক্ত প্রদেশসকলে লইয়া গিয়াছিল, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধযুগে শতদলে আসীন উজ্জ্বল বুদ্ধমূর্তিই প্রতীকরূপে উত্তর ভারতের অনেক স্থলে অবলম্বিত হয়। ক্রমে উহাই শতদল-মধ্যবর্তী উজ্জ্বলালোকে বা পদ্মান্তর্গত উজ্জ্বলকিরণবর্ষী মণিখণ্ডে পরিণত হয়। তিব্বতে এবং অন্যান্য বৌদ্ধদেশে এখনও উহাই যে সাধকের ধ্যানাবলম্বন, তাহা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' ইত্যাদি মন্ত্রেই স্পষ্ট ব্যক্ত।

বহির্জগতের পদার্থনিচয়ের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরীণ নানা পদার্থও প্রতীকরূপে কালে অবলম্বিত হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি এখনও বর্তমান এবং কতকগুলি অধুনা লোপ পাইয়াছে। হৃদয়পুণ্ডরীকের মধ্যগত উজ্জ্বল আকাশ বা 'দহরাকাশ' নয়নান্তর্বর্তী ছায়া বা 'ছায়াপুরুষ' ইত্যাদি ঐরূপে এককালে প্রতীকরূপে অবলম্বিত হইয়াছিল— তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্করাচার্যের বেদান্তভাষ্যে ঐ সকলের বিশেষ উল্লেখ থাকায় কালে উহাদের পূজা প্রচলন থাকা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই ভূতপঞ্চের প্রত্যেকটি এবং অন্ন, প্রাণ, মন প্রভৃতিও যে কালে সূক্ষ্মদর্শী মানব কর্তৃক ব্রহ্মপ্রতীকরূপে অবলম্বিত ও উপাসিত হয়— এ বিষয়ের প্রমাণও উপনিষৎ নিবদ্ধ "কং ব্রহ্মেত্যুপাসীত", "খং ব্রহ্ম", "অন্নং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বহুবিধ রচনাবলীতে উপলব্ধ হয়। শব্দপ্রতীক সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরভাবে আলোচিত হইয়া ক্রমে মাণ্ডুক্যোপনিষৎনিবদ্ধ গভীর প্রণবতত্ত্ব এবং নাদব্রহ্মবাদে পর্যবসিত হয়, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সহিত মনোগত পৃথক্ পৃথক্ ভাবের নিগূঢ় নিত্য সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াই কালে ঐ বাদের উৎপত্তি হয় এবং ক্রমে উহা বিশাল কায়া ধারণ করিয়া নাদ বা শব্দ হইতে জগদুৎপত্তি নির্ধারিত করে।

বাহ্যান্তরভেদে কত প্রতীকের যে এইরূপে কালে কালে উদয় হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হওয়া সুকঠিন, ঐ সমস্ত প্রতীকের অবলম্বনে যে যে শক্তি-প্রকাশ মানব অনুভব করিত, এক মহান ঈশ্বরবিশ্বাসে উপনীত হইয়া কালে সে সকলকে তাঁহারই বিভূতিরূপে গণনা করিতে শিখিল। গীতার দশমাধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে যে পদার্থে যে যে ভগবদ্বিভূতি দর্শনের উপদেশ অর্জুনকে করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই প্রাচীনকালে পৃথক্ পূজা পাইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

এইরূপে খণ্ড খণ্ড বাহ্য প্রতীকসমুদয় একত্রীভূত হইয়া এক বিরাট দেবতনুতে এবং খণ্ড খণ্ড আন্তর প্রতীকসমূহ সমষ্টিভূত হইয়া এক মহান্ আন্তর প্রতীকে কালে পর্যবসিত হইল—মানব বিশ্ব-বিরাট এবং কুল-কুণ্ডলিনীশক্তির উপাসনা করিতে শিখিল। তত্তদালোচনা আমাদের অন্য সময়ে করিবার ইচ্ছা রহিল।

পঞ্চম প্রস্তাব

শক্তিপ্রতীক—নারী

সহস্র সহস্র বৎসরেরও পূর্বের কথা—ইতিহাসের তখন জন্মই হয় নাই। তবে কালনির্ণয় আর করিবে কে? জগতের সেই প্রাচীন যুগের অতি প্রাচীন কাহিনী সম্বন্ধে ইওরোপের বর্তমান কালের পুরাণজ্ঞ সুতকুল (antiquarian researchers) এই কথা বলিয়া থাকেন।

বর্বরজগৎ তখন অজ্ঞানপ্রসূত নিবিড় অমানিশা-সমাচ্ছন্ন। যে দিকে যতদূর দেখ, তমঃশক্তির সহিত রজঃশক্তির ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানবের মাংসপিণ্ডময় স্থূল দেহাপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন অথচ তদন্তর্গত মনের ন্যায়, বহিঃপ্রকৃতির স্থূল সৃষ্টির অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মানব-মানবীকে অধিকার করিয়াই পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত। প্রথম ক্ষুধার তাড়না, দ্বিতীয় অত্যধিক শীত, বাত, উষ্ণতাদি ও বন্য পশ্বাদির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা, তৃতীয় আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি নানা প্রেরণায় মানব-মানবীর অন্তর্নিহিত রজোগুণ ক্রমশঃ বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে লাগিল। আহারের নিমিত্ত ফলমূল অন্বেষিত হইল, যখন তাহা জোটা কঠিন হইল, তখন পশু-বধ ও মাংস ভোজন চলিতে লাগিল। গিরিগুহা, মৃতস্তূপাদির সন্ধান এবং পরে শীতনিবারণ ও বাসের জন্য তদনুকরণে পূর্ণাচ্ছাদন রচিত হইল। হে দেবি মানবি, তমোগুণময়ী হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিলেও তখন হইতেই তুমি সেই বর্বর নরের সহচরী।

ক্রমে অনিশ্চিত খাদ্য সঞ্চয়কে আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য পশু পালন-বৃত্তির প্রারম্ভ। মানবকুল তখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। কিন্তু ঐ বিস্তারে এখনকার ন্যায় বিবাহ প্রথার নামগন্ধও নাই। আসঙ্গলিপ্সাই সে সম্মিলনে প্রজাপতি, কামই পুরোহিত এবং ছল-বল-কৌশলাদিই উহার মূলমন্ত্র! উহার কতকাল পরেও 'দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ' প্রভৃতি নিয়মে এবং অতিবৃদ্ধ মনুর নয় প্রকারের বিবাহ এবং নয় প্রকার পুত্রের কথা লিপিবদ্ধ করাতেও পূর্বোক্ত বিষয় প্রমাণিত। নূহবংশীয় লটের দুহিতাদ্বয় অপর পাত্রের অভাব দেখিয়া পিতাকেই মধুপানে মত্ত করিয়া গর্ভধারণ করিলেন।* ঐরূপ আরও কত বিসদৃশ সম্মিলনে যে মানবকুলের প্রথম বিস্তৃতি, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নিত্য নির্বিকার ঈশ্বর ভিন্ন, সে সকল বিপরীত সম্মিলন সম্মুখে দেখিলে আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের কাহার মন না অসীম লজ্জা ও ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া সমগ্র মনুষ্যজাতিকেই শত ধিক্কার প্রদান করিবে।

এইবার এক প্রকারের স্বার্থ চেষ্টা মানবকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ করিতে লাগিল। বন্য পশুকুল স্বজাতির সহিত একত্র দলবদ্ধ থাকায় পরস্পরের কত সহায় হয় দেখিয়া এবং একাকী অপর বর্বর মানব ও হিংস্র শ্বাপদকুলের হস্ত হইতে নিজ সহচরী

ও পশু প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে যাইয়া বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মানব বুঝিল একত্র চেষ্টায় বলবৃদ্ধি, একত্র বাসে বিশেষ লাভ। তখন মানব ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে আপনাকে নিবদ্ধ করিল এবং মণ্ডলীর অন্তর্গত ব্যক্তিসকলের একত্র পশুচারণ এবং রাত্রিকালে একই স্থানে পশুবন্ধন করায় একত্র বাসের প্রথা প্রচলিত হইল। মণ্ডলী-মধ্যগত সর্বাপেক্ষা বলবুদ্ধিশালী পুরুষের অন্য সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তৃত হইল এবং তাহারই নামে ঐ মণ্ডলী সর্বত্র পরিচিত হওয়াতে 'গোত্র' সকলের উৎপত্তি হইল। গোত্রস্থ প্রত্যেক নারীই তখন গোত্রপতির বিশেষভাবে এবং গোত্র-মধ্যগত অপর সকল পুরুষের সমভাবে উপভোগের পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইল। এইরূপে গোত্রের সহিতই নারীর প্রথম বিবাহসম্বন্ধ স্থাপিত হইল। দ্রৌপদীরূপিণী নারী তখন এককালে শত পতির মনোরঞ্জনে ব্যাপৃতা হইলেন। অসহায় একক নরের সমসুখদুঃখভাগিনী পূর্বসহচরী তখন মণ্ডলীবলপুষ্ট দর্পিত মানবের পাশব-প্রবৃত্তি-চরিতার্থ-কুশলা পরাধীনা দাসীমাত্রে পরিণতা হইলেন।

তখন গোত্রসকল আবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। এক গোত্র অপর গোত্রের নারী ও গোধন যখনই পারিল ছলে বলে আত্মসাৎ করিতে লাগিল এবং কখন বা যুদ্ধবিগ্রহে অপর গোত্রস্থ সকল পুরুষের নিধনসাধন করিয়া তাহাদের যাবতীয় নারী ও পশু অধিকার করিয়া বসিল। ঐরূপে অনেক গোত্রের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। অসহায়া অবলা নারী তখন বলবান মানব-হস্তের ক্রীড়াপুত্তলি হইলেন। দেবরাজ্ঞী শচীর ন্যায় যখন যে ইন্দ্রত্ব লাভ করিল, হাস্যমুখে তাহারই বামে তখন উপবেশন করিয়া তাহারই মনোরঞ্জনে প্রবৃত্তা হইলেন।

এইবার পশুকুলের পালন ও খাদ্যসংগ্রহে সদলবলে দূরসঞ্চারী গোত্রকুল পশু-প্রয়োজনীয় খাদ্য-উৎপাদনে সচেষ্ট হইল। এইরূপে কৃষির উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া নিয়ত পর্যটনশীল অনিশ্চিতাবাসস্থান মানবমণ্ডলীসকলকে বিশেষ বিশেষ জনপদে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। পল্লীগ্রামসমূহের উৎপত্তিতে ক্রমে দেশসকলের সূচনা হইল। কিন্তু মানবের অবস্থার উন্নতি হইলে কি হইবে? হে দেবি মানবি, তোমার অবস্থার পরিবর্তন হইল না। দাসী দাসীই রহিল। পশু প্রভৃতি ধনের ন্যায় সৌন্দর্যভূষিতা নারী পাশববলদৃপ্ত মানব-প্রভুর অন্যতম রত্নমধ্যেই পরিগণিতা রহিলেন।

ক্রমে বহু গোত্রসমূহ একই স্বার্থচেষ্টায় একত্র মিলিত হইয়া 'সুমের' জাতির অভ্যুদয় এবং কালে বাবিলে সাম্রাজ্যস্থাপন। দমুজি ও আহ্নেইয়ের পূজাপ্রচারে সকাম প্রবৃত্তিমার্গের পূজার চূড়ান্ত অভিনয়। জীবসৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়তা নিত্যপ্রত্যক্ষ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে 'পিতৃমুখ ও মাতৃমুখ'স্বরূপে বর্ণিত যোনি ও লিঙ্গের উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। দেবীমন্দিরে পূর্বাপরিচিত পুরুষাঙ্কে শয্যা-লাভ-করা-রূপ নারীর বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইল।

নিয়ত বর্ধমান 'সুমের' জাতিরই এক ভাগ ক্রমে বাসের 'সুজলা সুফলা' ভূমি-বিশেষের অন্বেষণে নির্গত হইয়া স্ত্রী-পুংচিহ্নের উপাসনাদি লইয়া ভারতে প্রবেশ করিল। অনেককাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া ভারতে বাসের পর উহারই এক শাখা আবার

মালাবার উপকূল হইতে নৌযানে মিসরে যাইয়া নীলনদতীরে অপর এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের সূচনা করিল। এইরূপে ধন-ধান্য-সম্পদ-গৌরবে পূর্বাপেক্ষা মানবের অনেক পদবৃদ্ধি হইল। মানবীর অন্তর্নিহিতা দৈবী শক্তিও মানবের স্বীয় অবস্থোন্নতি-প্রবৃত্তির উত্তেজিকা হইয়া সর্বকাল সঙ্গে বাস ও তাহার সন্তান-সন্ততি ধনজনাদির পালন ও রক্ষণে সহায়তা করিয়া সেই প্রাচীন যুগেই পৃথিবীর বহুস্থানে বহুভাবে বহুজন দ্বারা সকাম ভক্তির সহিত পূজিতা ও উপাসিতা হইলেন। সে উপাসনার মূলমন্ত্র—মানবের স্বার্থ-সুখান্বেষণ, সে দেবীর প্রয়োজন—মানবের ভোগ-তৃপ্তি পর্যন্ত। কিন্তু ঐরূপ হইলে কি হয়? দুর্গন্ধাবিল পঙ্কাশ্রয়ে মধুগন্ধসমাকুল ফুল্ল দেবভোগ্য শতদলের ন্যায় মানবের ঐ ইন্দ্রিয়সুখৈষণা, ভোগৈষণা ও আসঙ্গ-লিপ্সাপূর্ণ সাগ্রহ সকাম ভক্ত হইতেই কালে মানবমন নারী প্রতিমায় জগদম্বার হ্লাদিনী শক্তির উপাসনা করিতে শিখিল। ত্রিজগৎ-প্রসবিনী শক্তিকে কালে বিরাট নারীমূর্তিস্বরূপে কল্পনা করিয়া তদবলম্বনে জগন্মাতার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতে শিখিল।

প্রবৃত্তির জটিলারণ্যে মানব যখন ঐরূপে দিঙ্‌নির্ণয়ে অসমর্থ হইতেছিল, মানবীর শরীরমনের কমনীয় কান্তিকলায় সম্যগাকৃষ্ট হইয়াও যখন সে তাহার ভিতর 'সূর্যকোটি-প্রতীকাশ চন্দ্রকোটি-সুশীতল' দেবীমূর্তির সাক্ষাৎ পাইতেছিল না, তখন ভারতের দেবকুল দেবদ্রুমপরিশোভিত অভ্রভেদী হিমাচলশৃঙ্গে জগতের যাবতীয় নারীশরীরমনের সমষ্টিগঠিতা হৈমবতী উমার উজ্জ্বল কাঞ্চনগৌরমূর্তির প্রথম সন্দর্শনে ধন্য হইলেন। দেবজগৎ স্তম্ভিতহৃদয়ে বালার্করূপিণী অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী ব্রহ্মশক্তি দেবী মানবীকে নীলাম্বরে সুখাসীনা দেখিলেন এবং তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে তাঁহার মহিমাবাণী শ্রবণ করিলেন—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্

*　　*　　*

ময়া সোহন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি যঃ ঈং শৃনোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥

*　　*　　*

যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।

—ঋক্ দেবীসূক্ত

অর্থাৎ আমিই সমগ্র জগতের রাজ্ঞী, আমার উপাসকেরাই বিভূতি-সম্পন্ন হয়; আমিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না, সকল যজ্ঞে আমারই প্রথম পূজাধিকার, দর্শন, শ্রবণ, অন্নগ্রহণ ও শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণিজগতের সমগ্র ব্যাপার আমার শক্তিতেই সম্পাদিত

হয় ; সংসারে যে কোন ব্যক্তি শুদ্ধভাবে আমার উপাসনা না করিয়া আমার অবজ্ঞা করে, সে দিন দিন ক্ষীণ ও কালে বিনষ্ট হয় , হে সখে, অবহিত হইয়া যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—শ্রদ্ধার দ্বারা যে ব্রহ্মবস্তুর সন্দর্শন লাভ হয়, আমিই তাহা , আমার কৃপাতেই লোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ; আমার কৃপা-কটাক্ষেই পুরুষ-স্রষ্টা, ঋষি এবং সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন হয় ।

দেবকুল হইতেই ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুলে নারীমূর্তির কামগন্ধহীন পূজার প্রথম প্রচার । উপনিষৎ-প্রাণ ঋষি দেবীমহিমা প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া গাহিলেন—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতর

—শুক্লকৃষ্ণরক্তবর্ণা, সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, অনন্যসম্ভবা এক অপূর্বা নারী অনন্যসম্ভব এক পুরুষের সহিত সংযুক্তা থাকিয়া আপনার অনুরূপ বহুপ্রকারের প্রজাসকল সৃজন করিতেন—ইত্যাদি ।

আত্মস্বরূপে বর্তমানা দেবীর মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি শিক্ষা দিলেন : "ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ।"—বৃহদারণ্যক, ২য় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ৫ ।

—জায়ার ভিতরে আত্মস্বরূপিণী দেবী বর্তমানা বলিয়াই লোকের জায়াকে এত প্রিয় বলিয়া বোধ হয় ।

ঋষিদিগের পদানুসরণে কৃতার্থ হইয়া অতি বৃদ্ধ মনু আবার গাহিলেন—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥

—মনুসংহিতা, ১।৩২

—সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ এবং অপরাংশে নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন ও সঙ্গত হইলেন । অতঃপর সেই নারী বিরাট্ ব্রহ্ম গুকে নিজ শরীর বলিয়া বোধ করিতেছেন যে পুরুষ তাঁহাকে প্রসব করিলেন ।

বলদৃপ্ত মানব এতকাল আপন সুখের জন্য, আপন স্বার্থের জন্যই নারীর পালন ও রক্ষণ করিতেছিল , বৃদ্ধ মনু তাহাকে এখন নারীকে সহধর্মিণীস্থানে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখাইয়া তাহাকে নারীপূজায় আর এক পদ অগ্রসর করিলেন ।

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

—মনু, ৩।৫৬

—যে গৃহে নারীগণ পূজিত হন, সেই গৃহে দেবতাসকলও সানন্দে আগমন করেন; আর যে গৃহে নারীগণ বহুমান লাভ না করেন, সে গৃহে দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কোন ক্রিয়াই সুফল প্রসব করে না।

এইরূপে ভারতের আর্যগৌরব ঋষিকুলই জগতে নারীমহিমা প্রথম অনুভব ও প্রচার করিলেন। সমগ্র জগৎ নির্বাক্ ও উদগ্রীব হইয়া তাঁহাদের সেই পূতবাণী শ্রবণ করিল—মোহিতচিত্ত নারীপ্রতীকে কামগন্ধমাত্রহীন মাতৃপূজার, দেবীপূজার তাঁহাদের সেই আয়োজন দেখিতে থাকিল এবং মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের যথাসম্ভব পদানুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। হে দেবি মানবি, এইরূপে ভারতই তোমার দেবীমূর্তির নিষ্কাম পূজা জগতে প্রথম করিয়া ধন্য হইল, সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ভারত সেই দিন হইতেই তোমায় কুলদেবীরূপে গৃহে গৃহে পূজা ও সম্মান করিতে থাকিল।

সে সম্মান, সে শ্রদ্ধা ও পূজার ফল ভারত প্রত্যক্ষ পাইল। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্রীসৌন্দর্যভূষিতা উজ্জ্বল দেবীপ্রতিমাসকল সর্বাগ্রে ভারতে পদার্পণ করিয়া দেশ পবিত্র করিলেন, পুণ্যময় ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করিলেন। হে ভারত-সন্তান, বৈদেশিক অনুকরণে আজ কিনা তুমি নিজ কুললক্ষ্মীর চরিত্র ও জীবনগঠনে অগ্রসর! অস্বাভাবিক শিক্ষাসম্পন্ন হীনবুদ্ধি বর্বর, তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কি অবনতিই হইয়াছে! একবার বৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্জন নয়ন হইতে অপসৃত করিয়া ভূতজগতে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের আদর্শস্থানীয় দিব্য-নারীকুল একমাত্র ভারতেই হিমাচলস্তবের ন্যায় অনুল্লঙ্ঘনীয় শ্রেণীতে তোমার কুললক্ষ্মীর সহায়তা করিতে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের পদরজে কেবল ভারত নহে, কিন্তু সাব্ধিদ্বীপা সকাননা সমগ্রা পৃথিবীই সর্বকালের জন্য ধন্যা ও সগৌরবা হইয়াছেন। মূঢ়, ভাব দেখি, ভারতের মৃত্তিকা—যাহাতে তোমার ও তোমার কুললক্ষ্মীর শরীরমন গঠিত হইয়াছে, ভারতের ধূলি—যাহা তোমার ও তাঁহার অঙ্গে আশৈশব লাগিয়া শরীর দৃঢ় করিয়াছে, তাহা সীতা, দ্রৌপদী, বুদ্ধৈকপ্রাণা যশোধরা, চৈতন্য-ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া, ধর্মপ্রাণা অহল্যাবাঈ বা চিতোরের বীর-রমণীকুলের দেবারাধ্য পদস্পর্শে পবিত্রীকৃত।' ভাব দেখি, ভারতের বায়ু—যাহা প্রতি নিঃশ্বাসে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহা ঐ সকল দেবীদিগের পবিত্র হৃদয়ে যুগে যুগে প্রবেশলাভ ও ক্রীড়া করিয়া তাঁহাদের পবিত্রতায় ওতপ্রোতভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।—দেখিবে, তোমার এ পাশ্চাত্ত্য মোহ মরুমরীচিকার ন্যায় কোথায় সরিয়া গিয়াছে, আর উহা জলশূন্য বিজন মরুতে তোমাদের জলের প্রত্যাশায় ঘুরাইতে পারিবে না। তোমার জগন্মাতার নারীকুলের উপর, বিশেষতঃ ভারতের রমণীকুলের উপর হৃদয়ের ভক্তি-প্রেম উথলিত হইয়া তোমাকে আবার যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তোমরা কুললক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমায় পরিণত করিবে।

নারীর ভিতর জগৎপ্রসূতির বিশেষ বিকাশ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াই ভারতের দিব্যদর্শনসম্পন্ন ঋষিকুল মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—নারী বুদ্ধিরূপা, শক্তিরূপা, জগজ্জননীর হ্লাদিনী, সৃজনী ও পালনী শক্তির জীবন্ত প্রতিমাস্বরূপ। ঐ প্রত্যক্ষা-

মুভব সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে কিন্তু সাধকের অনেককালব্যাপিনী সাধনার যে আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। বৈদিক ঔপনিষদিক ও দার্শনিক যুগে নারী-উপাসনার সহিত বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকযুগের ঐ বিষয়ের তুলনায় আলোচনা করিলে উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বৈদিক ঔপনিষদিক যুগের নারী-উপাসনা ধীর, স্থির, শান্ত ভাবের। উহাতে উন্মত্ত প্রবাহের তাণ্ডবগতি নাই, অথবা ভীষণ আবর্তের প্রসারে উপাসকের চিত্তবিভ্রম উৎপন্ন করিয়া চিরকালের মতো নিমগ্ন করিবার প্রভাব নাই। বৈদিক ঋষি পুরুষ-শরীরের ন্যায় নারীশরীরেও সমভাবে আত্মার বিকাশ অবলোকন করিয়া সর্ববিষয়ে পুরুষের সহিত নারীকে সমানাধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা ও সম্মান করিলেন। পরমাত্মার সাক্ষাৎ সন্দর্শনে এবং পবিত্র স্পর্শে নারীও যে পুরুষের ন্যায় অতীন্দ্রিয় দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না হইয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিলেন। ঋক্ প্রভৃতি সংহিতা এবং উপনিষদের স্থানে স্থানে নারীঋষিকুলের উল্লেখ, জনকাদি রাজার সভায় ধর্মবিচারে গার্গীপ্রমুখ নারীগণের পুরুষের সহিত সমভাবে যোগদানের উল্লেখ এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞক্রিয়ায় রাজার সহিত রাণীরও যোগদানের উল্লেখ থাকাই ঐ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। এ তো গেল আধ্যাত্মিক জগতের কথা। ব্যবহারিক জগতে নারীকুল পুরুষের সহিত যে বৈদিক যুগে সম সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বিষয়েরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আমাদের কথায় কেহ যেন ইহা না বুঝিয়া বসেন যে, সংসারের কতকগুলি কার্যে যে নারীকুলেরই স্বভাবগত বিশেষাধিকার, এ কথা বৈদিক যুগে স্বীকৃত হইত না। উহা সর্বযুগেই ভারতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং পরেও হইবে। তবে পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে খ্রীষ্ট জন্মিবার পাঁচ ছয় শতাব্দীর পর পর্যন্তও যেমন নারী-জাতিকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাহাদের ভিতর আত্মার অস্তিত্বই নাই, তাহারা পুরুষের ন্যায় কোনরূপ বিষয়সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্যাই নহে ইত্যাদি বিসদৃশ কথার স্বীকার এবং তদনুরূপ কার্যও সমাজের সর্ববিভাগে অনুষ্ঠিত হইত, বৈদিক যুগ হইতে কখনও যে ভারতে এরূপ মত প্রচার ও কার্যানুষ্ঠান হইয়াছিল, এবিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আবার বৈদিক যুগের বিবাহপ্রথায় কুমারীকন্যার মাতৃত্বশক্তিবিকাশের অধিকারিণী হইবার প্রথম পরিচয়প্রাপ্তিমাত্র "গর্ভং দেহি সিনীবালি" ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার 'মাতৃমুখের' পূজাদির বিধান থাকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐকাল হইতেই ভারত নারীতে মাতৃপূজা করিয়া আসিতেছে। মাতৃমুখ বা স্ত্রীচিহ্নের বেদোক্ত ঐ পূজা যে দ্রাবিড়-জাতির মধ্যগত স্ত্রীচিহ্নের পূজার বা তন্ত্রোল্লিখিত মাতৃমুখের পূজার ন্যায় ছিল না, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উদ্দেশ্যের প্রভেদ দেখিয়াই ঐ কথা অনুমিত হয়। বৈদিকী পূজার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মাতৃত্ব-শক্তির সম্মান; প্রাচীন দ্রাবিড়ী অনুষ্ঠানসকলের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশিতা নারীশক্তিরই পূজা এবং তান্ত্রিকী পূজার লক্ষ্য, মাতা এবং জায়া উভয়ভাবে প্রকাশিতা নারীশক্তিরই মহিমা-প্রচার।

বেদে ঐরূপে নারীর মাতৃত্বশক্তির পূজাবিধান অল্পবিস্তর প্রাপ্ত হইলেও দ্রাবিড়

জাতির ন্যায় স্ত্রী-পুংচিহ্নের উপাসনার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, ঐ উপাসনা মুমের এবং তচ্ছাখা দ্রাবিড় জাতিরই নিজস্ব —বৈদিক আর্যদিগের নহে; নতুবা বেদেই উহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। তিনি আরও বলিতেন, লিঙ্গাইত শৈবসম্প্রদায় লিঙ্গোপাসনা বেদবিরুদ্ধ নহে এবং অথর্ববেদানবদ্ধ যূপস্কম্ভের (স্তম্ভের) উপাসনাই লিঙ্গোপাসনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐকথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, কারণ যদি ঐরূপই হইবে, তবে বেদের অন্য কোন স্থলেই স্ত্রী-পুংচিহ্নের পূজা-পরিচায়ক কোনও মন্ত্রবিধানাদি প্রমাণ-স্বরূপে পাওয়া যায় না কেন? শিবলিঙ্গের পূজা যে পুংচিহ্নের উপাসনা নহে, তাহার অন্য প্রমাণ উহার পূজাকালে পূজকের 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানধারণা করা। এজন্য বেদোক্ত বহুপ্রাচীন শিবপূজার এবং বৌদ্ধযুগের স্তূপসমূহের সহিত সংযোগ করিয়াই যে কালে বর্তমান লিঙ্গোপাসনা প্রবর্তিত হইয়াছে, ইহাই স্বামীজী যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন।

জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশিতা নারীশক্তির দ্রাবিড়ী অনুকরণে পূজা বৌদ্ধযুগেই ভারতে প্রথম প্রবেশলাভ করিয়াছিল; এবং কোনও নূতন ভাবের প্রথমোদয়ে লোকে যেমন উহাকেই সর্বেসর্বা ভাবিয়া সর্বত্র সকল কার্যেই উহার সংযোগ ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, প্রায় সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া তদনুরূপ ভাবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধযুগের তন্ত্রসকলের শিক্ষা—সকল রমণীর ভিতর কেবলমাত্র ঐ শক্তির সম্মাননা করা। সংযমী পুরুষসকলের ঐ শিক্ষায় কোনও ক্ষতি হইল না বটে—কিন্তু ঐরূপ সংযমী পুরুষ কোনও জাতিবিশেষের ভিতর কয়টা দেখিতে পাওয়া যায়? ইন্দ্রিয়পরবশ অসংযমী ইতর-সাধারণ মানব ঐ শিক্ষা স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ভারতে যে কি অনাচার ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহার আংশিক পরিচয় এখনও পুরী এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগাত্রস্থ বিপরীত পশুভাবসূচক মূর্তিগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের তন্ত্রকার সেজন্য অতি সাবধানে অধিকারিভেদে রমণীর জায়াভাবের উপাসনার প্রবর্তনা করিয়া এবং বেদের অনুগামী হইয়া জনসাধারণে রমণীর মাতৃভাবের পূজারই বহুল প্রচার করিয়া বৌদ্ধযুগের ঐ দোষ পরিহার করিলেন। পঞ্চ'ম'-কার-সংযুক্ত তন্ত্রোক্ত বীরভাবের পূজা, যাহা সাধারণতঃ বামাচার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাতেই নারীর জায়াভাবের উপাসনা যে নিবদ্ধ রহিয়াছে, একথা আর বলিতে হইবে না। ঐ বীরভাবের প্রয়োগকুশল সিদ্ধগুরু এবং অনুষ্ঠানকুশল সংযমী শ্রদ্ধাবান সাধক—উভয়ই বিরল। উপযুক্ত গুরুলাভ করিয়া বিবাহিত ব্যক্তির ঐ ভাবের উপাসনায় উন্নতিলাভ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন নাই, তাঁহাদের ঐ ভাবের উপাসনায় সহসা অগ্রসর হইলে পথভ্রষ্ট হইয়া পতন হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। সিদ্ধগুরু-সহায়ে সংযমী ব্যক্তিই কেবলমাত্র ঐ ভাবের উপাসনায় সিদ্ধকাম এবং উন্নত হইয়া থাকেন আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত।

'বামাচার' শব্দের অর্থ বুঝিলেই আমাদের পূর্বোক্ত কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'বাম' শব্দ এখানে 'বিপরীত' অর্থবাচক। অর্থাৎ পঞ্চ'ম'-কারাদি পদার্থগ্রহণে ইতর-

সাধারণে যে প্রকার উন্মত্তবৎ অসংযত আচরণ করিয়া থাকে, তদ্বিপরীত আচরণযুক্ত হইয়া পূর্ণসংযমে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সাধককে শিক্ষা দেওয়াই বামাচারের উদ্দেশ্য। অথবা ঐ সকল পদার্থের গ্রহণে ইতর-সাধারণ মানবের অধর্মভাবেরই উদ্দীপনা হইয়া থাকে ; তদ্রূপ না হইয়া যাহাতে সুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়া সাধককে অধিকতর সংযম, অধিকতর ধর্মভাব আনিয়া দেয়, তাহাই ঐ আচারের লক্ষ্য। আবার তন্ত্র বলেন, কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়া মস্তকস্থ সহস্রারে উঠিবার সময় মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চক্রকে বামাবর্তে পরিবেষ্টন এবং তচ্চক্রস্থ বর্ণসকলকে নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া লয়েন এবং সমাধিভঙ্গের পর মস্তক হইতে পুনরায় মেরুচক্রে আসিবার সময় প্রতি চক্রকে বিপরীতভাবে অথবা দক্ষিণাবর্তে পরিবেষ্টন করিতে করিতে নিম্নে নামিয়া আসেন ; কুণ্ডলিনী শক্তিকে ঐরূপে জনসাধারণে অপরিচিত বামাবর্তে পরিভ্রমণ করাইয়া সহস্রারে উঠাইয়া সমাধিমগ্ন হইতে যে আচার শিক্ষা দেয়, তাহাই বামাচার—ঐ শব্দের উহাও অন্যতম অর্থ। বামাচার শব্দের তন্ত্রোক্ত সকল অর্থের অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া বামাচারের উদ্দেশ্য নয় ; এবং কঠোরত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত প্রেমধর্মকে যেমন বর্তমান কালের বাবাজী বৈরাগীদের ব্যাভিচারের জন্য অভিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে, তেমনি ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধযুগের এবং বর্তমান কালের ব্যাভিচারসমূহের জন্য তন্ত্রোক্ত বামাচারকে দোষী নির্ধারণ করাও যুক্তিযুক্ত নহে।

মানবপ্রকৃতির স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া আমরা বামাচারের সম্বন্ধে আর একটি কথাও সহজে বুঝিতে পারি। মানবকে যে বিষয়টির অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করা যায়, আমাদের মধ্যে এমন বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট অনেক লোক আছে, যাহারা সেই বিষয়টিই অগ্রে করিয়া বসে। বামমার্গনিষিদ্ধ বস্তুসকলেরও ধর্মে একভাবে প্রয়োজনীয়তা আছে বলায়, ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট লোকসকলের ভিতর পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ধর্মাচরণ করিতে আসিয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ধর্মাচরণ করিতে আসিয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ধর্মাচরণ করিতে আসিয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তির প্রেরণায় আর কপটাচারের আশ্রয় লইতে হয় না। বামমার্গের নিন্দাই সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায়। উহাতে যে কিছু ভাল আছে, একথা কাহাকেও বলিতে শুনা যায় না। আবার ঐ মার্গের সাধারণ গুরুরা অধিকারী নির্বাচন না করিয়া সকলকেই ঐ পথের উপদেশ করিয়া সময়ে সময়ে অনেকের পতনের কারণ হইয়াছেন। তজ্জন্য আবার বামমার্গকেই লোকে দোষী করিয়াছে। ঐ সকল কারণেই বামমার্গের আবার সমর্থন করিয়া আমাদিগকে পূর্বোক্ত কয়েকটি কথা বলিতে হইল।

ভারতে তন্ত্র ঐরূপে নারীর মাতৃ ও জায়ারূপ উভয় ভাবের উপাসনার প্রবর্তনা করিয়া নারীপ্রতীকে বিশ্বজননীর উপাসনা সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিলেন ; আর কুম্ভকার যেমন বাঁশ, বাখারী, খড়, মৃত্তিকাদিসহায়ে সুন্দর দেবমূর্তি গঠন করিয়া সাধকের পূজার সহায় হয়, ভারতের দার্শনিকগণ, বিশেষ আবার মহামুনি কপিল তদ্রূপ প্রকৃতিপুরুষবাদাদি

নিজ নিজ মতপ্রচারে তন্ত্রকারের সেই অসিমুণ্ড-বরাভয়করা, সৌম্যকঠোর, জীবনমৃত্যু-রূপ সর্বপ্রকার বিপরীতভাবের সম্মিলনভূমিস্বরূপা মাতৃমূর্তি-গঠনে সহায়তা করিলেন। তান্ত্রিক সাধক শ্রদ্ধা ও সংযম-সহায়ে ভক্তিপূরিতচিত্তে ঐ মূর্তির পূজা করিতে করিতে কালে সমাধিস্থ হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই সে মূর্তি জীবন্ত, জাগ্রত, বিশ্বের সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত। সমাধি-সহায়ে স্থূল বিশ্ব হইতে পৃথগ্‌ভাবে দূরে অবস্থিত হইয়া তিনি অনন্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপাকৃতি দেখিলেন—এক বিরাট শবশিবামূর্তি! আর উহার মধ্যগত যত কিছু বিভিন্ন পদার্থ, উহারা সকলেই সেই শবশিবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নখ-কেশ-লোমাদিরূপে নিত্য বিরাজমান! হর্ষ, বিস্ময়, ভয় প্রভৃতি অনন্ত ভাবে তাঁহার হৃদয় এককালে উদ্বেলিত হওয়ায় তাহার মুখ হইতে প্রথম বাক্য নিঃসৃত হইল—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥

এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।

এইরূপে সমাধিমুখে বা ভাবমুখে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই যে সিদ্ধ সাধকেরা বিশ্ব-রূপিণী, বিশ্বজননীর বিবিধ রূপের ও বিবিধ ভাবের ধ্যান ও মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়েন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

নারীর বিভূতি বা জায়াভাবের উপাসনা, পাশ্চাত্ত্য বহু প্রাচীনকালে দ্রাবিড় জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন কারণপ্রিয়, ভুজঙ্গভূষিত উক্ষদেব (Bacchus) ও তচ্ছক্তি ঐশী (Isis) ইওরোপের নানাস্থানে নানাভাবে পূজা পাইতেন। বিরল সংযতমনা সাধকেরা শুদ্ধভাবে তাঁহাদের পূজা করিত। আর অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ইতর-সাধারণ উহাদের পূজার নামে ব্যভিচারের প্রবল স্রোত পাশ্চাত্ত্যের নানা স্থানে যে প্রবাহিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহা প্রমাণিত করে। উক্ষদেবের পূজায় নরনারীসকল গভীর নিশীথে গুপ্তচক্রে একত্র মিলিত হইয়া মদ্যপান এবং নানা অসংযতাচরণ যে করিত, প্রাচীন ইতিহাসে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাদের ভিতরেও ঐরূপ পূজানুষ্ঠানের প্রচার ছিল। জগদ্বিজয়ী অসামান্য বীর আলেকজাণ্ডারের মাতার ঐরূপ পূজানুষ্ঠানের কথা ইতিহাস-নিবদ্ধ। খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ঐরূপ অনুষ্ঠানসকল যে অতি সাধারণ ছিল, ইতিহাসপাঠে ইহাও বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধ ও ইরানী ধর্মের সারভাগ নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া নবীন খ্রীষ্টধর্ম পূর্বোক্ত পূজার বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হয় এবং কালে শার্লম্যান প্রমুখ রাজন্যবর্গকে নিজ মতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদের তরবারির সহায়েই নিজ প্রাধান্যস্থাপনে সমর্থ হয়। ছলে বলে কৌশলেই যে খ্রীষ্টধর্ম ইওরোপে প্রাচীন যুগে একাধিপত্য লাভ করে ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সে যাহাই হউক, ঈশামাতা মেরীর পূজা প্রচলন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম

পাশ্চাত্ত্যে প্রথম মারীর মাতৃভাবে পূজার কথঞ্চিৎ প্রচার করিয়াছিল। মাতৃপূজার ঐ বীজ কিন্তু ফল্গু-সমাচ্ছন্ন মহান্ মহীরুহে পরিণত ভারতের ন্যায় পাশ্চাত্ত্যকে প্রতি নারীর ভিতর ঐ ভাবের পূজা ও সম্মাননা করিতে শিখাইতে পারে নাই।

ইওরোপের মাতৃপূজা ঐ মেরীমূর্তি পর্যন্ত যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বহু প্রাচীন উক্তদেবের পূজাকাল হইতে নারীতে জায়াভাব বা শক্তিভাবের যে পূজা ও সম্মাননা করিতে ইওরোপ ক্রমে শিখিতেছিল, খ্রীষ্টধর্মের নবীন প্রবর্তনায় সে তাহা ছাড়িতে পারিল না। তবে কালে কথঞ্চিৎ শুদ্ধভাবে নারীর ঐ ভাবের পূজা করিতে শিখিল মাত্র।

সমগ্র পাশ্চাত্ত্য যে ঐ ভাবে নারীজাতির বিশেষ পূজা ও সম্মাননা করে, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ। ইওরোপী পুরুষ নারীকে অগ্রে আসন, অগ্রে বসন, অগ্রে ভোজন দেয়। ট্রাম বা রেলগাড়ীতে স্থানাভাবে কোন রমণী দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন দেখিলে, তৎক্ষণাৎ নিজে দাঁড়াইয়া আপন স্থানে তাঁহাকে বসিতে দেয়। যানারোহণের সময় রমণীদের অগ্রে উঠাইয়া পরে আপনি উঠে—ইত্যাদি নানা প্রকারে স্ত্রীজাতির সম্মাননা করিয়া থাকে। কিন্তু উপর উপর না দেখিয়া একটু তলাইয়া দেখিলেই উহা যে নারীর মাতৃভাবের পূজা নহে, শক্তিভাবের বা 'গৃহলক্ষ্মী', 'কুললক্ষ্মী', 'দেবী', 'আনন্দময়ী' প্রভৃতি শব্দনিহিত নারীর সংসারপালন,পুরুষ-নিয়ামক ঐশ্বর্যভাব—যে ভাব ঘনীভূত হইলে কালে মধুর বা জায়াভাবে পরিণত হয়—সেই ভাবেরই উপাসনা, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। কারণ, ইওরোপী পুরুষের ঐ পূজা ও সম্মান অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারী বা রূপযৌবনগলিতা বৃদ্ধা নারী কদাচ পাইয়া থাকেন। সর্বাগ্রে যুবতী এবং পরে প্রৌঢ়া নারীগণই ঐ সম্মানের বিশেষভাবে অধিকারিণী। আবার রূপসৌন্দর্যভূষিতা প্রৌঢ়ার সম্মুখে কুরূপা যুবতীও ঐ পূজায় নিম্নাসন পাইয়া থাকেন। আবার অপরিচিত পুরুষ অপরিচিতা নারীকে সম্বোধন করিতে যাইয়া Madam বা মিসেস Mistress প্রভৃতি যে সকল সম্মানসূচক শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহাও যে নারীর শক্তিভাব বা ঐশ্বর্যভাবদ্যোতক, তাহাও এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য। ইওরোপী পুরুষদিগের ঐ রূপ আচরণ দেখিলেই আমাদের পূর্বোক্ত কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভারতের তন্ত্র শক্তিপূজায় নারীর মাতৃভাবের উপাসনার প্রাধান্যই যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ভারতের পুরুষকুলের নারীজাতির প্রতি ব্যবহারেই স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে বৃদ্ধা বর্ষীয়সী নারীই পুরুষের সম্মান অগ্রে পাইয়া থাকেন। রূপসৌন্দর্যভূষিতা নারী স্বীয় স্বামীর জননীর অধীনে না থাকিলে নিন্দাভাগিনী হন। উদ্ধত বধূর পরামর্শে পুত্র যদি জননীকে কোনরূপ অবহেলা করেন বা তাঁহার মর্যাদা লঙ্ঘন করেন তো স্ত্রী-জিত অধর্মচারী বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকেন। অপরিচিতা রমণী প্রৌঢ়া হইলে 'মা', যুবতী হইলে কন্যাবাচী 'বাছা' বা 'মা লক্ষ্মী' ইত্যাদি শব্দে অভিহিতা ও সম্মানিতা হয়েন। মাতাই সর্বাগ্রে পূজা পাইয়া থাকেন এবং মাতৃ-সম্বোধনে সম্বোধিতা হইলেই রমণীকুল নিঃশঙ্কচিত্তে অপরিচিত পুরুষের সহিত বাক্যালাপ ও আবশ্যক হইলে তৎকৃত সেবা বা সাহায্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য

নানা বিষয়েও ঐরূপ আচরণ দেখিয়া নারীর মাতৃভাবের পূজা যে ভারতের কতদূর অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ অনুমিত হয়।

জগৎকারণ ঈশ্বরকে 'জগজ্জননী', 'জগদম্বা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নারাভাবে উপাসনা করা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। পাশ্চাত্ত্য প্রভৃতি ভারতেতর দেশে ঈশ্বরের পিতৃভাবে উপাসনারই প্রচলন দেখা যায়। শুধু তাহাই নহে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট সাধকগণের অনেকে ঈশ্বরে নারীভাবারোপ করা মহাপাপের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। আবার নারীর শক্তিভাব বা ঐশ্বর্যভাবের বহুকাল হইতে উপাসনা করিয়া আসিলেও ভারতের তন্ত্রোক্ত বামমার্গে যথার্থ বীরসাধকগণের ন্যায় পাশ্চাত্ত্যের কোন সাধকই ঐ ভাব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তিনিই 'আমার শক্তি' এই ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে সাহসী হন না। বহুপ্রাচীন কালে ঐ ভাবের কিছু কিছু নিদর্শন ইওরোপীয় বিশিষ্ট সাধককুলের ভিতর পাওয়া যাইলেও বর্তমানে উহার নামগন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচীন যুগের ইওরোপীয় কোন কোন খ্রীষ্টান সাধিকার ঈশ্বরে বা ঈশ্বরাবতার ঈশায় পতিভাব আরোপ করিয়া সিদ্ধিলাভের কথা শাস্ত্রনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশার ধ্যানে ও ভাবসমাধিতে তাঁহারা এমন তন্ময় হইতেন যে, ক্রুশারোহণকালে ঈশার যে যে অঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই সেই অঙ্গের সেই সেই স্থান হইতে শোণিত-নির্গমনের কথাও লিপিবদ্ধ আছে। অপর দিকে আবার উপাস্য মেরীমূর্তির সহিত অঙ্গুরীয়-বিনিময় করিয়া তাঁহাকেই নিজশক্তি ভাবিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য-পালনের কথাও ইওরোপের প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট সাধক-পণ্ডিত ইরাসমসের জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের শক্তিপূজারই ভাবানুগত হইয়া যে ইওরোপের প্রাচীন যুগের ঐ সকল সাধকের ভিতর ঐরূপ ভাবসিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-সহায়ে বেশ অনুমিত হয়। পরবর্তী যুগসকলে ভারতের সহিত ঐ সম্বন্ধ যত রহিত হইয়াছে, ততই ইওরোপ ঐ ঐ ভাবসহায়ে আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইবার ও সিদ্ধিলাভ করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার উপর মার্টিন লুথার প্রবর্তিত প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম পূর্ণ ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের বিরোধী হইয়া কেবলমাত্র নীতি সহায়ে মানবকে জীবনগঠন করিতে শিক্ষা দিয়া ইওরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের মূলে একবারে কুঠারাঘাত করিয়াছে। তারপর, জড়বিজ্ঞানের প্রসারে ইওরোপের দৃষ্টি বর্তমানকালে কেবলমাত্র জড়েই নিবদ্ধ থাকায় তাহাকে একেবারে ইহকাল-সর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই যে প্রকারেই হউক, সংসারের ভোগসুখলাভই ইওরোপাদি পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের এখন পরম পুরুষার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইওরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের এ গাঢ় অমানিশার কখনও অবসান হইবে কি না তাহা ঈশ্বরই বলিতে পারেন। আশাভরসার মধ্যে কেবল ইহাই দেখা যায় যে, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহায়ে ভারতের ধর্মভাব বর্তমান যুগে পুনরায় আমেরিকা ও ইওরোপে কথঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে পুষ্ট ও প্রসারিত হইতেছে।

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবির্ভাবে নারীপ্রতীকে শক্তিপূজা ভারতে বর্তমান যুগে আবার বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রতীকে এমন শুদ্ধ ভাবের

শক্তিপূজা জগৎ আর কখনও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। জগন্মাতার ধ্যানসমাধিতে নিরন্তর তন্ময় হইয়া থাকা এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাঁহার উপর সর্বদা সকল বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করা, সকল নারীর ভিতর জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সকল সময়েই তাঁহাদের যথার্থ ভক্তিপূর্ণচিত্তে মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ উপাস্য ইষ্টদেবতার মূর্তি বলিয়া জ্ঞান করা, বিবাহিত হইলেও প্রাপ্তযৌবনা পত্নীর সন্দর্শনমাত্র মাতৃভবের প্রেরণায় তাঁহাকে মূর্তিমতী সাক্ষাৎ জগদম্বারূপে দর্শন করিয়া মাতৃসম্বোধন করা এবং জবাবিল্বদল দিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করা, বেশ্যারমণীকুলের ভিতরেও জগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়া তাহাদিগকে মাতৃসম্বোধনে সম্মানিত করিয়া সমাধিস্থ হওয়া, সর্বজনসমক্ষে ভক্তিপূতচিত্তে কুলাগারপ্রতীকে জগদ্‌যোনির পূজা করিয়া আনন্দে সমাধিমগ্ন হওয়া, তান্ত্রিকী পূজার উপকরণ 'কারণ' দেখিবামাত্র জগৎকারণের কথা মনে উদিত হইয়া প্রেমে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়া এবং সর্বোপরি জগন্মাতার প্রেমে আত্মহারা হইয়া স্বার্থপর ভোগসুখ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মচর্যে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যময় জীবন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন্ যুগে কোন্ অবতারপুরুষের জীবনেই বা নারীপ্রতীকে শক্তিপূজার ঐরূপ জ্বলন্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়াছে? তাঁহার অলৌকিক জীবনালোকের সহায়েই হে ভারত, তোমাকে এখন হইতে পবিত্রভাবে নারীপ্রতীকে শক্তিপূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। হে ভারতভারতি, গুরূপদিষ্ট হইয়া পশু বা বীর যে ভাবালম্বনেই তোমরা নারীপ্রতীকে শক্তিপূজায় অগ্রসর হও না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবন সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া তদনুষ্ঠান করিও এবং তাঁহার এই কথা হৃদয়ে স্থির ধারণা করিয়া রাখিও যে ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যসহায়ে একাঙ্গী ভক্তিপ্রেমে সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে কোনও ভাবে পূজা করিয়াই জগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে না ; জানিও 'ভাবের ঘরে চুরি' থাকিলেই ঐ পূজা বিপরীত ফল প্রসব করিবে।

হে বীর সাধক, তোমাকেই অধিকতর অবহিত থাকিতে হইবে। তোমাকেই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া নারীপ্রতীকে জগচ্ছক্তিরূপিণী জগদম্বার পূজা করিতে হইবে। প্রবৃত্তির কুহকে ভুলিয়া তোমারই ধৈর্যচ্যুত হইয়া দপস্খলিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। জানিও ভারতের তন্ত্রকার তোমার জন্য নিশিপূজার বিধান করিয়া তোমাকে দিবাপেক্ষা নিশিতেই অধিকতর অবহিত থাকিতে সঙ্কেত করিতেছেন—কারণ হিংস্র শ্বাপদকুলের ন্যায় ভীষণ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিশার তিমিরাবগুণ্ঠনেই নিঃশঙ্ক প্রচরণে সাহসী হইয়া উঠে। ভাবিও না, নিষ্কামভাবে নারীপূজা তোমার ভাবাশ্রয়ে হইবার নহে। নিস্তেজ-ইন্দ্রিয়গ্রাম বৃদ্ধ দম্পতির শরীরসম্বন্ধ উঠিয়া যাইয়া পরস্পরের প্রতি ঘনীভূত প্রেমসম্বন্ধে অবস্থিত হইবার কথা একবার স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ, পুরুষের নিকট রমণী তখন সখীভাবে পরিণতা ; অথবা রমণীতে এবং জননীতে তখন আর বিশেষ প্রভেদ কোথায়? কালধর্মে তাহারা তখন যে অবস্থায় উপনীত, অবহিত থাকিয়া সাধনাসহায়ে সর্বকাল নারীর সহিত তোমায় ঐ ভাবে অবস্থিত

থাকিতে হইবে ; তবেই তোমার ভাবসিদ্ধি উপস্থিত হইবে। বিপদ সমূহ, কিন্তু তজ্জন্য তোমাকে তোমার গুরূপদিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিতে বলিতে পারি না। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাহারও ভাব কখনও নষ্ট করেন নাই বা কাহাকেও তদ্রূপ করিতে শিক্ষা দেন নাই। অবহিত থাকিয়া, ত্যাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুদ্ধভাবে উপাসনায় রত থাকিলে তুমিও কালে জগদম্বার দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হইবে—গুরুভক্ত, শ্রদ্ধাবান সাধক, এই কথা তোমাকেও তিনি বার বার বলিয়া অভয় দিয়াছেন। অতএব জগদ্‌গুরুর শ্রীপাদুকার ধ্যান করিয়া, তাঁহার ঐ অভয়বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অবহিত হইয়া শক্তিপূজায় অগ্রসর হও—ধন্য হও।